জাতি ভাষা সংস্কৃতি স্বাধীনতা

আহমদ আবদুল কাদের

জাতি
ভাষা
সংস্কৃতি
স্বাধীনতা

আহমদ আবদুল কাদের

প্রমিনেন্ট
PROMINENT
পাবলিকেশন
৯ নীলক্ষেত, বাবুপুরা (৩য় তলা)
ঢাকা, ফোন: ৯৬৬ ৮৪ ২২

www.nagorikpathagar.org

প্রথম প্রকাশ ❖ জানুয়ারি ২০০২

প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন ॥ ৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা (৩য় তলা), ঢাকা - ১২০৫ -এর পক্ষে মোঃ হারুনুর রশিদ, আলফাজ উদ্দিন ও নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত, এ্যারোমা কম্পিউটার থেকে অক্ষর সংযোজিত, সারোয়ার জাহান -এর মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায় এ্যারোমা প্রিন্টার্স হতে মুদ্রিত, শিল্পী আরিফুর রহমান কর্তৃক প্রচ্ছদ অলংকৃত, সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

JATE VASHA SHANGSKRITI SHADHINATA

(NATION LANGUAGE CULTURE & INDEPENDENCE)

Written by Professor Ahmad Abdul Quader

Published by Prominent Publication.

Dhaka. Bangladesh. Price : Taka- 60.00 Only. US $ - 2.00

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র।

ISBN 984-758-001-4

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লেখকের বক্তব্য

বাংলাদেশে বসবাসরত জনগোষ্ঠির আত্মপরিচয়, জাতিসত্ত্বা, ভাষাসংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে যত বিতর্ক ও বিভ্রান্তি আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা খুবই বিরল। আমাদের দূর্ভাগ্য যে এসব বিষয়ে বিপরীতমুখী চিন্তা-চেতনা আমাদের জাতি গঠনকে বারবার বাধাগ্রস্থ করছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিভাজন, বিশ্লিষ্টতা ও অসংগতি। আমাদের জাতিসত্ত্বা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি-স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে ইসলামের সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা নিয়েই মূলতঃ যত বিতর্ক ও বিভ্রান্তি। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিক পরিকল্পিতভাবে এসব বিতর্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। এরা এদেশের জাতিসত্ত্বা ও ভাষা-সংস্কৃতিতে ইসলামের ভূমিকাকে যথাসম্ভব সংকীর্ণ করে দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে থাকেন। এরা এদেশের গোটা ইতিহাসেরই সেক্যুলার প্রকারান্তরে "হিন্দুবাদী" ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পান। এরা তথ্য ও বিশ্লেষণের বিকৃতি ঘটিয়ে এদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ধারায় ইসলামের অবস্থানকে দুর্বল ও অকিঞ্চিতকর রূপে পেশ করেন। বর্তমান বইটি এসব প্রবণতা ও প্রয়াসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ। এতে আমাদের জাতিসত্ত্বা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষ-সেক্যুলার ব্যাখ্যা যে বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক নয় তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান বইটিতে আমাদের জাতীয় জীবনের সব কয়টি দিকেই যে ইসলামের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবন থেকে ইসলামকে পৃথক করা যে সম্ভব নয়-এ বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে তুলে ধরা হয়েছে। তদসঙ্গে অতীত ও বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যত ইতিহাসের কাম্য ধারাটি কি হতে পারে তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ বইটি আমাদের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিশ্লেষণধর্মী ক্ষুদ্র আলেখ্য।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান বইটি ১৪টি স্বতন্ত্র নিবন্ধের সমষ্টি। এর আগে নিবন্ধগুলো মানব উন্নয়ণ জার্নাল, দৈনিক ইনকিলাব, সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাপ্তাহিক বিক্রম, দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ সহ বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও পত্র.-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি নিবন্ধ স্বতন্ত্র বিধায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু পুনরুক্তি ঘটেছে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশিত নিবন্ধগুলোর কিছুটা সম্পাদনাও করা হয়েছে। বস্তুতঃ আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে নিবন্ধগুলোতে আলোচিত হয়েছে।

বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যারা সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে বিশেষ করে প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন -এর প্রোপ্রাইটর ও আমার সহকর্মী জনাব নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বস্তুতঃ পক্ষে নজরুল ইসলাম সাহেবের আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্যোগের কারণেই বইটি দ্রুত প্রকাশিত হতে পেরেছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরস্কার দান করুন।

বইটিকে যতটুকু সম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এদতসত্বেও যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

পরিশেষে, বইটি আমাদের দেশ-জাতি-ইতিহাস-ভাষা-সংস্কৃতি-স্বাধীনতা সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি নিরসনে ও সঠিক নির্দেশনা দানে কিছুমাত্র সহায়ক হলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

বিনীত

আহমদ আবদুল কাদের

১/৩০ বাবর রোড

মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

এদেশের স্বাধীনতা
ও
স্বকীয়তা রক্ষায়
যারা নিবেদিত প্রাণ
তাদের উদ্দেশ্যে।

www.nagorikpathagar.org

সূচিক্রম

- ❖ আমাদের জাতিসত্ত্বা ০৭
- ❖ বাঙালী জাতির মূলধারা ৩৫
- ❖ বঙ্গভঙ্গ ও আমাদের জাতিসত্ত্বা ৪১
- ❖ আমাদের মাতৃভাষা ঃ আদর্শিক প্রেক্ষিত ৪৭
- ❖ বাংলা ভাষার বিকাশ ও বিবর্তন ৫৮
- ❖ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখন ঢাকামুখী ৬৮
- ❖ আমাদের সংস্কৃতি ৭৩
- ❖ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঃ বিকাশের ধারা ৮২
- ❖ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ৯৩
- ❖ আগ্রাসনের কবলে আমাদের সংস্কৃতি ১১৩
- ❖ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ১২৫
- ❖ আমাদের স্বাধীনতার গ্যারান্টি ১৩৭
- ❖ বাংলা ১৪ শতকে বাঙ্গালী জাতির বিকাশের ধারা ১৫১
- ❖ নতুন শতাব্দীর প্রত্যাশা ১৬২
- ❖ *গ্রন্থপঞ্জী* ১৭৬

www.nagorikpathagar.org

আমাদের জাতি সত্ত্বা

একটি জাতিগঠন, তার অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে জাতিসত্ত্বার উপলব্ধি ও অভেদ জাতীয়তার ভিত্তি নির্মাণ।[১] সার্বিক জাতীয় সংহতি অর্জনের অন্যতম দিক হচ্ছে জাতিসত্ত্বা নির্ধারণ ও জাতি-পরিচিতি সংকটের সমাধান।[২] সত্যিকথা বলতে কি এটা শুধু অন্যতম বিষয় নয় বরং "উন্নয়নশীল বিশ্বের জাতিগঠন ও সংহতি অর্জনের সবচেয়ে মৌলিক ও প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে জাতিসত্ত্বার প্রশ্নটির সুষ্ঠ মীমাংসা।[৩] উপনিবেশবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর পরই নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ, বিভিন্নমুখী গোষ্ঠীগুলোকে একটি জাতীয় ব্যবস্থার অধীনে সংঘবদ্ধ করা।[৪] দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রথম পর্যায়ই হলো জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা[৫] আর জাতি পরিচিতি, একাত্মতা ও জাতিসত্ত্বার প্রশ্নের সমাধান ছাড়া জাতীয় ঐক্য সম্ভব নয়।

কাজেই এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, জাতিসত্ত্বার সঠিক পরিচয়, উপলব্ধি ও বিনির্মাণ ছাড়া জাতি গঠন, জাতীয় সংহতি ও উন্নতির চিন্তা একান্তই অর্থহীন। আর জাতিসত্ত্বার মূলে নিহিত রয়েছে জাতীয় আদর্শবাদের সঠিক ধারণা। সেই আদর্শই নির্মাণ করে একটি জাতি গঠনের মৌলিক ভিত। সেই মৌল ভিতটি ধারাবাহিক ও প্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিক পরিবর্তন বিবর্তনের[৬] পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন উপাদান সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় নির্দিষ্ট জাতি ও রাষ্ট্রে রূপ লাভ করে।

একটি জাতির সত্ত্বা যদি থাকে অস্পষ্ট বা বিতর্কিত তাহলে বাহ্যতঃ একটি জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে তার পরিচয় থাকলেও বিক্ষিপ্ততা, বিশ্লিষ্টতা ও নানা দ্বন্দ্ব জাতির চলার পথকে করে ব্যাহত। ঋজু হয়ে দাঁড়াতে জাতিটি হয় বাধাগ্রস্থ। পরিচয় নিয়ে যে জাতির বিতর্ক থাকে সে জাতি সামনে চলার উৎসাহ পাবে কোত্থেকে? অগ্রগতির দিক নির্দেশনাই বা লাভ করবে কিভাবে? তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজ তত্ত্ববিদগণের নিকট জাতিসত্ত্বার প্রশ্নটি এতো গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা ঃ বিভ্রান্তি ও বিতর্ক

বাংলাদেশ নামক যে দেশটির আমরা অধিবাসী সেখানকার বারো কোটি মানুষের সঠিক জাতীয় পরিচয় কি? আমাদের জাতিসত্ত্বার মর্মমূলে কোন উপলব্ধি নিহিত রয়েছে? আমাদের জাতি গঠনের উৎসমূলই বা কি? এসব প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে এখনও বিতর্কের অবসান ঘটেনি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয় বিকাশ এবং জাতীয়তার প্রশ্নটি আজও মীমাংসিত হয়নি। বরং প্রসঙ্গটি বারবারই বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে।[৭]

www.nagorikpathagar.org

১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমির দাবী তুলে আল্লামা ইকবালের ভাষণ[৮] ও ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব[৯] গৃহীত হওয়ার সময় থেকে উপমহাদেশের মুসলমানগণ সাধারণভাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় বাংলাদেশীরা তদানীন্তন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে মুসলিম জাতীয় চেতনায় ছিলো অনুপ্রাণিত। মুসলিম পরিচয়ে তারা ছিলো গৌরবান্বিত। তখন ইসলামকে মেনে নেয়া হয়েছিলো জাতিসত্ত্বার মূল সূত্র বলে।[১০] পাকিস্তান গঠিত হয়েছিলো স্বতন্ত্র জাতি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজন-এ তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং সেই স্বতন্ত্র আবাসভূমিতে যাতে মুসলমানরা তাদের জীবন বিধান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইসলামী নিয়ম নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে।[১১] হিন্দু মুসলিম দুটো পৃথক জাতি[১২] -বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা, প্রথা, নিয়মনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে মুসলমানগণ হিন্দুদের চেয়ে পৃথক[১৩] এবং এ সমস্ত কারণে হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে সাধারণ জাতীয়তা গঠন করতে পারে না।[১৪] -এ ভিত্তি ভূমির উপরই ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের অধিবেশনে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু মুসলিম পরিচয় ভুলে গিয়ে নতুন পাকিস্তানী রাজনৈতিক জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন।[১৫] জাতিসত্ত্বার ইসলামী ভিত্তির গোড়ার শ্লোগানটির তাহলে কি অর্থ দাঁড়ালো অনেকের কাছে তা বোধগম্য হলো না।

সময় গড়িয়ে চললো। আবার নতুন এক জাতীয়বাদী চেতনা জেগে উঠলো। যে যুক্তিবলে ও যে জাতিসত্ত্বার চেতনায় পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল ঠিক একই ধরণের যুক্তি ইসলামের বদলে ভাষা ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে পেশ করা হলো-পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পোশাক পরিচ্ছদ তথা সব কিছুই পৃথক[১৬] এবং তাই তারা ভিন্ন ভিন্ন দুটো জাতি।[১৭] আঞ্চলিক আধিপত্য ও শোষণ এবং দমন নীতি সে চেতনাকে স্বাভাবিকভাবেই উদ্দীপ্ত করলো। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শুরু হলো আন্দোলন। সেনাবাহিনীর সীমাহীন অত্যাচার সে জাতীয়তাবাদকে গণরূপ দিলো।[১৮] প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে স্থান পেলো 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ।[১৯] 'বাঙালী জাতিত্ব হলো জাতিসত্ত্বার মূলসূত্র। বলা হলো বাংলা ভাষা ও তার ধর্ম-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আবহমান বাংলার সব কিছু নিয়েই বাঙালী।[২০]

www.nagorikpathagar.org

১৯৭৫-এর পট-পরিবর্তনের সূত্র ধরে জাতির পরিচয়ে এলো আরেক দফা পরিবর্তন। জাতিসত্ত্বার নতুন সংজ্ঞায়ন-বাঙালীর বদলে বাংলাদেশী।[২১] বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে যারা বাস করে তাদের ইতিহাস, ভাষা, ঐতিহ্য ইত্যাদি সামগ্রিক চেতনাই বাংলাদেশী জাতীয়তা বোধের ভিত্তি।[২২] একই শতাব্দীতে এদেশবাসীর জাতীয়তার সংজ্ঞায় পরিবর্তন এসেছে পাঁচবার—ভারতীয়-মুসলিম, পাকিস্তানী, বাঙালী ও বাংলাদেশী। কিন্তু আজো কি জাতিসত্ত্বা নির্ণয়ে বিতর্কের অবসান ঘটেছে? এর উত্তর দুর্ভাগ্যবশতঃ নেতিবাচক। কিন্তু জাতিসত্ত্বা নির্ণয়ে যে বিভ্রান্তি ও বিতর্ক তা কি এ জাতির সত্ত্বার মধ্যেই নিহিত নাকি আরোপিত ও ভ্রান্ত বিশ্লেষণের ফল? এ জাতির সত্যিই কি সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক এবং একক কোন পরিচয় নেই? থাকলে তাই বা কি? এসব প্রশ্নের আশু মীমাংসা প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনা মূলতঃ এসব প্রশ্নের সমাধানেরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আলোচনায় অনুসৃত পদ্ধতি

বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্ত্বার স্বরূপ নির্ধারণকল্পে বর্তমান আলোচনায় প্রথমে জাতিসত্ত্বার মৌল উপাদানগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পরে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছার প্রয়াস চালানো হয়েছে। বস্তুত আমাদের আলোচনায় জাতিসত্ত্বা নির্ধারক প্রায় প্রতিটি দিকই (অবশ্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে) বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিবেচনায় আনা হয়েছে এবং তাথেকে এদেশবাসীর জাতিসত্ত্বার মৌল রূপটি উৎঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের আলোচনার আর একটি দিক হচ্ছে যে, গোটা বিশ্লেষণ ও জাতিসত্ত্বার স্বরূপ অনুসন্ধানে এ জাতির বিগত এক হাজার বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তনের গতি ধারাকে সামনে রাখা হয়েছে। এখানে দলিল-প্রমাণ, উপাত্ত সবই মূলতঃ এদেশে ইসলামের সূচনালগ্ন বিশেষ করে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস থেকে পেশ করা হয়েছে। কেননা, ইসলামের সূচনাপর্ব হতে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী ও ইতিহাসের সামগ্রিক গতিধারা থেকে এদেশবাসীর জাতিসত্ত্বা উপলব্ধি করতে হবে। এজন্যই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান ও বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে আমরা অনিবার্যভাবেই বাংলায় ইসলামের আগমন থেকে আজ পর্যন্ত সময়টাকে বিশ্লেষণ করাই যৌক্তিক এবং পর্যাপ্ত মনে করেছি। এ সময় কালের বাইরে এদেশবাসীর জাতিসত্ত্বার অনুসন্ধান অবাস্তব ও বিভ্রান্তিকর। অবশ্য হাজার বছরের পূর্বের ইতিহাসকে আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু জাতিসত্ত্বা নির্ধারণ, এর পুষ্টি ও বিকাশ সাধনে সে ইতিহাস কোনক্রমেই নিয়ামক হতে পারে না। কাজেই হাজার বছরের সীমা রেখা টানায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন সীমাবদ্ধতা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে বলে মনে করার কোন কারণ

www.nagorikpathagar.org

নেই। বরং যারা পূর্বের পরিচয়কে বড় করে দেখতে গিয়ে পরবর্তী ও বর্তমান বিবর্তিত পরিচয়কে খাটো করে দেখছেন তারাই মূলতঃ সর্বাধিক ভ্রান্তির শিকার। কাজেই হাজার বছরের সময়কালকে বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি-সময় হিসাবে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং বর্তমান আলোচনায় তাই করা হয়েছে।

জাতিসত্ত্বার ধারণা

বর্তমান আলোচনায় জাতিসত্ত্বা বলতে মূলতঃ জাতির একাত্মতাবোধ ও মৌল পরিচয় (Identity) কে বুঝানো হয়েছে। তদসঙ্গে জাতীয়তাবোধ ও জাতি গঠনের মর্মমূলে নিহিত যে অনুভূতি, ভাবাদর্শ, ঐক্য সূত্র ও ঐক্য চেতনাবোধ এবং সংহতির প্রেরণা, চালিকা শক্তি ইত্যাদি সক্রিয় রয়েছে-যা একটি জাতির সত্ত্বাকে অবয়ব দান করে তা সবই জাতিসত্ত্বা প্রত্যয়ের অঙ্গীভূত বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতিসত্ত্বা বিকাশের ধারা

জাতিসত্ত্বা একটি প্রবহমান ও গতিশীল প্রত্যয়। প্রাকৃতি-ঐতিহাসিক-আদর্শিক প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জাতিসত্ত্বার পরিচয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আবার কালের বিবর্তনে নতুন উপাদান সংযোজনের ফলে পুরানো পরিচয়টি পাল্টেও যেতেপারে।

যে সমস্ত উপাদান সমন্বয়ে (যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে) একটি জনসমষ্টির জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠে তাকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি হচ্ছে অপরিবর্তনীয় উপাদান যা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তনযোগ্য নয়। যেমন-বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদি নিরেট প্রাকৃতিক বিষয়াবলী। অন্যটি হচ্ছে পরিবর্তনীয়, রূপান্তরযোগ্য। যেমন- ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। অবশ্য প্রাকৃতিক দিকটাও একদম নিশ্চল হয়। সীমিত ক্ষেত্রে সেখানেও রূপান্তর ঘটতে পারে। তবে সেক্ষেত্রেও পরিবর্তন যা ঘটে তা পরিবর্তনীয় উপাদানসমূহের প্রভাবে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েই তা সংঘটিত হয়। কাজেই বলা যায় যে অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক উপাদানগুলো এক থাকলেও পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিবর্তনের ফলে জাতি পরিচয়ে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। মোট কথা আবহমানকাল ধরেই কোন জনগোষ্ঠীর জাতিসত্ত্বার রূপটি একই রকম থাকবে এমন কোন কথা নেই।

জাতিসত্ত্বার রূপান্তর যেহেতু সম্ভব এবং তা ঘটেও থাকে তাই জাতি গঠনে ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পরিকল্পিত প্রয়াসের বাস্তবতা ও কার্যকারিতা অস্বীকার করা যায় না। তবে সে প্রয়াস প্রক্রিয়া যদি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা-অনুভূতি, বিশ্বাস, ইতিহাস ঐতিহ্য ইত্যাদির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয় তাহলে তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। অবশ্য অন্তঃস্থিত চিন্তা চেতনা ও ঐতিহ্য বিরোধী

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে চাপ সৃষ্টি করে নতুন কোন জাতীয় চেতনা সৃষ্টি হয়তো সম্ভব কিন্তু তা হবে সাময়িক ও অস্থায়ী প্রকৃতির। সাময়িক কোন জাতীয় চেতনাবোধ দ্বারা সত্যিকার জাতি গঠন সম্ভব নয়। ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ পরিহার করে নতুন কোন জাতিসত্ত্বা নির্মাণ ও অগ্রগতি লাভ অত্যন্ত দুষ্কর। কেননা ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ নতুন লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী সম্পদ সরবরাহে সক্ষম তা গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।[২৩] তাই ঐতিহ্য বিচ্ছিন্নতা জাতি গঠন ও অগ্রগতির পথে বাধা।

বস্তুতঃ জাতি সত্ত্বার ধারণাটি কোন স্থবির বিষয় নয়। বরং এর মধ্যে নিহিত রয়েছে গতিশীলতা, বিকাশমানতা, নতুন নতুন উপাদান আত্মস্থ করে পুষ্টিলাভের ক্ষমতা এবং বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা।

জাতিসত্ত্বা নির্ধারক উপাদান

জাতিসত্ত্বার প্রশ্নটির সঙ্গে কতকগুলো মুখ্য উপাদান নিহিত রয়েছে যেগুলোর সমন্বয়েই মূলত জাতি-সত্ত্বার স্বরূপটি নির্ধারিত হয়। সে উপাদানগুলোর বিকাশের উপরই নির্ভর করে জাতিসত্ত্বার পুষ্টি ও বিকাশ। যে সমস্ত উপাদান একটি জনগোষ্ঠির জাতিসত্ত্বা নির্ধারণে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে তন্মধ্যে চারটি হচ্ছে প্রধান ঃ ১. প্রাকৃতিক ও দেশজ দিক, ২. ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত দিক, ৩. ধর্মীয় ও আদর্শিক দিক এবং ৪. আন্তর্জাতিক দিক।* এই চারটি মৌলিক উপাদানের আলোকে আমরা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির জাতিসত্ত্বার স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়াস পাবো।

আমাদের জাতিসত্ত্বার প্রাকৃতিক ও দেশজ দিক বিচার

জাতিসত্ত্বা নির্ধারণ ও বিনির্মানের প্রাকৃতিক দেশজ দিক বলতে বুঝায় সে দেশের ভূগোল ও অঞ্চল, তার জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদন, সেখানে বসবাস কারী মানুষের জাতি-গোষ্ঠি, বর্ণ-গোত্র, তাদের ভাষা এসব থেকে উদ্ভুত মনোভাব ও প্রকৃতি-জীবনধারণ পদ্ধতি, সাহিত্য সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস, উৎপাদন পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সংগঠন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। সমস্ত প্রাকৃতিক দিকসমূহের মধ্যে তিনটিই সর্বাধিক মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী ঃ (ক) দেশ ও অঞ্চল, (খ) ভাষা এবং (গ) বর্ণ-গোত্র ও জাতি-গোষ্ঠী।

* কেউ কেউ জাতি গঠন ও জাতিসত্ত্বার উপাদান হিসেবে সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক সংগঠনকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃতি এমন একটি বিষয় যা দেশজ উপাদান, ধর্ম-আদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংগঠনও মূলতঃ সমাজের আদর্শিক প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এ সমস্ত উপাদান আলোচনাকালে স্বতঃই সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিকগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

ক. দেশ ও অঞ্চল

জাতি গঠন ও জাতিসত্ত্বা নির্ধারণে মাতৃভূমি, দেশ ও অঞ্চলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[২৪] এটি জাতিসত্ত্বার অন্যতম প্রাকৃতিক দিক। যদিও কেউ কেউ দেশ ও অঞ্চলের ধারণাকে প্রাকৃতিক না বলে প্রথাগত বলে অভিহিত করেছেন।[২৫] তা যাই হোক দেশ-অঞ্চল বা ভূগোল বিচারে এদেশের অধিবাসীরা বাংলাদেশী। তবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীর ধারণা নানা বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য নিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বর্তমান 'বাংলাদেশ অঞ্চলের বাংলাদেশ নামকরণের প্রশ্নে ঐতিহাসিকতার দোহাই নিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক (যেমন ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার) আপত্তি তুললেও[২৬] দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বঙ্গ-বাঙালা-বঙ্গাল-বাংলা-বাংলাদেশের স্তর পার হয়ে ঐতিহাসিক ভাবেই আমাদের দেশটি বাংলাদেশ নামে রূপান্তরিত হয়েছে।[২৭] মুসলিম শাসন শুরুর আগে বাংলাদেশ বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিলো। মুসলমান আমলেই বঙ্গ নামে বাংলার বিভিন্ন জনপদকে একতাবদ্ধ করে তোলার কাজ সম্পাদিত হয়। চৌদ্দশতকের বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (শাসন ১৩৩৯-৫৮ খ্রীস্টাব্দ) সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে প্রথমবারের মতো বাংগালা নাম দেন*। পাঠান আমলে বঙ্গ নামেই বাংলার সবগুলো জনপদ ঐক্যবদ্ধ হয়।[২৮] সম্রাট আকবরের সময়ই বঙ্গদেশ 'সুবহ বঙ্গলহ' নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ আমলে এসে ইহার বিশাল আয়তন (বিহার-উড়িষ্যাসহ) খর্বকৃত হয়ে পড়ে। অতএব বাঙলা বলতে যা বুঝায় তার সৃষ্টির কৃতিত্ব মুসলমানদেরই প্রাপ্য।[২৯] মূলত ঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক অবধি লিখিত গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গার সর্ব পশ্চিম ও সর্ব পূর্ব দুধারার মধ্যবর্তী বদ্বীপ অঞ্চলই আসল বঙ্গ এবং প্রায় সবটুকুই (চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অংশ বিশেষ ছাড়া) বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।[৩০]

১৯৪৭ সালে বৃটিশের হাত থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বাংলা বিভক্ত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়। অবশ্য মূল লাহোর প্রস্তাবে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিলো।[৩১] একটা সুগভীর ষড়যন্ত্রের ফলে সমস্ত বঙ্গ বা কমপক্ষে মুসলিম প্রধান সমস্ত বঙ্গ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। তা যাই হোক বাংলাদেশ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানেরই বর্তমান রূপ। বাংলাদেশ ও ভারতের নেতৃবৃন্দ '৪৭ সালের (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে) ভাগবাটোয়ারা মেনে নিয়েই তার ভিত্তিতে নিজ নিজ সার্বভৌমত্বের সীমানা নির্ধারণ করেছেন।[৩২] কাজেই আমরা সন্দেহাতীতভাবে এ

* ডঃ এম, এ, রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

www.nagorikpathagar.org

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে ভূখন্ড হিসেবে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার বিবর্তিত বর্তমান রূপের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। দেশ ও ভূগোল হিসেবে বাংলাদেশের ভিত্তি নিছক প্রাকৃতিক নয় বরং আদর্শিক ও রাজনৈতিক। একে অস্বীকার করার মানে ইতিহাস ও সত্যকে অস্বীকার করা। তাই বলা যায় মুসলিম চেতনাই এ দেশের বিবর্তন ও বর্তমান রূপ পরিগ্রহের মর্মমূলে। অতএব দেশ বিচারে আমরা বাংলাদেশী এবং আমাদের 'বাংলাদেশীত্ব' মুসলিম পরিচয় বাদ নিয়ে নয়।

খ. ভাষা

জাতিসত্ত্বার প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে ভাষা হচ্ছে অন্যতম। অনেকের মতে ভাষা হচ্ছে জাতি গঠন ও জাতি পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।[৩৩] বিশেষ করে জার্মান জাতীয়তাবাদী পন্ডিত হার্বার্ট লুথে (১৭৪৪-১৮০৩) ও জোহান ফিসেট (১৭৬২-১৮১৪) মনে করেন যে একটি জনগোষ্ঠির দুটো প্রধান উপাদানের[৩৪] প্রথমটি হচ্ছে ভাষা।[৩৫] তবে ভাষা এক হলেই যে একজাতি হবে বা ভাষা বিভিন্ন হলেই যে একজাতি হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। কেননা, অনেকের মতে ভাষা জাতি পরিচয়ের পর্যাপ্ত উপাদান সরবরাহে সক্ষম নয়।[৩৬] তবে একটি 'সাধারণ ভাষা' জনগণের ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।[৩৭]

বাংলাদেশের অধিবাসীরা ভাষা বিচারে বাঙালী। বাঙলা যাদের আশৈশব নিজস্ব ভাষা তারা সবাই বাঙালী।[৩৮]এটা আমাদের ভাষাগত পরিচয়। এদেশের সমস্ত মুসলমান জনগোষ্ঠী বাঙালী। এ পরিচয়কে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। বাস্তবে বা তত্ত্বে কোন কারণে নয়। কেননা, ইসলামী তত্ত্বানুসারে ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ,[৩৯] ভাষা তার অন্যতম নিদর্শন।[৪০] তাই বাঙালী পরিচয়ে দ্বিধান্বিত হওয়া[৪১] অথবা 'বাঙালীত্ব' ও 'মুসলমানিত্বের' মধ্যে বিরোধমূলক ব্যবধান সৃষ্টি বা এদেশের মুসলমানদের বাঙালী পরিচয়কে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।÷

অধিকন্তু বাংলা ভাষার সৃষ্টি পুষ্টি ও বৈচিত্রের মূলে রয়েছে মুসলমানদের বিশেষ সাধনা।[৪২] এ ভাষার ঘোরতর দুর্দিনে মুসলমান শাসকরাই এগিয়ে এসেছিল এর পৃষ্ঠপোষকতায় আর তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাঙালী-সত্ত্বা-বিকাশের যুগের সূচনা।[৪৩] এদেশের সাধারণ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাঙলা বরং হিন্দুরাই এ

÷ উনবিংশ শতকের এক শ্রেণীর হিন্দু লিখক বিশেষ করে বঙ্কিম চন্দ্র ও তার ভাবাদর্শের অনুসারীগণ এমনকি উদারনৈতিক লেখক শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মধ্যে পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানদের বাঙালী বলে স্বীকার না করার প্রবণতা তীব্রভাবে লক্ষনীয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখুন ঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিককালের বাঙালী সমাজের প্রেক্ষিত, মানব উন্নয়ন বক্তৃতা, উচ্চতর মানব গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭, পৃঃ ৪৭।

www.nagorikpathagar.org

ভাষা সহজে গ্রহণ করতে পারেনি।[৪৪] তাই বলা যায় বাঙালীকে নিজস্ব জাতি, নাম, ভাষা ও সাহিত্য মুসলমানরাই উপহার দিয়েছিল। সে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালীত্বকে নতুন মর্যাদা, তার ভাষায় নতুন সুর, তার গলায় নতুন জোর দিয়েছিলো মুসলমানরাই।[৪৫]

তবে ভাষা বিচারে সবাই বাঙালী হলেও এদেশের মুসলমানদের ভাষাও সাহিত্যে বরাবরই একটি স্বতন্ত্র ধারা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এবং এর ভিত্তি যে ইসলাম ও মুসলিম তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[৪৬]

এদেশের হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-কৃষ্টি-সমাজ ব্যবস্থা-জীবন যাত্রার প্রণালী ইত্যাদি দিক থেকে এতই বিভিন্ন যে এদের সাহিত্যিক রূপায়ন এক হতে পারে না।[৪৭] এক হয়নি। এদেশের শাস্ত্র, সমাজ ও সরকারী ব্যাপারেই নয় শুধু, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমান তথা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো স্ব স্ব স্বার্থে স্ব-সামাজিক, স্ব-রাষ্ট্রীয় ও স্ব-স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে আসছে।[৪৮]

অতএব ভাষাগতভাবে বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম পরিচয় সুস্পষ্ট, আমাদের বাঙালীত্ব ইসলাম নিরপেক্ষ নয়। বরং জনগণের বাঙালীত্ব ইসলাম নির্ভর বাঙালীত্ব। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বাংলা হলেও সেখানকার জনগণকে ভারতীয় হিসেবে ভাবতে হয়।[৪৯] বাঙালী হিসেবে নয়। তাই ঐতিহাসিকভাবে যেমন বাঙালীত্বের পুষ্টি ও বিকাশ মুসলমানদের হাতে হয়েছে ঠিক তেমনি হাজার বছরের বাঙালীত্বের যে বিবর্তিতরূপ তারও প্রকৃত উত্তরাধিকারী এদেশের মুসলমানরাই।

গ. বর্ণ গোত্র ও জাতিগোষ্ঠী

জাতি সত্ত্বার প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের অন্যতম হচ্ছে বর্ণ (race) ও জাতিগোষ্ঠী (Ethnicity)। একে জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান বলে কেউ কেউ বিবেচনা করেছেন।[৫০] বিশেষ করে নাৎসীবাদীরা তো এ ব্যাপারে চরম বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছে।[৫১] বর্ণবাদীরা তো বর্ণ পরিচয় ছাড়া অন্য কোন পরিচয়কে স্বীকার করতেই নারাজ। কারো কারো মতে বর্ণ পরিচয়ের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।[৫২] আল-কুরআন ঐক্যের ভিত্তিরূপে বর্ণ-গোত্র জাতিগত পরিচয়কে অনুমোদন না দিলেও স্বাভাবিক পরিচয়ের মাধ্যমরূপে এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছে।[৫৩]

বাংলাদেশের অধিবাসীদের বর্ণ পরিচয় কি? এখানকার জনগণের কি নির্দিষ্ট বর্ণ-গোষ্ঠী পরিচয় আছে? ইতিহাস বলছে বাঙালী একটি শংকর জাতি।[৫৪] প্রাক ঐতিহাসিক কাল থেকেই এখানে নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, নিষাদ, নর্ডিক ও মঙ্গল এবং ঐতিহাসিককালে এসেছে অ্যাসিরীয় ও এলামাইট, পারসিক, মেসিডোনীয়, গ্রীক, সিরীয়, ফিনিসীয়, শক ও কুশান, এরপর এসেছে পারসিক, হুন, প্রাক

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী তুর্কী, এবং মুসলিম আমলে এসেছে আরব, তুর্কী, ইরানী, আফগান, মোগল এবং ইংরেজ আমলে ইউরোপীয়রা।[৫৫] মোট কথা নেগ্রিটো, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনীয়, আর্য-সেমিটিক সব ধরনের জাতি গোষ্ঠী ও রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে এখানে।[৫৬]এখানে আবহমানকাল ধরে যারা বাস করে এবং যারা এখানে যখনই এসেছে সবাই স্বতন্ত্র বর্ণগোষ্ঠী পরিচয় হারিয়ে বা বাদ দিয়ে বাঙালী পরিচয়েই তারা শেষ পর্যন্ত পরিচিত হয়েছে। তাই আমাদের জাতি সত্ত্বায় বর্ণ-গোষ্ঠী পরিচয় কোন গুরুত্ব রাখে না এবং সে জাতীয় প্রবণতার কোন কল্যাণকর দিকও নেই। এখানে পূর্ব বংশ ও বর্ণসূত্রে আর্য অনার্য, ইরানী, মঙ্গল, পাঠান, আরবী, তুর্কী, স্থানীয় যাই হোক না কেন এখন সবাই বাঙালী সবাই বাংলাদেশী। তবে একথা সত্য যে বাংলাদেশের জনগণের বেশীর ভাগই অনার্যবংশোদ্ভূত। আর্য বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি খুবই অল্প। অর্থাৎ বাঙালী শংকর জাতি হলেও এখানে অনার্য-বঙ্গ-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রাধান্য রয়েছে।

অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রাকৃতিক দিকগুলোর প্রভাব ঃ

এখানকার জনগণের জীবন ধারণ, উৎপাদন পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী নির্মাণ ইত্যাদির উপর স্থানীয় জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, উৎপাদিত দ্রব্যাদি ইত্যাদির প্রভাবও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তবে এসবের ভিত্তি দেশজ উপাদান হলেও ধর্মীয় প্রভাব অনিবার্যভাবেই লক্ষণীয়। তাই অল্প হোক আর বেশী হোক প্রাকৃতিক-দেশজ দিকগুলোর পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর উপর স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। এ জন্যই দেখা যায় যে খাদ্যভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ ,শব্দ চয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট মিল থাকা সত্ত্বেও অমিলও কম নয়। আর এসব অমিলের ভিত্তি যে প্রধানতঃ ধর্মীয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বস্তুতঃ আমাদের জাতি সত্ত্বার ভিত নির্মাণে দেশজ-প্রাকৃতিক উপাদান যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা অত্যন্ত বাস্তব যা অস্বীকার করা সত্যকে অস্বীকারের নামান্তর। আমাদের পরিচয় স্বাতন্ত্র্যে দেশ ও তার প্রাকৃতিক প্রভাব অবিচ্ছেদ্য। অবশ্য পাশাপাশি এসব ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাবকেও খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

জাতিসত্ত্বার আদর্শিক-সাংস্কৃতিক দিক

জাতিসত্ত্বার আদর্শিক দিক বলতে বুঝায় সে জাতির বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, আইন কানুন, জীবন ব্যবস্থা, নিয়ম পদ্ধতি, জীবন বোধ, উপাসনা পদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠান, পরিবার গঠন পদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণ ও প্রকৃতি, আচার আচরণ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ এবং বিশ্ব দৃষ্টি[৫৭] ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

আদর্শিক-সাংস্কৃতিক বিচারে এদেশের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষের জীবন যে ইসলাম নির্ভর তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশে ধর্মীয় বিবর্তন ঘটেছে কয়েকবার। কিন্তু এ দেশে ইসলামের সূচনার পর থেকে কয়েক শতাব্দীব্যাপি আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কার্যকারণে অধিকাংশ জনগণের জীবনে ইসলাম একটি স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামভিত্তিক ধর্মমুখী সমষ্টিসূচক ব্যবস্থা।[৫৮] ইসলামের এ প্রভাব কোন চাপিয়ে দেয়া বিষয় ছিল না। বরং জনগণের স্বতঃ স্ফূর্ততায় ইসলামের আত্ম সচেতনতার নিকট পূর্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরাজয় ঘটে।[৫৯] সৃষ্টি হয় এদেশের মানুষের মনোরাজ্যে নবচেতনা, তাদের মানসজগত হয়ে উঠে বিপ্লবমুখী ও সৃজনশীল।[৬০] ফলে জন্ম হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ থেকে পৃথক এক সমাজ ব্যবস্থার-নতুন এক সমাজের। কাজেই এখানে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই এখানকার সমাজ কখনও একটা হয়নি-হতে পারেনি। সে সমাজ দুটি এক্সক্লুসিভ। তাদের মধ্যে খাওয়া দাওয়া বিয়ে-শাদী ইত্যাদি সামাজিক মিল নেই। তাই এগারশ বছর এক দেশে বাস করেও একই খাদ্য পানীয় খেয়েও দুটি পৃথক সমাজ রয়ে গেছে। এক সমাজের লোক জন্মে খৎনা করে নিজস্ব সমাজে বাস করে মরে গোরস্তানে যায়, অপর সমাজের লোক অশৌচান্ত ও উপনয়ন করে নিজের সমাজে বাস করে মৃত্যুর পর শ্মশানে যায়। ফলে এই দুই সমাজে দুটো প্যারালাল কালচার গড়ে উঠেছে।[৬১] এই প্যারালাল কালচার ও দু ধর্মের ব্যবধান এতো দুস্তর যে এই দুই ধর্মালম্বীদের সম্মিলন পূর্বাপর দুর্ঘট রয়েছে।[৬২] তাই একই দেশ ও ভাষার লোক হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক পরম্পরায় আমাদের ভাগ-বিভক্তির মূলে রয়েছে প্রধানতঃ সমাজের অমিল, অন্তরের ভাগের পার্থক্য।[৬৩] মুসলিম বাঙালী চেতনা তওহীদভিত্তিক আর হিন্দু বাঙালী চেতনা পৌত্তলিকতাবাদী।* এ দুয়ের মিল সম্ভব নয়।

মোট কথা একাদশ শতক থেকে ধীরে ধীরে এদেশের জাতি সত্ত্বায় ইসলামী ভিতটি নির্মিত হয়েছে। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় এ দেশের রাজনৈতিক কৃষ্টিতে[৬৪] মুসলিম চেতনা, ইসলামী রাজনৈতিক কৃষ্টির মূল প্রেরণা[৬৫] দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে। তাই এদেশের জাতি সত্ত্বার ইসলামী ভিত্তিটি যেমন আদর্শিক ঠিক তেমনি ঐতিহাসিকও। নানা উত্থান পতন ঘটনা প্রবাহ বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়েই এ জাতির মুসলিম পরিচয় এবং ইসলামী জাতীয়তাবোধ সুস্পষ্ট। একথা যারা স্বীকার করতে চান না তারা হয় অন্ধ না হয় অজ্ঞ। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের মানুষের জাতি সত্ত্বার আদর্শিক ভিত নির্মাণে ইসলামই হচ্ছে নিয়ামক।

* "আমরা বাঙালী চিরকালই পৌত্তলিক-পৌত্তলিকতা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের অস্থি মজ্জার সাথে মিশিয়া গিয়াছে-শুধু আধ্যাত্মিক উপাসনায় আমাদের তৃপ্তি হয় না" *(বঙ্কিম চন্দ্র সম্পাদিত মাসিক 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক ১২৮৫ বাং ৩২৮পৃঃ)*

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত দিক

জাতিসত্ত্বার ক্ষেত্রে ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৬৬] তাই জাতিসত্ত্বা নির্ধারণ ও উপলব্ধির জন্যে সে জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

জাতিসত্ত্বার ঐতিহাসিক দিক হচ্ছে জনগোষ্ঠীর ইতিহাস চেতনা, ঐতিহ্যবোধ, জয় পরাজয়ের অনুভূতি, গৌরব ও বেদনার ঘটনাবলী, জাতীয় ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় বীর এবং তাদের সাথে সমমর্মীতা, ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণার উৎস এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও ইতিহাসের মূল্যায়ন ইত্যাদি।

এখন যদি আমরা বাংলাদেশে ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে বিগত হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে, এদেশের দুটো জনগোষ্ঠী হিন্দু মুসলিম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুটো পৃথক ইতিহাসের ধারক-তাদের ইতিহাস চেতনাও ভিন্ন ভিন্ন। সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করলেই তা অত্যন্ত স্পষ্ট হবে।

১. বাংলাদেশে ইসলামের আগমনে যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়[৬৭] তাতে অপদমিত ও অধিকার বঞ্চিত বৌদ্ধজনগোষ্ঠী বিপুলভাবে ও সহজেই ইসলাম গ্রহণ করে।[৬৮] আর সে বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি ও ক্ষমতাসীনরা প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। কিন্তু ইসলামের আত্মসচেতনতার কাছে তাদের সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটে।[৬৯] অবশ্য সেই যে দ্বন্দ্ব-প্রতিরোধ, পরাজয়ের গ্লানি তা আজও শেষ হয় নাই। তাই তারা বরাবরই চেষ্টা করেছে সে ইতিহাসটাকে অস্বীকার করা, পরাজয়কে ঢাকার।*

২. এদেশে ইসলামের প্রচারকগণের সঙ্গে তদানীন্তন হিন্দু শাসকদের যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং এসব সংঘাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি উভয় জনগোষ্ঠীর মনোভাব মোটেই এক নয় বরং তারা দুইটি স্বতন্ত্র আদর্শ ও ধারার প্রতিনিধিত্ব করছে। একপক্ষে রয়েছে তওহীদবাদী আদর্শ, অন্যায় জুলুম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির নিরন্তর প্রয়াস ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অকুণ্ঠ সমর্থন আর অন্যদিকে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ, বর্ণবাদ ও সামাজিক বৈষম্য, পৌত্তলিকতার পুঁতিগন্ধময়তা। আর এ সবের আড়ালে রয়েছে সমাজের উচ্চ বর্ণের দুর্দন্ড প্রতাপ ও উলঙ্গ শোষণ, এবং তওহীদ, শান্তি ও মুক্তির ধারাকে প্রতিরোধ করার সুতীব্র ষড়যন্ত্র ও দমননীতি।

---

* ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবটা বুঝা যাবে নিম্নোক্ত একটি উদ্ধৃতি থেকে-"সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিল্‌জী বাংলা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙালীতে বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।" (বঙ্কিম চন্দ্র সম্পাদিত মাসিক "বঙ্গদর্শনঃ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ বাং, পৃঃ ৩৮৭)।

www.nagorikpathagar.org

শাহ সুলতান বলখী মাহিসোয়ার ও রাজা পরশুরাম-বলরামের সংঘাত সংঘর্ষ,[৭০] বাবা আদমশহীদ ও রাজা বল্লাল সেনের (১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ) যুদ্ধ,[৭১] মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবীর সাথে রাজ বিক্রম কেশরীর দ্বন্দ্ব[৭২] রাজা গৌর গোবিন্দের সাথে হযরত শাহ জালালের যুদ্ধ (১৩০৩ খৃঃ),[৭৩] শাহনূর কুত্বুল আলম ও রাজা গণেশের (১৪১৪ খৃঃ)[৭৪] সংঘাত ইত্যাদি বহু দ্বন্দ্ব ও সংঘাত মূলতঃ ছিলো আদর্শিক লড়াই যা আজো ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আছে। এবং তা ইতিহাসে অন্তঃসলীলা স্রোতের মতো এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর (যার অধিকাংশ সেদিনের নিপীড়িত মানুষের স্তর থেকে আসা) মনের মুকুরে প্রবহমান। আজো তারা একাত্ম হয়ে আছে সে সব মহান দরবেশ-পীর-আলেম-সূফী সেনাপতিদের কীর্তি ও আদর্শের সাথে।

৩. বাঙলার মুসলিম শাসনকে বিশেষ করে প্রথম তিনশো বছরের ইতিহাস মুল্যায়ন ও চিত্রায়নে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ডঃ আহমদ শরীফের মতো লোক পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলেন-

"আমরা বাঙলার ৩১৫ বছরের (১২০২-১৫১৯) ইতিহাসের খসড়া চিত্র দিলাম। এ ধরণের শাসনেই ডক্টর সুকুমার সেন অত্যাচার ও হত্যার তান্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। গোপাল হালদার দেখেছেন কেবল 'রক্ত' আর 'আগুন' আর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র, ডক্টর সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায়, অনীদ্র মহন বসু, ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সব ইতিহাস রচয়িতা পড়েছেন দুঃশাসন, নিপীড়ন, বিধর্মী হত্যা, কিংবা বল প্রয়োগে ইসলামে দীক্ষার ত্রাসকর কাহিনী"।[৭৫] কিন্তু এ মুল্যায়ন যে বিদ্বেষ বশতঃ এবং বাস্তবতা বর্জিত তার প্রমাণ ইতিহাস রয়েছে।[৭৬]

৪. হিন্দু বর্ণবাদীরা যেখানে মুসলিম শাসনকে বিদেশী শাসন মনে করে ঘৃণা করেছে সেখানে মুসলমানগণ নিজেদের শাসন মনে করে গৌরব বোধ করে। বিন বখতিয়ার ও লক্ষণ সেন দুটো ভিন্ন চেতনার সাথে সংযুক্ত। বস্তুতঃ ইতিহাসের যে অধ্যায় মুসলমানের নিকট গৌরবোজ্জল হিন্দুরা সেটাকেই জাতীয় কলংক বলে মনে করে কিংবা কোন ক্ষেত্রে কলংক মনে না করলেও তাতে গর্ব করার কিছু পায় না। ইতিহাসে যারা মুসলমানদের নিকট বীর ও আদর্শ শাসক বলে সম্মানিত হয়ে থাকেন হিন্দুরা তাদেরকেই অত্যাচারী নিষ্ঠুর বলে মনে করে থাকে। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস যে এক নয় এ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারা যায় না।[৭৭]

৫. মুসলমানদের জাতীয় বীর ও আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর জাতীয় বীর ও ব্যক্তিত্বও এক নয়। শাহজালাল, শাহমখদুম, শাহ আমানত, খান

www.nagorikpathagar.org

জাহান আলী, নূর কুতবুল আলম, বিন বখতিয়ার প্রমুখ মুসলমানদের গৌরবোজ্জল ব্যক্তিত্ব। হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদেরকে আপন করে নিতে পারেনি পারবেনা।

৬. বৃটিশের হাতে বাংলার এবং পরবর্তীতে গোটা ভারতের স্বাধীনতা হারানোর প্রতিক্রিয়াও উভয় জনগোষ্ঠী একইভাবে প্রদর্শন করেনি। মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকেই বৃটিশ বাংলা ও বৃটিশ ভারতের মূল্যায়ন করেছে। এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া, সংগ্রাম যুদ্ধ ছিলো ইসলামী চেতনা থেকে উৎসারিত। তাদের সংগ্রাম ছিলো ধর্মীয় দায়িত্ব-পবিত্র জেহাদ।[৭৮] হিন্দু জনগোষ্ঠী বৃটিশ শাসনকে সাধারণভাবে স্বাগতই জানিয়ে ছিলো এবং সর্বোতোভাবে অনুগত থেকে সুযোগ সুবিধা লাভ করার প্রয়াস পেয়েছে। এক্ষেত্রে দুটো প্রধান জনগোষ্ঠীর মূল্যায়ন, মনোভাব, ভূমিকা, দৃষ্টিকোন ভিন্ন ভিন্ন ছিলো।

৭. উপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার মুসলমানদের সংগ্রাম, তাদের নেতৃত্ব সবই মুসলিম স্বতন্ত্র ধারার পরিচায়ক। মজনুশাহের ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন ও শাহাদাত, হাজী শরিয়াতুল্লাহ ও দুদুমিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন ও সংগ্রামসহ বিভিন্ন মুসলিম আন্দোলন ও নেতৃত্ব[৭৯]-তাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক ও একাত্মতার ভিত্তি সবই ইসলামী চেতনা সজ্ঞাত। অপরদিকে বঙ্কিম চন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক, বিবেকান্দ, শ্রী রামকৃষ্ণ প্রমুখ হিন্দু পুনর্জাগরণের দার্শনিক ও নায়কগনের সাথে তওহীদবাদী মুসলমানের একাত্মতার ও সম্পর্কের ভিত্তি কোথায়?[৮০] নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। বিশ্ব কবি হয়েও আমাদের জাতীয় কবি কেন হননি? এর কারণ কি মুসলিম ও ইসলামী চেতনা নয়?

৮. বাংলার বাইরে ভারত বর্ষের অপরাপর ইতিহাসের সাথে আমাদের সংযোগ, সম্পর্ক, চেতনাবোধ- সবই কি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত নয়? মুহম্মদ বিন কাসেম, আওরঙ্গজেব, মুজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী, খাজা মাঈনউদ্দিন, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শাহওয়ালি উল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ, সৈয়দ আহমদ বেরিলবী ও ইসমাইল শহীদ ও তাদের আন্দোলনের সাথে আমাদের সম্পর্ক অতিনিবিড়। এরা আমাদের গৌরব। এদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা আদর্শিক ও নৈতিক-মানসিক অন্যদিকে অপর জনগোষ্ঠীর গৌরব চৈতন্যদেব, শিবাজী প্রমুখ। তারা শিবাজী চরিত্রে খুজে পান তাদের নিজস্ব গৌরব গাঁথা, এক ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন।[৮১]

৯. অবশ্য বিগত হাজার বছরে ঐক্য চেতনা যে নেই তা নয়। কিন্তু তাও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের মহান আবেদনেরই ফল। ইসলাম বিশেষ কোন জাতির ধর্ম নয় বরং প্রচারধর্মী বিধায় সে সবাইকে জয় করতে চায় এবং জয় করেই ক্ষান্ত হয় না তাকে কোলেও টেনে নেয়।[৮২] অবশ্য ইসলামকে উপেক্ষা করে

www.nagorikpathagar.org

তথাকথিত মিলনের যে প্রয়াস চলছে তা বাস্তবে কার্যকরী হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা স্বাতন্ত্র্যই বজায় রেখেছে।[৮৩] আর এও সত্য যে মিলনের এ সমস্ত প্রয়াস প্রচেষ্টার পিছনে ছিলো মূলতঃ ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কারণ এবং যা সাধারণ মুসলমান ও তাদের প্রকৃত প্রতিনিধি তথা সূফী-দরবেশ আলেম উলামা বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন।

১০. আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে আপাতঃ বিশ্লেষণে ধর্ম নিরপেক্ষ বাঙালীবোধ প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হলেও গভীরতর বিশ্লেষণ তা প্রমাণ করে না। ভাষা আন্দোলন মুলত শুরু করেছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি সেবীরা ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকেই। এ ছিলো মূলতঃ একটি অঞ্চলের অন্যায় আধিপত্য তথা জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যা ইসলামের শিক্ষা। এক্ষেত্রে বাঙালী বোধ ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিলো না।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কেও একই কথা। এ সংগ্রাম ছিলো মুলতঃ আঞ্চলিক আধিপত্য ও শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যে বাঙালী মুসলমানরা পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে সেই মুসলমানরাই আঞ্চলিক শোষণ বঞ্চনার ফলে হতাশার শিকার হয়।[৮৪] উপরি কাঠামোর নেতৃত্ব এসবের যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন সাধারণ জনগণের নিকট বাঙালীবোধ ইসলামের বা মুসলিম পরিচয়ের বিপরীত ছিলো না। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারক আওয়ামী লীগ ও এ সত্যটি ভালো করে জানতো এবং তাদেরকেও প্রকারান্তরে নীতিগতভাবে তা স্বীকার করে নিতে হয়েছিলো। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন পাশ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে আশ্বস্থ করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ বিজয় লাভের পর তাদের সংবিধান কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।[৮৫] সেই খসড়া সংবিধানেরই রাষ্ট্রীয় পলিসীর নীতি নির্ধারক মূলনীতিতে (১) কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন করা হবে না, (২) কুরআন ও ইসলামিয়াত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং (৩) মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতা উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকবে-এসব কথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে।[৮৬]

তাছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায়ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি।[৮৭] এমনকি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতার ঘোষণা দেয়া হয়নি।[৮৮] ইসলামের নামে যেসব গোষ্ঠী সেদিন গণবিরোধী ভূমিকা পালন করেছিলো তাদের প্রতি জনগণের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও ১৯৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতার

www.nagorikpathagar.org

ঘোষণা ও তার ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু নতুন পদক্ষেপ দেশের জনগণ মেনে নিতে পারেনি। বরং এ সবের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে জনগণ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। জনগণের রোষ থেকে বাঁচার জন্যে তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদেরকে পর্যন্ত ইসলামের সঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন বিরোধ নেই-এ কথা প্রমাণের বহু চেষ্টা করতে হয়েছে। জোর গলায় বলতে হয়েছে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়-ধর্মীয় সহনশীলতার নীতিমাত্র।' এমনি সব ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণের নিকট তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালানো হয়। তাছাড়া নেতারা যে নিষ্ঠাবান মুসলমান একথা প্রমাণের জন্যে গণ ভবনে সরকারী পর্যায়ে প্রোগ্রামের শেষে খোদা হাফেজ বলা, মাদ্রাসা শিক্ষার মতো তাদের ভাষায় 'একটি প্রতিক্রিয়াশীল এবং অকেজো শিক্ষা ব্যবস্থা' উচ্ছেদ না করে তার জন্যে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাষ্ট্র প্রধান এবং অন্যান্য সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন 'প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে' যোগদান[৮৯] করতে হয়, ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়। এ থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে এদেশের জনগণের বাঙ্গালীত্ব ও বাংলাদেশীত্ব নীতিগতভাবে কখনই ইসলামীচেতনা বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে নাই বরং উপর থেকে তা কেউ কেউ চাপাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। ১৯৭৫-এর পর সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার কথা বলা এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষনাসহ যাবতীয় কাজই প্রমাণ করে যে এদেশের ক্ষমতায় থাকতে হলে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দকে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তারা ধার্মিক। তাদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে একটি ধর্মীয় ইমেজ। সংকট উত্তীর্ণ হবার জন্যেই এগুলো করতে হয়।[৯০] কাজেই বলা যায় যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের পুনঃপৌনিক যে প্রক্রিয়া পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত চলছে তাও প্রমাণ করছে যে দেশের জনগণ প্রাতিষ্ঠানিক ও ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই তাদের কাছে গ্রহণীয় হতে হলে কট্টর ধর্মবিরোধীকেও ধার্মিক সাজতে হচ্ছে। এমনকি যারা তত্ত্বগতভাবে ধর্মকে উৎখাত করতে চান তারাও এখন ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি বলার মধ্যে উল্টো ফল দেখতে পান, আন্দোলনের জন্যে ক্ষতির কারণ মনে করেন।[৯১] এসব থেকে এ সত্য বেরিয়ে আসছে যে দেশের জনগণের সাথে ইসলামের সম্পর্ক গভীর ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার বন্ধনে আবদ্ধ। তাই প্রত্যেককেই আশ্বস্থ করতে হচ্ছে যে তাদের নীতি ইসলাম বিরোধী নয়। অতএব বলা যায় যে জাতিসত্ত্বার ঐতিহাসিক দিকটাও প্রধানতঃ ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এদেশের ইতিহাস থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করার কোন সুযোগ নেই।

www.nagorikpathagar.org

জাতিসত্ত্বার আন্তর্জাতিক দিক

জাতিসত্ত্বার আন্তর্জাতিক দিক* বলতে বুঝায় জাতিটির আন্তর্জাতিক অবস্থান, সম্পর্ক সম্বন্ধ ও যোগাযোগের ভিত্তি, বহিঃ বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে সংযোগের ধারা ও প্রকৃতি, সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও মিশ্রণ, আন্তর্জাতিক একাত্মতাবোধ ও একাত্ববোধের ভিত্তি, আন্তর্জাতিক আবেগ-অনুভূতি-সহমর্মীতা, গৌরব অনুপ্রেরণার রূপ ও প্রকৃতি, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব, শত্রু মিত্র ও বন্ধুত্বের ধারণা ও ক্ষেত্র ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ অখন্ড মুসলিম উম্মাহর[৯২] অংশ। আমাদের জাতিসত্ত্বা তত্ত্বগত ও বাস্তব উভয়দিক দিয়েই উম্মাহ কেন্দ্রিক তথা এক মহা জাতি সত্ত্বার * অধীন। তত্ত্বগত ভাবে জাতি বর্ণ গোষ্ঠী ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানরা এক উম্মত এক মহাজাতি।[৯৩] সমস্ত মুসলমানরাই আদর্শিক ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ।[৯৪] তারা একে অন্যের বন্ধু ও পৃষ্টপোষক।[৯৫] মুসলিম ও ইসলামী স্বার্থ ক্ষুন্ন করে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে কোন বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক হতে পারে না।[৯৬] তারা একটি মধ্যপন্থী জাতি।[৯৭] গোটা মানব জাতির জন্যে তাদের আবির্ভাব,[৯৮] তাই তারা একটি আন্তর্জাতিক দল,[৯৯] কুরআনের ভাষায় হিযবুল্লাহ,[১০০] স্থান কাল বর্ণ নির্বিশেষে একটি বহুমুখী প্রবহমান ধারণা,[১০১] কাজেই তত্ত্বগতভাবে সমস্ত মুসলমানরা যার যার প্রাকৃতিক, গোত্রীয়, জাতি গোষ্ঠী, ভাষাকেন্দ্রিক, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে একটি অখন্ড খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাবে।[১০২]

ইসলামের❑ আবির্ভাবের পর থেকে তুর্কী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে হোক আর প্রতীকী অর্থে হোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুনিয়ার

** সাধারণভাবে জাতিসত্ত্বা নির্ধারণে আন্তর্জাতিক দিকটি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পন্ডিত ও গবেষকগণ তা এড়িয়ে গেছেন; অথবা জাতিসত্ত্বার সাথে আন্তর্জাতিকতার প্রচ্ছন্ন বিরোধ রয়েছে বিবেচনা করে জাতিসত্ত্বা বিশ্লেষণে ঐ জাতির আন্তর্জাতিক দিকটির উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেননি। অথচ একটি জাতির জাতিসত্ত্বা উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের জন্যে তার আন্তর্জাতিক সত্ত্বাটি অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক দিকটি উপেক্ষা করলে জাতি বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত হতে বাধ্য। তাই আমরা আন্তর্জাতিক দিকটাকে জাতিসত্ত্বার অন্যতম মৌল উপাদান বলে বিবেচনা করেছি।*

** 'উম্মাহ' শব্দের সাধারণত বাংলায় অনুবাদ করা হয় 'জাতি' বা 'সম্প্রদায়' বলে। কিন্তু আমরা উম্মাহ শব্দের মধ্যে যে তাৎপর্য, ব্যাপকতা ও গভীরতা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে তাকে মহাজাতি বলে আখ্যায়িত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি।*

❑ পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে মানব জাতির প্রথম মানব যে বিধান নিয়ে আসেন তাই ইসলাম। সমস্ত নবী রসূলগণ (দঃ) একই জীবনাদর্শ ইসলাম প্রচার করেছেন। তবে এখানে ইসলাম বলতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আনীত দীনকেই বুঝানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানরা সাধারণভাবে একটি 'খেলাফতের' অধীনে বাস করেছে এবং পারস্পরিক একাত্মতা ও সহমর্মীতা বোধ করেছে। উপমহাদেশের খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের মুসলমানদের মনের গভীরে প্রোথিত ভাবধারাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের মুসলমানদের অনুভূতি আবেগ আন্দোলন প্রমাণ করেছে তারা বিশ্ব মুসলিম মহাজাতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিজ দেশের অমুসলিম ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব ও গৌরব বোধের চেয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরোক্কো পর্যন্ত যে কোন স্থানে, ইতিহাসের যে কোন স্তরের মুসলিম মহানায়কদের কৃতিত্ব-জয়-পরাজয় ইত্যাদি সব ব্যাপারেই অল্প হোক আর বেশি হোক অধিকতর মমত্ববোধ, প্রাণের সম্পর্ক সবই মুসলিম আন্তর্জাতিক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

এ শুধু অতীতের ব্যাপার নয়-এ সত্য আজো জীবন্ত-সজীব। কাবার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোভাষা, মসজিদুল আকসা, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, বসনিয়া, চেচনিয়া, লেবানন, পাতানী, রোহিঙ্গা, কসভো, জিয়াংজিয়াং ইত্যাদির প্রতি আমাদের অনুভূতির তীব্রতা ও একাত্মতার ভিত্তি কি? শুধুই কি মানবিক না আদর্শিক প্রশ্ন নিহিত ? ইসলামী সম্মেলন সংস্থা থেকে শুরু করে ইসলামী প্রতীক ধর্মী সব কিছুর প্রতি আমাদের বিশেষ সম্পর্কের মূল উৎস কি? বিশ্ব মুসলিমের সাথে আমাদের সম্পর্ক, মুসলমানের জয় পরাজয়ে (এমন কি তুচ্ছ খেলাধূলার মতো বিষয়েও] আমাদের হৃদয় মন আলোড়িত হওয়া কিসের প্রমাণ বহন করে? ইসলাম ও মুসলমান পরিচয়ই যে এসবের মূলীভূত কারণ তা কি অস্বীকার করার উপায় আছে?

আর এসব কারণেই আমাদের জাতিসত্ত্বার ভৌগলিক, ভাষাগত, বর্ণগত স্বীকৃতি সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী রূপ লাভ করতে পারেনা।* বস্তুতঃ বাংলাদেশের জনগণ একাধারে দ্বৈত সত্ত্বা- তথা অঞ্চল, জাতিগোষ্ঠী ও ভাষা ভিত্তিক দেশজ সত্ত্বা এবং মুসলিম আন্তর্জাতিক সত্ত্বার অধিকারী। এ দ্বৈত সত্ত্বা পরস্পর বিরোধী নয়-বরং সম্পূরক এক মহাজাতি সত্ত্বার আওতায় বিকশিত জাতিসত্ত্বা।

অতএব বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার আন্তর্জাতিক দিকটিও প্রধানতঃ ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অমুসলিম জগতের সঙ্গে এ জাতির যে সম্পর্ক তা মূলতঃ পারস্পরিক

---

* *একথা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে ইসলাম মানুষের জাতি গোষ্ঠী-ভাষাগত ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাভাবিক পরিচয়কে স্বীকার করলেও আধুনিক কোন জাতীয়তাবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। ইসলামী চেতনার অস্বীকৃতি অথবা এর উপর প্রাধান্যদানকারী যে কোন পরিচয়ই ইসলামে অগ্রহণযোগ্য ও অসিদ্ধ। তাই ভাষাগত, আঞ্চলিক, ভৌগোলিক বা গোত্র-বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠীগত কোন জাতীয়তাবাদী ভাবধারারই সমর্থন ইসলামে নেই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Islam and Nationalism, Dr. Ali Muhammad Naqavi, Islamic Propagation Organisation, English Transhlation : Aaiden Pazargadi, Tehran, 1988.*

www.nagorikpathagar.org

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কুটনৈতিক পর্যায়ের আর বিশ্ব মুসলিমের সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতারও উর্ধে আদর্শিক সম্পর্ক রয়েছে- রয়েছে আবেগ অনুভূতির সম্পর্ক। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস, গৌরব ও দুঃখ বেদনার সঙ্গে বাঙালী মুসলিমের রয়েছে নাড়ীর টান, হৃদয়ের সম্পর্ক। কোন ভাষা, ভূগোল, বর্ণ বা দেশীয় ইতিহাসের বন্ধন দ্বারা তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

অমুসলিম জনগোষ্ঠী ও আমাদের জাতিসত্ত্বা

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার মৌলভিত্তি হিসেবে যদি মুসলিম চেতনাবোধকে চিহ্নিত করা হয় তাহলে এদেশে বসবাসরত অমুসলিম জনগোষ্ঠীর [পার্বত্য উপজাতিসমূহসহ] সাথে বাংলাদেশের জাতি সত্ত্বার সম্পর্কে কি হবে? এ কথা সত্য বটে যে, আমাদের জাতিসত্ত্বার মৌলভিত্তি মুসলিম চেতনাবোধ কিন্তু এ চেতনাবোধ সহকারেই আমরা বাঙালী ও বাংলাদেশী। তাই এদেশের অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশী ও বাঙালী হিসেবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক রয়েছে- এ সম্পর্ক ভৌগলিক ও ভাষাগত। তাছাড়া দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কও রয়েছে। কাজেই এদিক দিয়ে এদেশের অমুসলিম জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের জাতি সত্ত্বার বহির্ভূত নয়। কিন্তু তারা এ দেশীয় জাতিসত্ত্বার মূল দিক নির্ণায়কও নয়। যে সব ঐতিহাসিক রাজনৈতিক আদর্শিক আন্তর্জাতিক উপাদান সমন্বয়ে বাংলাদেশের জাতি সত্ত্বার স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে তার মূল ধারা (main stream) হচ্ছে মুসলিম চেতনাবোধ। তবে এ চেতনাবোধ অন্যান্য চেতনাবোধ যেমন- বাংলাদেশী বা বাঙালী চেতনাবোধের বিরোধী নয় যতক্ষণ এসব চেতনাবোধ মুসলিম চেতনাবোধকে বা এর প্রাধান্যকে অস্বীকার না করে।

বস্তুতঃ প্রতিটি অমুসলিম বাঙালী বা বাংলাদেশী যারা এদেশের নাগরিক তারা স্বাভাবিকভাবে এর জাতি-সত্ত্বার কাঠামোর আওতাভুক্ত। অবশ্য যারা যুগপৎ মুসলিম, বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী তারাই এর জাতিসত্ত্বার মৌল নিয়ামক শক্তি। আর যারা শুধু বাঙালী ও বাংলাদেশী অথবা শুধু বাংলাদেশী [যেমন-উপজাতিসমূহ] তারা রাজনৈতিকভাবে, ভৌগলিক ও ভাষাগতভাবে এদেশের জাতিসত্ত্বার সাথে যুক্ত, তারা জাতিসত্ত্বার নিয়ামক নয়- তারা একটি রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় সংযুক্ত মাত্র।

প্রসংগতঃ এ সূত্রটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটি জাতির জাতিসত্ত্বা নির্ধারিত হবে সে জাতির প্রধান জনগোষ্ঠীর চেতনাবোধ দ্বারাই। জাতি-চেতনার মূল ধারাই হচ্ছে জাতিসত্ত্বার নিয়ামক। তাই অন্যান্য সমস্ত অপ্রধান জনগোষ্ঠী বা গৌন ধারার উপস্থিতি বা সংযোজন কোন ক্রমেই তার মূলধারা বা পরিচয়কে নস্যাৎ

www.nagorikpathagar.org

করতে পারেনা। সে মূল ধারাই হচ্ছে জাতি পরিচিতি ও জাতি-সত্ত্বার মূল সূত্র-এর অপ্রধান অংশ বা গৌন ধারাগুলো নয়। অবশ্য জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী অন্যান্য অপ্রধান জনগোষ্ঠীকে জাতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বা রাজনৈতিকভাবে পৃথক মনে করার কোন প্রয়োজন নেই বরং তা অকল্যাণকর। তাই একটি সাধারণ বা সংযুক্ত পরিচয়ের আওতায় বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমস্ত অপ্রধান অংশগুলোকেও সংযুক্ত করে নিতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে স্ব স্ব স্বকীয়তা ও অধিকার বজায় রেখেই। ইসলামের ইতিহাসে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মদীনায় হিজরাতের পর সেখানকার ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে একটি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে[১০৩] [যা ইতিহাসে মদীনার সনদ নামে খ্যাত] তাদেরকে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক ও মদীনাবাসী এ সাধারণ পরিচয় সূত্রে আবদ্ধ করে নেন। মদীনায় ইসলামী জাতিসত্ত্বার বিকাশ ও প্রাধান্য বজায় রেখেই অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোকে একটি সাধারণ রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। মূলতঃ ইসলামী তত্ত্ব ও ঐতিহ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের অমুসলমান অধিবাসীগণ এদেশের ইসলামী চেতনা নির্ভর জাতিসত্ত্বার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও এর রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি অনুগত থাকলে এর জাতি সত্ত্বার আওতাভূক্ত হতে বাধা নেই। কাজেই এদেশের জাতি সত্ত্বার মূলদিক বা নিয়ামক হিসেবে মুসলিম চেতনাবোধকে মেনে নিলেও এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ খৃষ্টান ও উপজাতিগুলো এদেশের জাতিসত্ত্বা থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন মনে করার কোন কারণ নেই।

উপসংহার

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হলো যে বাংলাদেশের মানুষের জাতি সত্ত্বার তিনটি পরিচয় রয়েছে-বাঙালী, বাংলাদেশী ও মুসলিম। বাঙালী বাংলাদেশী ও মুসলিম-এ তিনটি উপাদান সমন্বয়েই আমাদের জাতিসত্ত্বার আসল ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। এ তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে 'বাংলাদেশীত্ব' আমরা অর্জন করেছি তার সংগে ইসলামের সম্পর্ক গভীর। একইভাবে আমাদের 'বাঙালীত্ব'ও কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনেক চড়াই উৎড়াই পার হয়ে মুসলিম ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছে। মুসলিম পরিচয় বাদ দিয়ে আমাদের 'বাঙালী' বা 'বাংলাদেশী' পরিচয় বিগত সহস্র বছরের ইতিহাস এবং জনগণের মন-মনন ও আশা-আকাঙ্খার সাথে সংগতিশীল নয়। আমাদের বাঙালী ও বাংলাদেশী পরিচয় মুসলিম পরিচয়ের সংগে সম্পর্কযুক্ত ও তার প্রভাবাধীন। এ বিষয়টি এত স্পষ্ট যে এদেশবাসীর মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

পরিচয়কে সাম্প্রদায়িকতা * বলে আখ্যায়িত করে ঐতিহাসিক ও বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

অন্যদিক থেকে বলা যায় অনন্তঃ বাংলাদেশের মানুষের 'বাঙালী জাতিসত্ত্বা' 'বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বা' ও 'মুসলিম জাতিসত্ত্বা' এক দেহে লীন।

তাই কোন বিশেষণ বিযুক্ত 'বাঙালী' বা 'বাংলাদেশী' বললে বাঙালী মুসলিম বা বাংলাদেশী মুসলিম বুঝাই সংগত। মুসলিম নয় এমন বাঙালীকে বা বাংলাদেশীকে বুঝাতে হলে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিচয়সূচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত। যেমন বাঙালী হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি অথবা ভারতীয় বা পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী ইত্যাদি। অবশ্য রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় এখানকার অমুসলিমগণও এদেশের জাতীয়তার আওতাভুক্ত থাকবে।

---

* *অনেকে বিশেষ করে পাশ্চাত্যপন্থী ডান ও বাম উভয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা ধর্মের/ইসলামের প্রসঙ্গ আসলেই সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার করে বসেন। তারা সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি যেভাবে চয়ন করেন তাতে নেতিবাচক অর্থই প্রকাশ পায়। এ শব্দ দিয়ে তারা সাধারণতঃ বিশেষ কোন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বিরোধী প্রবণতাকেই বুঝেন। কিন্তু কথা হলো যে সম্প্রদায় শুধু ধর্মের ভিত্তিতেই গঠিত হয় না; বংশ গোত্র-অঞ্চল-বর্ণ-পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতেও গঠিত হতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা শব্দের মধ্যে (যেভাবে বর্তমানে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে) প্রধানত নেতিবাচক দিকটাই বিদ্যমান, নিজের সম্প্রদায়ের উপকারের চেয়ে বা স্বার্থের চেয়ে অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধীতার দিকটাই প্রবল। তাই ধর্ম পরিচয়ে যদি অন্যের বিরোধীতা হবে বলে মনে করা হয় তাহলে যে কোন পরিচয়কেই তো অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সম্ভব। যদি বাঙালী বলেন তো তা কি অনিবার্যভাবে অবাঙালী বিরোধীতা? বাংলাদেশী পরিচয় কি যৌক্তিকভাবে অবাংলাদেশীদের সাথে সংঘাত বুঝায়? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে ইসলাম বা মুসলিম বললে তা অনিবার্যভাবেই হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরোধীতা হবে কেনো?*

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম পরিচয় একটি ইতিবাচক পরিচয়। ইসলামী বিশ্বাস ও আদর্শ এবং তা অনুসরণের কারণেই কেউ মুসলিম। কোন মুসলিম জনগোষ্ঠী তার আদর্শ ও বিশ্বাসগত কারণেই মুসলিম উম্মাহ্‌র অংশ। একে অস্বীকার মানে ইসলামী তত্ত্বকে অস্বীকার করা। কেউ চাইলে ইসলামকে অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু ইসলাম মানেন না বলে ইসলামী তত্ত্ব পরিবর্তনের অধিকার তো কেউ পেতে পারেন না।

এদেশের জনগণ নিজেদের মুসলমান বলে মনে করে। এ পরিচয় তার বিশ্বাসগত, মনোজাতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত। এ পরিচয় বা তার মুসলিম সত্ত্বা কেউ জোর করে দেয়নি। বলপূর্বক কেউ এদেশবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করেনি বরং স্বেচ্ছায় এদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নিজদের মুক্তির দিশারী হিসেবে ইসলাম কবুল করেছে। এবং বিগত এক হাজার বছর ধরে তা ক্রমবর্ধমান হারে লালিত হচ্ছে।

এখন যদি কেউ মুসলমান বলে স্বীকৃতি দেয় তাহলে অবশ্যই ইসলামী তত্ত্বকে গ্রহণ করার ও অনুশীলন করার চেষ্টা চালাতে হবে। ইসলামী পরিচয় ও মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আমাদের দেশের জনগণের ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকতে পারে কিন্তু তাদের মনোজগতে কি ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার কোন অভাব রয়েছে? নিশ্চয়ই একথা কেউ বলবেন না, প্রমাণ করতে পারবেন না। কেউ কেউ মনে করেন যে এদেশের মানুষ ইসলামকে নিজদের মতো করে গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজদের মতো করে গ্রহণ ও অনুশীলনের কারণ অনীহা বা অশ্রদ্ধা নয় বরং ইসলামের সঙ্গে অসঙ্গতিশীল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব যা বিভিন্ন সময়ে রাজতন্ত্র, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের মোড়কে দেখা দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশ মানে আমাদের তিনটি দিকের বিকাশ, ইসলামের আওতায় আমাদের বাঙালীত্ব ও বাংলাদেশীত্বকে পুষ্টিদান। তাই বাঙালী, বাংলাদেশী ও মুসলিম পরিচয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি* বা একটিকে আরেকটির বিপরীতে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা আমাদের জাতীয় বিকাশের পথে তীব্র বাধা। বরং এক গভীর ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রকে রুখতে হবে।

তাছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে যে ভাষা-দেশ-গোষ্ঠী-যুগ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে একই ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেও কোন কোন ব্যাপারে পার্থক্য সূচীত হতে পারে (বিশেষভাবে প্রাকৃতিক ও তাত্বিকে উদ্ভুত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে)। ইসলামে এর অবকাশ অবশ্যই রয়েছে। অনেক আধুনিকতাবাদী পন্ডিতই সমাজে ইসলামের ভূমিকা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুতঃ ইসলাম দুনিয়ার তাবৎ বাস্তব-প্রাকৃতিক পার্থক্যকে অস্বীকার করে নয় বরং স্বীকার করে নিয়েই ঐক্যের কথা বলেছে- একটি সাধারণ সূত্র পেশ করেছে। এজন্য ইসলামী বিধানে অনুমতির (মুবাহ) ক্ষেত্রটি অনেক ব্যাপক, অনেক প্রশস্ত যার আওতায় সবাই তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন রেখেই বিকাশের পথে এগুতে পারবে। ইসলাম দুনিয়ার প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীকে তার স্ব-স্ব পরিচয় বিলুপ্ত না করেই মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আর সে পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার জন্য তার বাঙালী বা বাংলাদেশী পরিচয়কে পরিহার করার প্রয়োজন নেই-অবশ্য ঐসব পরিচয় কোন অবস্থাতেই ইসলামের বিপরীত চেতনাধর্মী হতে পারবেনা।

কাজেই মুসলিম পরিচয় বা ইসলাম অনুযায়ী জীবন গঠনকে যারা সাম্প্রদায়িকতা বুঝেন তারা চূড়ান্তভাবেই ভ্রান্ত আবার মুসলিম পরিচয়ের উপর প্রাধান্যদানকারী অন্য কোন পরিচয়ের সুযোগ ইসলামে সম্ভব বলে যারা মনে করেন তারাও ইসলাম সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞ।

** একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর জাতীয়তা ও জাতি-সত্ত্বার ভিত্তি যে ইসলাম তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ইসলাম কি মুসলমানদের অন্য কোন পরিচয় স্বীকার করে না? তার জাতি-সত্ত্বায় অন্য কোন উপাদান সংযোজন কি ইসলামে অভিপ্রেত নয়? পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে মানুষের প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে বিশেষ করে ভাষা ও বর্ণের পার্থক্যকে স্বীকার করেছে। এমনকি শুধু স্বীকৃতি নয় বরং এগুলোকে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছে।*

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও জমীনের সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য। বস্তুতঃ এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্যে" (৩০ঃ২২)। এথেকে বুঝা যাচ্ছে যে ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য স্বাভাবিক। একে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। তবে এসবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বেরও কিছু নেই। ইসলাম স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত ভাষা ভিত্তিক পরিচয়-বাঙালী, আরবী, ফার্সী, ইংরেজ ইত্যাদির স্বীকৃতি দেয়, তাই এসবের অস্বীকৃতি বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষের দৈহিক আকার আকৃতিও বর্ণের যে পার্থক্য তাও স্বাভাবিক।

কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে উৎস বিচারে সমস্ত মানুষ একই রকম হলেও পারস্পরিক পরিচিতির জন্যে আল্লাহ্ মানুষকে বিভিন্ন জাতিগোত্রে বিভক্ত করেছেন যেমন -

"হে মানুষ, আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদিগকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচয় লাভ করতে পারো। তবে তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত যারা সর্বাধিক নীতিপরায়ণ ও মুত্তাকী" (৪৯ঃ১৩)

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ হিসেবে সবাই এক, তবে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী যে গড়ে উঠেছে তাও স্বাভাবিক এবং এসব পরিচয়েরই মাধ্যম। কিন্তু সে সব অবশ্যই শ্রেষ্টত্ব বা নিকৃষ্টত্বের মানদন্ড হতে পারবে না। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে কার্যক্রম ও নীতি পরায়ণতার উপর-ভাষা, রক্ত, বর্ণ, গোত্র ও জাতিত্বের উপর নয়। এই জন্যেই ইসলাম ভাষা, বর্ণ, গোত্র, জাতি ইত্যাদির পার্থক্য

www.nagorikpathagar.org

স্বীকার করলেও জাত্যাভিমান, গোত্রাভিমান, প্রাকৃতিক উপাদান ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে স্বীকার করেনি।

তাছাড়া পবিত্র কোরআনে 'নুহের জাতি' আদজাতি, মাদায়েন বাসী, বনি ইসরাইল ইত্যাদি গোত্র ভিত্তিক ও অঞ্চল ভিত্তিক জাতিগুলোকে সে পরিচয়েই বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলাম ভাষা, দেশ গোষ্ঠীভিত্তিক জাতীয় পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু সে পরিচয় ইসলামী সীমার ভিতরে-বাইরে নয়।

টীকা

১. *Lucian pye, "Identity and Political culture" in Binder et al. Crisis and Sequences in Political Development, Princeton N. J. princeton University Press, 1972, pp 73-74.*

২. *Lucian W. Pye, Aspects of Political Development, Boston, Little, Brown and company (Inc) 1966, P-63.*

৩. *C. W. Welch Jr (ed) Political Modernization, A Reader in the compartaive Change, California, Duxbury press, 1977, p-168.*

৪. *Rounaq Jahan, Pakistan : Failure in National Intergration, Columbia University press pp 2-3.*

৫. *A.F.K. Organski, The Stages of Political Development, New York, Knopf, 1965, pp. 3-7.*

৬. *Robert A Nisbet, Social Change and History, New York, Oxford University Press. 1969, pp 166-188.*

৭. *বদরুল আলম খান (সম্পাদক), "বাংলাদেশ ঃ ধর্ম ও সমাজঃ সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮, সাখাওয়াত আলীর প্রবন্ধ পৃঃ ১০৪-১০৫।*

৮. *Ram Gopal, Indian Muslims : A Political History, Bombay, Asia Publishing House, 1964, p-231.*

৯. *মূল লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিলো। দেখুন লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণী ঃ Kalim Siddiqui, Conflict Crisis and War in Pakistan, Macmillon, London 1972. Appendix pp-186-87.*

১০. *Istaq H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, Karachi University Press, 1969, pp. 114-137.*

১১. *M. H. Saiyid, Muhammad Ali Jinnah, A Political Study, Shah Muhammad Asraf, Lahore, 1962, pp. 322-329, 296-297.*

www.nagorikpathagar.org

১২. *Stanly Wolpert, Jinnah of pakistan, Oxford University press, New york, p. 182.*

১৩. *Percival Spear; India, Pakistan and the West, 3rd ed. London. 1965, p-76.*

১৪. *Cited in khalid B. Sayeed, The Political Systems of Pakistan, Boston, 1967, p-40.*

১৫. *Cited in G, W. Chowdhury : Constitutional Development in Pakistan, London, Longman, 1959, pp.. 63-64.*

১৬ *আব্দুল হক, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসংগ, বই ঘর চট্টগ্রাম, ১৩৮০ বাংলা, পৃঃ ৪২-৪৮।*

১৭. *Cited in Rupert Emerson, From Empire to Nation, Cambridge, Massachusets 1967, p-163.*

১৮. *Howard Scheman, "A Note on the Rise of Mass Nationalism in East Pakistan, (An unpasblished paper presented at the National Seminer on Pakistan, Columbia University Feb. 1972) quoted in Rounaq Jahan op-cit p-197-194.*

১৯. *বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি।*

২০. *অধ্যাপক মুয়াযযম হোসেন খান, মুজিববাদ, বর্ণমালা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭১, পৃঃ ৪৭-৪৮।*

২১. *বাংলাদেশের সংবিধান, পঞ্চম সংশোধনী।*

২২. *বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ইশতেহার, ১৯৮০।*

২৩. *Jushep, R. Gusfiedd, "Tradition and Modernity. Misplaced polarities in the study of social change" in jousions L. Frinke and Richard W. Gabls (ed) Political Development and Social Change (2nd Edition) john Willey and Sons, Inc New York p. 19.*

২৪. *জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতিসত্ত্বা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন*

a. *Hans. Cohn: The Idea of Nationalisim, Its Origin and Background, New York, 1944.*

b. *Solo W. Baron ; Modern Nationalism and Religion, 1927.*

c. *Luigo : Nationalism and Internationlism, New York, 1926.*

d. *J. H. Carlton Hays : Eassays on Nationalism, New York, 1926.*

www.nagorikpathagar.org

২৫. *Dr. Ali Muhammad Naqavi, Islam And Nationalism, Islamic Propagation Organisation, English translation : Alaiden pazaradi, Tehran, 1988, p-56.*

২৬. *ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পাদনা) বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), ভূমিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮০ বাংলা।*

২৭. *বিস্তারিত আলোচনা ও রমেশ চন্দ্র মজুমদারের আপত্তির জবাব জানার জন্য দেখুন ঃ আবদুল করিম, 'বঙ্গঃ বাঙালাঃ বাংলাদেশ', মানব উন্নয়ন বক্তৃতা, উচ্চতর মানব গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭।*

২৮. *অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ১-২।*

২৯. *ডঃ এনামুল হক, মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, পৃঃ ১-২.*

৩০. *আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ ১৩.*

৩১. *The Lahore Resolution of 1940 quoted in Kalim Siddiqul, Conflict, Crisis and War in Pakistan, Appendix, Macmillon, London 1972.*

৩২. *আবুল মনসুর আহমদ, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১ পৃঃ ১৯.*

৩৩. *Luigo, Nationalism and Intenationalism, New York, 1946, p-25*

৩৪. *ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা।*

৩৫. *Quoted in Dr. Ali Muhammad Naqavi, Islam and Nationalism, op. cit p-56.*

৩৬. *International Encyclopedia of Social Science vol. 11 & 12, Macmillon and Free press. New York, 1972, Article : Nation.*

৩৭. *Dr. Ali Muhammad naqavi, Islam, and Nationalism, op cit. 5-57.*

৩৮. *গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড, মুক্তধারা, ১৯৮০ পৃঃ ৪.*

৩৯. *আল কুরআন ৫৫ঃ ২-৩*

৪০. *আল কুরআন ৩০ঃ ২২*

৪১. *ঊনিবিংশ শতকের শেষপাদে এক শ্রেণীর অভিজাত মুসলমানদের প্রভাবে এ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ প্রবণতা ছিলো একটি মধ্যবর্তী (ট্রানজিসনাল) অস্থায়ী ধরনের। দ্রষ্টব্য ঃ Rofiudin Ahmed. The Bengal Muslims 1871-906, A quest for Identity, oxford University press Delhi, 1981, p, 106-111.*

৪২. *আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ১০৭*

৪৩. *অধ্যাপক মোয়ায্যম হোসেন খান, মুজিববাদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২*

৪৪. *আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯*

www.nagorikpathagar.org

৪৫. বাংলাদেশের কালচার, আবুল মনসুর আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৫, পৃঃ ২৫

৪৬. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুনঃ আহমদ আবুদল কাদের, আমাদের মাতৃভাষাঃ আদর্শিক প্রেক্ষিত, তাহজীব, ৮ই ফাল্গুণ ৯৪ স্মরণীকা, যুগের ডাক সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা।

৪৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সভাপতির অভিভাষণ, (১৯৪৩ সালে ঢাকার মুসলিম হল মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম অধিবেশনে পঠিত), উদ্ধৃতিঃ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য (সম্পাদনা) সরদার ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ১২৩।

৪৮. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, বর্ণমিছিল, ঢাকা ১৯৭৮, পৃঃ ২৬.

৪৯. আহমদ ছফা, বাঙালী মুসলমানের মন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮১, পৃঃ ৫৪

৫০. Nationalism and Internationalism, op. cit. p-25.

৫১. ফ্যাসিবাদ বর্ণবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুনঃ Mein kamph (My struggle) Adlof Hitlar, Houghton Naiffin Company, Boston, 1943 chap, xi, "Nation and Race" pp: 284-296 quoted in Maryam Jameelah, Western Civilization Condemed by Itself, vol. 1. Mohammad Yusuf Khan, Lahore 1976, chapter vi. "The Doctrine of white Supremacy," pp: 93-102.

৫২. Dr. Ali Mohammad Naqavi, Islm and Nationalism, op. cit. p-59.

৫৩. আল কুরআন- ৪৯ঃ১০

৫৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ঃ ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) পৃঃ ২৯-৫০

৫৫. অজয় রায়, বাংলা বাঙালী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩-১৫

৫৬. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৫-১৬

৫৭. হেসের মতে সাধারণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহ্য হচ্ছে জাতি গঠনের মৌল উপাদান। J. H. Carlton Hays: Essays on Nationalism. New york, 1926, p-9

৫৮. ধর্মমুখী-সমষ্টিসূচক (Sacred, Collective) ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ঃ David E. Apter; The Principles of Modernization, Chicago, University of Chicago press, 1965, pp: 22-42.

৫৯. গোপাল হালদার; সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা ১৯৮৪, পৃঃ ১৯৪

৬০. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ পৃঃ ১০৬

৬১. আবুল মনসুর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৭

৬২. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৯৫

www.nagorikpathagar.org

৬৩. *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ) ১৯৩৯, উদ্ধৃতি ঃ আবুল মনসুর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮২*

৬৪. *রাজনৈতিক কৃষ্টির সংজ্ঞা সম্পর্কে জানার জন্যে দেখুন ঃ*

a. *Sidney Verba, 'Comparative Political Culture' in Lucian Pye and Sidney Verba, eds. Political Culture and Political Development, Princeton University press, 965, p 513*

b. *Lucian Pye, litial Culture, op cit. 0-218.*

c. *Gabrial Almond and G. Bingham Powell, jr. Comparative Politics & Developental approach, Boston : Little Brown & co. 1966, pp. 32-33*

৬৫. *ইসলামী রাজনেতিক কৃষ্টি সম্পর্কে জানার জন্যে দেখুন ঃ*

Kalim Siddiqui, Struggle for the Supremacy of Islam-Some Critical Analysis in Kalim Seddiqui (ed), Issues in the Islamic Movement, 1981-82. The Open Press Limited. London 1983. pp : 15-18.

৬৬. *International Encyclopedia of Social Scinces, vol 11 & 12. op cit. pp 9-13*

৬৭. *আহমদ শরীফ, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬*

৬৮. *গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৫*

৬৯. *ঐ, পৃঃ ৭২*

৭০. *বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ঃ*
আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম পূর্বোক্ত পৃঃ ৬৪-৬৯

৭১. *ঐ, প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ৭০-৭৭*

৭২. *প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ৮৮-৯১*

৭৩. *প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ১০৮-১১৬*

৭৪. *প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ১৪৩-১৪৮*

৭৫. *আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃঃ ৪৭-৪৮*

৭৬. *প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ১৭১-১৮২*

৭৭. *তালেবুর রহমান, সর্বহারাদের পাকিস্তান, পৃঃ ১২, উদ্ধৃতি ঃ মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ সাহিত্য-সংস্কৃতি জাতীয়তা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৪ বাংলা, পৃঃ ৯৭-০৮*

www.nagorikpathagar.org

৭৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখুন ঃ
ডব্লিউ হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, বাংলা অনুবাদ এম, আনিসুজ্জামান, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮২ এবং ওহাবী আন্দোলন, আব্দুল মওদুদ, আহম পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৯।

৭৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখুন ঃ
Dr. Mainuddin Ahmed khan, Muslim Struggle for Freedom in Bengal (1757-1947), Islamic Foundation, Dhaka, 1982.

৮০. আহমদ ছফা, বাঙালী মুসলমানের মন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫

৮১. দেখুন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা "শিবাজী উৎসব" ও "বন্দী বীরঃ

৮২. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯

৮৩. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১।

৮৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঐতিহ্য ও ইতিহাস; সালাহউদ্দীন আহমদ, (স্বাধীনতা প্রবন্ধ সংকলন) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৫৮।

৮৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, সংযোজন-১, পৃঃ ৭৯৩

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮৪

৮৭. পূর্বোক্ত, তৃতীয় খন্ড, স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, পৃঃ ৪

৮৮. পূর্বোক্ত, তৃতীয় খন্ড, বাংলাদেশ ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, পৃঃ ৯৭১

৮৯. বদরুদ্দীন উমর, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ দৈনিক আজকাল, কলকাতা, ৬ এপ্রিল, ১৯৮৮, উদ্ধৃত ঃ "বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবহার" সংস্কৃতি প্রকাশনী, তারিখ উল্লেখ নেই। পৃঃ ৩৯।

৯০. ঐ, পৃঃ ২৫

৯১. ঐ, পৃঃ ২৬

৯২. পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের সামষ্টিক রূপ বুঝানোর জন্যে প্রধানতঃ 'উম্মাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'একটি একক লক্ষ্য অর্জনে সংগঠিত সমবিশ্বাসের অধিকারী মানব সমষ্টিকে উম্মাহ বলা হয়।' দেখুন, Dr. Ali Shariati, On the Sociology of Islam (English Translation, Hamid Algar), Mizan Press, Barkeley 1979 p 113

www.nagorikpathagar.org

৯৩. আল কুরআন-২১ ঃ ৯২

৯৪. ঐ, ৪৯ ঃ ১০

৯৫. ঐ, ৫ ঃ ৫৫, ৮ ঃ ৭২, ৯ ঃ ৭১ .

৯৬. ঐ, ৩ ঃ ১১৭, ৬০ ঃ ১;৯ঃ২৩, ৫ঃ৫১

৯৭. ঐ, ২ ঃ ১৪৩

৯৮. ঐ, ৩ ঃ ১১৩

৯৯. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত (উর্দু), ১ম খন্ড, ইসলামী জাতীয়তার অর্থ।

১০০. আল কুরআন ৫ ঃ ৫৬, ৫৮ ঃ ২২

১০১. Abul Fazal Ezzati, The Revolutionary Islam and Revolution, Ministry of Islamic Guidance, Islamic Republic of Iran, Tehran, 1981 p-85

১০২. Ahmad Abdul Quader. 'From Nation-State of Ummah-State : How?" (An Unpublished seminar paper). Muslim Institute, London, August 1985, p-8.

১০৩. মদীনার সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ঃ "মদীনার সনদঃ, (অনুবাদ) অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম। ইসলামী ফাউন্ডেমন পত্রিকা, বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.nagorikpathagar.org

বাঙালী জাতির মূল ধারা

একটি ফুটবল খেলার বিবরণ ঃ

"ইস্কুলের মাঠে বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ' মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নেই। হঠাৎ ওরে বাবা-একি রে! চটাচট্ শব্দ এবং মারো শালাকে, ধরো শালাকে। কি এক রকম যেন বিহবল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতোমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ করিয়া ভাঙ্গিল এবং আরও গোটা দুই-তিন মাথার উপরে, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাত জন মুসলমান ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে পালাইবার এতটুকু পথ নাই।"

উপরোক্ত কথাগুলো শ্রীকান্তরূপী প্রখ্যাত বাংলা ঔপন্যাসিক শরৎ চন্দ্রের। খেলার একপক্ষ বাঙ্গালী ছাত্র অপর পক্ষ মুসলমান ছাত্র। এ মুসলমান ছাত্রগুলো কারা, তারা কোথাকার? কোন ভাষায় তারা কথা বলতো? বলাই বাহুল্য, খেলার মাঠের মুসলমান ছাত্রগুলো কথিত বাঙালী 'ছাত্র'দেরই নিজ এলাকার, তাদের ভাষাও বাঙলা, ঠিক ঐ 'বাঙালী ছাত্র'দের মতোঃ ধরো শালাকে, মারো শালাকে। আর কথিত 'বাঙালী ছাত্র' যে হিন্দু ছাত্র তা আর না বললেও চলে। বস্তুতঃ খেলাটা হচ্ছিলো হিন্দু ছাত্র ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে। শরৎ বাবু হিন্দু ছাত্রদের পরিচয় দিলেন বাঙালী বলে আর বাংলাদেশের অধিবাসী ও বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান ছাত্রদের তিনি বাঙালী বলে স্বীকার করলেন না। বস্তুতঃ বাংলা তেরো শতক থেকেই এদেশীয় মুসলমানদের বাঙালী বলে স্বীকার না করার প্রবণতা ও মানসিকতা হিন্দুদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দেয়। এ প্রবণতা বাংলা চৌদ্দ শতকেও যে অব্যাহত ছিলো তার প্রমাণ ১৩২২ সালে প্রকাশিত ঐ লেখাটি। আজ ঐ কথিত 'বাঙালীদের' বাঙালীত্বের সাথে এদেশীয় মুসলমানদের 'বাঙ্গালীত্বের' তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন যে প্রকৃত বাঙালী কারা? বাঙ্গালীত্বের মূল প্রতিনিধি কি ঐ কথিত বাঙালীরা? না কি ভিন্ন কেউ?

একটি জাতির মূলধারা অনুসন্ধানের জন্যে সে জাতির ভুগোল, ভাষা, নৃতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাঙ্গালী জাতির মূলধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও আমরা উপরোক্ত চারটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাবো।

ভৌগোলিক বিশ্লেষণ

ভৌগোলিকভাবে যারা বঙ্গের অধিবাসী, বঙ্গই যাদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি তারাই ভুগোল বিচারে বাঙালী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃত বঙ্গ বলতে কোন অঞ্চলকে বুঝায়?

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ বৃহত্তর বাংলা বলতে বুঝেনঃ বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসামের কাছাড় ও গোয়ালপাড়া, বিহারের পূর্ণিয়া, সিংহভুম ও সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ এবং ত্রিপুরা। (ডঃ রমেশ চন্দ্র, মজুমদার, বাংলাদের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১)। তবে মুসলমানদের আগমনের সময় উপমহাদেশের এই অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিতি ছিলো। যেসব জনপদ নিয়ে সমগ্র পূর্বাঞ্চল গড়ে উঠেছিলো সেগুলো ছিলো প্রধানত বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, বরেন্দ্র, রত্নদ্বীপ ইত্যাদি। মূল বঙ্গ ছিলো খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঢাকা এবং চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদের একাংশ ও নদীয়া জিলা নিয়ে গঠিত ভূ-ভাগ। অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের সীমানা উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, পশ্চিমে ভাগীরথী ও করতোয়া এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। (অধ্যাপক আবদুল করিম, বঙ্গ, বঙ্গাল, বাংলাদেশ, মানববিদ্যা বক্তৃতা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭, পৃঃ-২৫)। আর সমতট গঠিত ছিলো বরিশাল, নোয়াখালী ও কুমিল্লার অংশ বিশেষ নিয়ে। বঙ্গ ও সমতটের পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলাকা ছিলো হরিকেল। বংগের উত্তরে রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্র জনপদ এবং তার উত্তরে দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং নিয়ে ছিলো রত্নদ্বীপ জনপদ। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলো নিয়ে ছিলো রাঢ় জনপদ। উল্লেখিত ছয়টি জনপদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি জনপদের সীমানা মোটামুটি সুনির্দিষ্টই রয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব থেকেই বঙ্গের অধিবাসীদের বুঝাবার জন্যে সেখানে 'বঙ্গাল' শব্দটি বহুল প্রচলিত ছিল। (দ্রষ্টব্য, আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২২৫)। এই 'বঙ্গাল' শব্দটিই পরবর্তীতে 'বাঙ্গালায়' রুপান্তরিত হয়েছে (ঐ, পৃঃ ২৫)।

মোগল আমলে উল্লেখিত বিভিন্ন জনপদকে একত্রিত করে নাম দেয়া হয় সুবে বাংলা। আর তখন থেকে বঙ্গ, রাঢ়, সমতট ইত্যাদি জনপদগুলোর সম্মিলিত নাম বাংলা বলে পরিচিতি লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মূল বঙ্গই অন্যান্য ভূ-ভাগকে অঙ্গীভূত করে বৃহত্তর বঙ্গ বা বাংলায় পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির মাধ্যমে পূর্বতন রাঢ় জনপদ ও তদসঙ্গে ভাগীরথীর পূর্ব তীরের মূল বঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে পশ্চিম বঙ্গ গঠন করা হয়। আর 'মূল বঙ্গের' সাথে সংযুক্ত প্রাচীন সমতট, বরেন্দ্র, হরিকেল ইত্যাদি ভূ-ভাগ নিয়ে গঠিত হয় পূর্বাংশ তথা পূর্ব পাকিস্তান। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানই আজকের বাংলাদেশ। বর্তমান বাংলাদেশেরই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে মূল বঙ্গ এবং তার অধিবাসী বঙ্গাল তথা বাঙালী জাতি। কাজেই ভৌগোলিকভাবে "বঙ্গ ও বাঙালীত্বের" মূল উত্তরাধিকারী আজকের বাংলাদেশ ও তার অধিবাসীরা। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় মূল বঙ্গের বাইরের ভূ-ভাগ। রাঢ় বঙ্গের অধিবাসীরা মূল বাঙালী বা বাঙ্গালদের প্রতিনিধিত্ব করে না। ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিম সীমানার মধ্যে সুস্পষ্ট ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য

www.nagorikpathagar.org

তুলে ধরে ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হওয়ার প্রাক্কালে বাউন্ডারী কমিশনের নিকট শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ভাগীরথী নদীকে সীমানা নির্ধারণ করার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন যে, "ভাগীরথীর পশ্চিম ও পূর্ব অংশে সংস্কৃতিগত প্রভেদ রয়েছে। পশ্চিম অংশের লোকেরা পূর্ব অংশের লোকদের বলে 'বাঙাল' আর পূর্ব অংশের লোকেরা পশ্চিম অংশের লোককে 'ঘটি' বলে ডাকে"। (আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪) অতএব, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক বিচারে প্রকৃত 'বঙ্গ' ও বাঙালীদের মূল প্রতিনিধিত্ব করছে আজকের বাংলাদেশ ও তার অধিবাসীরা। অর্থাৎ বাংলাদেশই প্রকৃত বঙ্গ বা বাংলা এবং বাংলাদেশীরাই প্রকৃত বাঙালী। আবার জনসংখ্যার বিচারে মূল বঙ্গ তথা বাংলাদেশের প্রায় শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। আর 'বাংলা' ভাগও হয়েছিলো হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে।

তাছাড়া পূর্ব থেকেই মূল বঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলো মুসলমান। অর্থাৎ অধিকাংশ বাঙালী ছিলো মুসলমান। কাজেই বাংলাদেশ যেমন প্রকৃত বাংলা তেমনি প্রকৃত বাঙালীর অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান জনগোষ্ঠী। তাই বলা যায় মুসলমানরাই আজকের বাঙালী জাতির মূল অংশ। তারাই বাঙালী জাতির মূল ধারার বাহক। আর পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বিশেষতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের লোকেরা ভূগোল বিচারে প্রকৃত বাঙালী নয়। তারা মূলতঃ রাঢ়ীয়, বর্তমানে ভারতীয়। অতএব ভৌগোলিক বিশ্লেষণে বাঙালী জাতির মূল ধারা বাংলাদেশ ও মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত।

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

একটি জাতির বর্ণ-গোষ্ঠীগত পরিচয় জানার জন্যে জাতির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাঙালী জাতির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ জাতি একটি শংকর জাতি। নেগ্রিটো অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়, ভোটচানীয়, আর্য-সেমিটিক সব ধরনের জাতিগোষ্ঠী ও রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে এখানে। তবে বিভিন্ন জন ও জাতির রক্তের মিশ্রণ থাকলেও এই জন প্রবাহের মূল অংশ গড়ে উঠেছে দ্রাবিড় দ্বারা। বিশেষ করে বাঙালীর রক্ত ও দেহ গঠনে আদি- নর্ডিড (অর্থাৎ আর্য) জনের রক্ত ও দেহ গঠন বৈশিষ্ট্যের দান অত্যন্ত অল্প" (নীহার রঞ্জন রায়, বাংলার ইতিহাস আদি পর্ব" ১৩৫৯)। কেননা আর্য জাতির আসার পুর্বেই বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়েছিল এবং তারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল। (রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস,আদি পর্ব, পৃঃ-২০)। কাজেই এতটুকু অন্তত বলা যায় যে, বাঙালী একটি শংকর জাতি হলেও এর অধিকাংশ জনগোষ্ঠী অনার্য শ্রেণীভুক্ত। এ অনার্যরাই ইতিহাসের কোন স্তরে জৈন ধর্ম, কোন স্তরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের পুর্বে এখানকার অধিকাংশ জনগণ ছিলো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, বাকিরা ছিলো অনার্য অন্তজ, শুদ্র শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। মুল হিন্দু অর্থাৎ বর্ণবাদী বৈদিক আর্যের

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যা ছিলো অনুল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং অনার্য অন্তজ শ্রেণীভুক্তরাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এর ফলেই বাঙালী জাতির জনসংখ্যার বেশীর ভাগ মুসলমান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। কাজেই বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশ হচ্ছে অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত। আবার অনার্যরাই হচ্ছে বাঙালী জাতির মুল অংশ। তাই বলা চলে এ দেশীয় মুসলমানরাই নৃতাত্ত্বিকভাবে মুল ও আদি বাঙালী। তাদের রক্তেই প্রবাহিত বাঙালীর রক্ত। তারাই প্রধানতঃ বহন করে চলেছে বাঙালীজাতির মুল ধারা। যারা খাঁটি হিন্দু অর্থাৎ আর্য- বর্ণ হিন্দু তারা কোনকালেই প্রকৃত বাঙালী ছিলো না। শুধু বুটিশ উপনিবেশিক আমলে কৃত্রিম বাঙালী সেজে বসেছে। তারা একযুগে অনার্য বাঙালীদের অসুর, দাস্য, ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করেছে, সংশ্রব এড়িয়ে চলেছে। এমনকি বৃটিশ যুগেও তারা পুর্ব বাংলা তথা মুল বঙ্গের অধিবাসীদেরকে বাঙাল বলে বিদ্রুপ করেছে। কাজেই বর্ণ হিন্দুদের খাঁটি বাঙালী বলে পরিচয় দেয়ার নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সুযোগ কম।

ভাষা বিচার

ভাষা বিচারে বাংলা যাদের আশৈশব নিজস্ব ভাষা তারা সবাই বাঙালী। বৌদ্ধ আমলে বাংলা ভাষার জন্ম হলেও মুসলিম আমলেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশ সাধিত হয়। মধ্যে ১২ শতকে সেন আমলে বাংলা ভাষাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র চলেছিলো। বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম না হলে হয়তো বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির বিলুপ্তি ঘটতো। ভাষাগত বাঙালীত্বের প্রকৃত বিকাশ মুসলমানদের হাতে সম্পন্ন হয়। উনিশ শতকে বাংলা ভাষাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর্য সংস্কৃতমুখী করার চেষ্টা করা হয়। প্রধানতঃ মুসলমানদের প্রচেষ্টায় এ ষড়যন্ত্র কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানী শাসকগণ বাঙলার বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাংলার মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। রক্ত দিয়েই বাঙালী মুসলমানরা বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। এখন বাঙালীদের একটি ও একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার একমাত্র বাঙালী রাষ্ট্রটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রও বটে। ইসলাম যেমন এখানকার রাষ্ট্র ধর্ম তেমনি বাংলা এখানকার রাষ্ট্রভাষা। তাই ঐতিহাসিকভাবে বাঙালী মুসলমানরা যেমন বাংলা ভাষার প্রকৃত উত্তরাধিকারী তেমনি বর্তমান বাংলা ভাষারও তারাই ধারক। রাঢ়ীয় পশ্চিম বঙ্গীয়রা বাঙালীত্ব গৌণ করে হিন্দিকে মেনে নিয়ে ভারতীয় হয়ে আছে। আর বাংলাদেশীরা রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে আকড়ে ধরে বাঙালী জাতিকে ধারণ করে আছে।

সংস্কৃতি বিচার

একটি জাতির সংস্কৃতি তার জাতীয়তার স্বরূপ নির্ধারণ করে। সংস্কৃতি হচ্ছে জাতির বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা, জীবন-পদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, নৈতিক, আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ, পরিবার ইত্যাদির সামষ্টিক রূপ।

www.nagorikpathagar.org

সংস্কৃতির দুটো প্রধান দিক রয়েছে- একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদানজাত আর অপরটি হচ্ছে ধর্মীয় আদর্শিক উপাদানজাত। প্রথমটি মোটামুটি স্থিতিশীল এবং ধীরভাবে বিবর্তিত হয়। দ্বিতীয়টি পরিবর্তনযোগ্য, রূপান্তরযোগ্য এবং কখনও কখনও বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। একটি জাতির সংস্কৃতির মধ্যে একাধিক সংস্কৃতির উপস্থিতি সম্ভব। সে ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ সংস্কৃতি মূখ্য ও নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। জাতির মূল ধারাও নির্ধারিত হয় ঐ মূখ্য সংস্কৃতির দ্বারাই। সংস্কৃতির গৌণ ধারাগুলো জাতির মূল চরিত্র ও পরিচয় নির্ধারক নয়।

বাঙালী জাতির সংস্কৃতিকে পর্যালোচনা করলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাবো যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে জীবন-ধারণের উপকরণ, খাদ্যাভ্যাস, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ জাতির বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট রয়েছে। মাছ-ভাত, দুধ, দই-ঘি, লাঙ্গল-গরু, বাঁশ-বেত-মৃৎপাত্র-শাড়ী গামছা, নৌকা প্রভৃতির প্রচলনের সঙ্গে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। আর সংস্কৃতির যে অংশটি ধর্মনির্ভর বাঙালী জাতীয় জীবনে তার কয়েকবার পরিবর্তন ঘটেছে। বাঙালীরা কখনও জৈন হয়েছে, কখনও বা বৌদ্ধ। তবে বাঙালীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কখনও 'বৈদিক হিন্দু' হয়নি। ১২ শতকে সেন আমলে বিশেষ করে বল্লাল সেনের সময়ে বাংলার বৌদ্ধ জনগণের উপর আর্য-বর্ণ-হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া হয়। তেরো শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এবং পরে নিপীড়িত বৌদ্ধ ও অন্তজ জনগোষ্ঠী বিপুলভাবে ইসলাম গ্রহণ করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হয়। মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব এখানকার অধিবাসীদের চিন্তা-চেতনায়, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদে সুস্পষ্ট। বিয়ে-তালাক, উত্তরাধিকার, উপাসনা সবই ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল বাঙালী ক্রমান্বয়ে মুসলমান হয়ে যাবার পর স্বাভাবিকভাবে বাঙালী জীবন ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে মুসলিম রূপ ধারণ করেছে। অবশ্য অন্যান্য ধর্মের প্রভাবও স্ব-স্ব ধর্মীয় গোষ্ঠীর উপর রয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত প্রভাব বাঙালী জাতির প্রেক্ষিতে গৌণ ও ভগ্ন সংস্কৃতি বই কিছু নয়। এখানকার সংস্কৃতির প্রধান ধারাটি স্পষ্টত মুসলিম ধারা। নামাজ, রোজা, ইফতার, ঈদ, মিলাদ, মহররম, শবেবরাত, শবেকদর, মসজিদ, মাহফিল, জানাজা, কুলখানি এখানকার সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। পূজা-অর্চনা, প্রতীমা এদেশে আছে বটে তবে তা জাতীয় বিষয় নয়। সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কাজেই সাংস্কৃতিক-আদর্শিক ক্ষেত্রে বাঙালী সংস্কৃতি মৌলিকভাবে মুসলিম ভাবধারাপুষ্ট এবং ক্রমান্বয়ে জনগণের মধ্যে সে ভাবধারা আরো বলিষ্ঠ, আরো প্রখর হচ্ছে। অতএব, বাঙালী সংস্কৃতির বিবর্তিত ধারা প্রধানতঃ মুসলিম ধারা। মুসলিম ধারার বাইরে কিছু কিছু গৌণ ও উপধারা লক্ষ্য করা যায় মাত্র।

কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী এমন আছেন যারা বাঙালী সংস্কৃতির নামে প্রাচীন বাংলার ধর্মবিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠানকে বড় করে তুলে ধরার পক্ষপাতী। আবার

www.nagorikpathagar.org

কেউ কেউ আছেন যারা হিন্দু-মুসলিম সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব ইত্যাদির যৌথ বা মিশ্রণকে বাঙালী সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ বলতে চান। কেউ কেউ তো যা কিছু ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কহীন অথচ বাংলাদেশে প্রচলিত তাকেই বিশুদ্ধ বাঙালী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব বুদ্ধিজীবীরা বাঙালী সংস্কৃতি সম্পর্কে অস্পষ্টতায় ভুগছেন অথবা জেনে শুনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।

আমরা আগেই বলে এসেছি যে, প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে যে জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ বাঙালী সংস্কৃতির অঙ্গ। তবে এসবের সঙ্গে যুগে যুগে যে ধর্ম বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ যোগ হয়েছে এবং আবার রূপান্তর ঘটেছে সেগুলো বাঙালী সংস্কৃতির স্থায়ী রূপ নয়, হতে পারে না। তবে ইতিহাসের কোন পর্যায়ে যদি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততায় বাঙালী জাতির জীবনে তা দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়ায় তাকে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ অবশ্যই বলা যাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা বলেছি যে, বাঙালী সমাজের হাজারো বছরের বিবর্তিত ও পরিস্রুত সংস্কৃতি সন্দেহাতীতভাবে ইসলামী রস সমৃদ্ধ। এবং তা-ই আজ বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। যারা বিভিন্ন ধর্মের যৌথ বা মিশ্রিত সংস্কৃতিকে বাঙালী সংস্কৃতি বলতে চান তারাও এ জন্য বিভ্রান্ত যে, ঈদ-মিলাদ, শবেবরাত-মহররম-সালাম-জানাজা-কুলখানি-মসজিদ-মাহফিল-নামকরণ-খোদা হাফেজ, কালেমা পড়ে বিয়ে আর দুর্গা, কালী, প্রতিমা, শিবাজী উৎসব, নমস্কার, ওঁ ইত্যাদির মিলিত কোন সাংস্কৃতিক রূপ নেই। এসব পরস্পর ভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক প্রকাশ। হ্যাঁ, এদেশে দুটো ধারাই লক্ষ্য করা যায়। তবে কোন ধারাটি বলিষ্ঠ ও জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে? ইসলামী রস সমৃদ্ধ ধারাটিই যে এখানে মুখ্য তা সজ্ঞানে অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই ঈদ ইত্যাদির সঙ্গে যারা পূজা পার্বণকেও বাঙালী সংস্কৃতির অঙ্গ বানাতে চান তারা যে বাঙালী সংস্কৃতির মূল ধারার গোড়াটিই কেটে দিচ্ছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা বাঙালী সংস্কৃতিকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান তারা যে বাঙালী জাতির মূল সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই লড়াইতে নেমেছেন তা তো সুস্পষ্ট।

উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হলো যে, বর্তমান বাংলাদেশই মূল বাংলা। এ দেশবাসী বিশেষ করে মুসলমানরাই প্রকৃত বাঙালী। ভূগোল-ভাষা-নৃতত্ত্ব-সংস্কৃতি সব বিচারেই মুসলমানরাই প্রধানতঃ বাঙালী জাতির মুখ্য অংশ-বাঙালীত্বের মূল ধারা। কাজেই ৮৪ বছর আগে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র কাহিনীটি যেভাবে শুরু করেছিলেন তাকে খানিকটা সংশোধন করে আজকে বাংলা পনের শতকের প্রেক্ষিতে হয়তো বলা যায় ঃ

"ইস্কুলের মাঠে বাঙালী ও হিন্দু ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই....." এটাই হোক বাংলা পনের শতকের প্রত্যাশা, অঙ্গীকার।

www.nagorikpathagar.org

বঙ্গভঙ্গ ও আমাদের জাতিসত্ত্বা

বঙ্গভঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বৃটিশ উপনিবেশিক সরকার প্রধানত প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে এর উদ্যোগ নিলেও তদানীন্তন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এর তাৎপর্য ছিলো সুদূরপ্রসারী। বঙ্গভঙ্গ ও তদসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে চেতনা ও স্বকীয়তা বোধের জাগরণ ঘটে তা এদেশের জাতিসত্তা গঠন ও বিকাশে ভিত হিসেবে কাজ করেছে। তাই আমাদের স্বকীয় স্বতন্ত্র জাতির স্বরূপ ও এর বিকাশের ধারা অনুধাবনে বঙ্গ ভঙ্গের ঐতিহাসিক ও ভাবাদর্শিক গুরুত্ব অপরিসীম।

শোষণের কবলে পূর্ব বাংলা

বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা শোষণের কবলে পতিত হয়। এ শোষণ ছিল দ্বিমাত্রিক। উপনিবেশিক শোষণ আর কোলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিম বঙ্গ তথা রাঢ়ভূমি কর্তৃক আঞ্চলিক শোষণ। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক রাজধানী মুর্শিদাবাদ স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা ছিল সবে বাংলার রাজধানী। এর আগে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পরও ঢাকা ছিল নায়েবে-নাজিমের রাজধানী তথা পূর্ব বাংলার রাজধানী। বস্তুত দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঢাকা ছিল বাংলাদেশের শাসক ও রাজনীতির কেন্দ্র। ঢাকাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধি-অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল-যা সুদূর ইউরোপকে পর্যন্ত আকৃষ্ট ও প্রলুব্দ করেছিল।বৃটিশ শাসনের সূচনার সাথে সাথেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। কোলকাতা হয় রাজধানী। ইংরেজ শাসনের অধীনে পূর্ব বাংলা কোলকাতার হিন্টারল্যান্ডে (পশ্চাদভূমি) পরিণত হয়। পূর্ব বাংলা ছিল কাঁচামাল ও খাদ্যের যোগানদাতা। উর্বর ভূমি পূর্ব বাংলার সম্পদ নিয়েই গড়ে উঠে কোলকাতার সমৃদ্ধি। মুসলিম-প্রধান এ অঞ্চলটির উন্নয়ন উপেক্ষিত হয়। ব্যাহত হয় এ অঞ্চলের ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ। কোলকাতা কেন্দ্রিক আঞ্চলিক শাসন ও আধিপত্য পূর্ব বাংলার জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। এ অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনে ঢাকা কেন্দ্রিক একটি প্রদেশ গঠন ছিল সে সময়কার পরিস্থিতিতে জনগণের প্রাণের দাবী।

বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন

প্রশাসনিক কারণে সরকারী মহলে ঢাকা কেন্দ্রিক একটি প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। অন্যদিকে, সে সময় পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দও নতুন প্রদেশ গঠনের জোরালো দাবী উত্থাপন করেন। তদানীন্তন ঢাকার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সংঘ ১৯০৪ সালের ২৫ জানুয়ারী আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগগুলো নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

(দার্জিলিং, জলপাই গুঁড়ি ও কুচবিহার বাদে) একটি নতুন প্রদেশ দাবী করে। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তের জন্যে পূর্ব বাংলায় পরিদর্শনে এলে পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা নবাব সলিমুল্লাহ এতদঞ্চলের জনগণের পক্ষ থেকে তার নিকট নতুন প্রদেশ গঠনের জোরালো দাবী উত্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার জনগণের দাবী ও প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। ঢাকা হয় এর রাজধানী। নবগঠিত প্রদেশটি ছিলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পূর্ব বাংলার নবজাগরণ

নতুন প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দ্বার উন্মোচন হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে এতদঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আবার ঢাকার পুনর্জন্ম ঘটে। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের পাঁচ বছরে পূর্ব বাংলার শিক্ষার হার ৩৫% ভাগ বৃদ্ধি পায়। চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত বিশেষ করে মুসলিম যুবকদের প্রতি যে বৈষম্য ও উপেক্ষানীতি চলছিল তার পরিবর্তনের সূচনা হয়। চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব বাংলার রাজস্ব আয় কোলকাতায় স্থানান্তরের পরিবর্তে পূর্ব বাংলায় ব্যয় হতে শুরু করে। নতুন প্রাদেশিক প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও উন্নয়ন ঘটে। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার জনমনে স্বতন্ত্র স্বকীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। তাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। নবাব সলিমুল্লাহর ভাষায়, বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে চেতনা সঞ্চার হয়েছে। ...বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় জীবন হতে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে। এ জাগরণ শুধু মনোজগতেই ঘটে নাই বরং রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতেও শুরু করে। বঙ্গভঙ্গের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর পরই নবাব সলিমুল্লাহ ও এ কে ফজলুল হকসহ পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ নবঘোষিত প্রদেশের উন্নতির জন্যে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাদেরই উদ্যোগে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর যে দিন নতুন প্রদেশ কার্যকরী হয়েছিল সেদিনই 'প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ নামে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানের (Provincial Mohamedan Union) মূল উদ্দেশ্যই ছিল নতুন প্রদেশের মুসলমানদের সংহতি বিধান ও জনগণের কল্যাণ সাধন। বঙ্গভঙ্গ শুধু পূর্ব

www.nagorikpathagar.org

বাংলার মুসলমানদেরই জাগরণ ঘটায়নি বরং সর্বভারতীয় মুসলিম জাগরণেও বঙ্গভঙ্গ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা করে যখন ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ তুমুল আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে তখন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সর্বভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন লাভ এবং সমগ্র ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ ও উন্নতির জন্য সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। বঙ্গভঙ্গের এক বছরের ব্যবধানে ১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ'। ভারতের মুসলমানদের আযাদী ও স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় এটি নেতৃত্ব দান করে।

বঙ্গভঙ্গ একদিকে যেমন পূর্ব বাংলার জনজীবনের জাগরণ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে ভারতীয় কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িত হিন্দু নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী সমাজ-এর বিরুদ্ধ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়।

যদি বঙ্গভঙ্গ রদ না হতো তাহলে উপনিবেশিক যুগেই পূর্ব বাংলা ভারতের সর্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হতো। ঢাকা হতো অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী। চট্টগ্রাম বন্দর হতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ হতো দ্রুত-কলকাতার উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হতো না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রভাব হতো আরো বলিষ্ঠ ও কার্যকর। পূর্ব বাংলা হতো ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অগ্রণী। মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি ঘটতো। পূর্ব বাংলার সংস্পর্শে আসাম অঞ্চলেরও উন্নতি ত্বরান্বিত হতো। সর্বোপরি আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ হতো দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ।' ৪৭ সালে 'কীটদুষ্ট' পূর্ব বাংলার বদলে আমরা লাভ করতাম আরো বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ পূর্ব বাংলা। আসাম অঞ্চলও হতে পারতো আমাদের জাতিসত্তার অংশ। ফলে, ভূ-রাজনৈতিক সমস্যামুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ সৃষ্টি হতো। এত সব সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে গেলো কোলকাতা কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যন্ত্র আর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফলে।

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মূল কারণ

কংগ্রেসসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবি সমাজ নতুন প্রদেশ গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে এবং তুমূল আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার নানা কারণ দেখালেও মূল কারণ ছিলো ঃ নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রধানত মুসলিম জাতি অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার উন্নতির পথ সুগম হবে- এটা তারা মেনে নিতে পারছিল না। তারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, বঙ্গভঙ্গের ফলে তারা আর পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলার হিন্টার ল্যান্ডরূপে ব্যবহার করতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ১৯০৫ সালের ৭ আগষ্ট কোলকাতার টাউন হলে এর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভায় আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতি কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মহেন্দ্র নন্দী তার বক্তৃতায় বলেন যে ঃ

"নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে। বাঙালী হিন্দুগণ সংখ্যালগিষ্টে পরিণত হইবে। আমাদের নিজদের দেশে আগন্তুকের মত থাকিতে হইবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে কি হইবে তা চিন্তা করিয়া আতংকিত হইতেছি"। মহারাজা জাতি বলতে যে হিন্দু জাতিই বুঝিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। আর এক খ্যাতনামা নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, "বাংলাদেশকে বিভক্ত করে হিন্দুদের অপমান ও অপদস্থ করা হইয়াছে"।

কোলকাতার হিন্দুরা ১৬ অক্টোবর (নতুন প্রদেশ গঠনের দিন) কে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে। ১৯০৬ সালের ৭ আগস্ট থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শুরু করা হয়। হিন্দুরা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। হিন্দু সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও জোরদার করা হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে "হিন্দু-জাতীয়তাবাদ" (হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা) কে সুসংহত করার জন্য হিন্দু নেতা-শিবাজীকে জাতীয় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন করা হয়। দেশের সর্বত্র শিবাজীর জন্মবার্ষিকী মহাধুম-ধামের সহিত পালন করা হয়। কংগ্রেস নেতারা মুসলিম সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রামের প্রশংসা করেন এবং তাকে হিন্দু জাতীয় বীর ও তার সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম বলে আখ্যয়িত করেন।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, নিছক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি নতুন প্রদেশ গঠন ও মুসলমানদের উন্নতির সম্ভাবনাকে সহ্য না করতে পেরেই হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা যে "অখন্ড বাংলার" প্রেমে পড়ে নয় বরং পূর্ব বাংলার প্রতি অবজ্ঞা ও এর উন্নয়নের যে কোন সম্ভাবনাকে ঠেকানোর জন্যই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে- তার বড় প্রমাণ হচ্ছে তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করা। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কারণে পূর্ব বাংলার জনগণের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমনের লক্ষ্যে যখন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় তখন হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা শুরু করেন। তাদের যুক্তি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে না কি বাঙালী জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে! তারা আরো বলেন যে, পূর্ব বাংলার 'কৃষক' জনগণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোন উপকার করবে না। কথাগুলোর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। পূর্ব বাংলার জনগণ উচ্চ শিক্ষার সহজ সুযোগ লাভ করুক কোলকাতার হিন্দু নেতারা, বুদ্ধিজীবীরা তা চাইতেন না।

www.nagorikpathagar.org

আরো মজার ব্যাপার হলো, কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী সমাজসহ পশ্চিম বঙ্গ একদা "বঙ্গ মাতা"র অখন্ডতার প্রেমের দোহাই দিয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করে 'প্রথম বঙ্গভঙ্গ' রদ করেছিল তারাই আবার ১৯৪৭ সালে "বঙ্গ মাতাকে" দ্বিখন্ডিত করে "দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের" ব্যবস্থা করে নিজেদেরকে পূর্ব বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতীয় জাতীয়তায় লীন করে দিয়েছিল।

কাজেই এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ১৯০৫ সালে যেমন "প্রথম বঙ্গভঙ্গের" বিরোধিতা করেছিল পূর্ব বাংলার জাগরণ ও মুসলিম নেতৃত্বকে প্রতিহত করার জন্য, তেমনি একই কারণেই তারা ১৯৪৭ সালে 'দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের" ব্যবস্থা করেছিল।

আমাদের জাতিসত্তার ভিত নির্মাণ

আমাদের জাতিসত্তার তিনটি মৌল উপাদান রয়েছে-ধর্ম, ভূগোল ও ভাষা।

মুসলিমবোধ, বাঙালীবোধ ও বাংলাদেশীবোধ- এ তিনের সমন্বয়েই আমাদের জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ রূপ। আর এ তিনটি উপাদানের বিকাশের ধারায় ১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গ' প্রাথমিক ভিত হিসেবে কাজ করেছে।

১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক-আঞ্চলিক ইউনিট সৃষ্টি হয়। সেটিই নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের কারণে তদানীন্তন 'পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। ১৯৭১ সালে সে 'ভৌগোলিক' কাঠামোই স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়। কাজেই ভৌগোলিক দিক থেকে আমাদের জাতিসত্তার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি প্রদেশ গঠিত হয়। সে প্রদেশ গঠনের মধ্য দিয়ে এতদঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের সাথে মুসলিম চেতনাবোধ সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কোলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মূল কারণও ছিল 'পূর্ব বাংলার' মুসলিম রূপের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ। অনেক ঘটনারপ্রবাহের ধারায় ১৯৪৭ সালে সেই মুসলিম পরিচয়ের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সেদিনকার পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। আর ১৯৭১ সালে সেই একই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই এটি স্পষ্ট যে, আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভিত্তি হচ্ছে মুসলিম পরিচয়বোধ যার উন্মেষ ঘটেছিল ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গের' মধ্য দিয়ে।

www.nagorikpathagar.org

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রিক যে প্রদেশটি গঠিত হয়, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল মূল বঙ্গ। "রাঢ়ভূমি তথা পশ্চিম বঙ্গ'ই বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন প্রদেশের বাইরে থাকে। মূল বাঙালী জাতির অধিকাংশই নবগঠিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলা তথা মূল বাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি লালন ও বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি হয়। কোলকাতা কেন্দ্রিক 'রাঢ় ভূমির' ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাংলার চর্চার পরিবর্তে পূর্ব বাংলা তথা মূল বঙ্গের বাংলা চর্চার পরিবেশ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। মূল বাঙালী জাতির বাস যে পূর্ব বাংলায়, সে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন মানে মূল বাঙালী জাতি ও তার ভাষার উন্নয়ন। বঙ্গভঙ্গ সে সুযোগটিই সৃষ্টি করেছিল। উপনিবেশিক রাজধানী কোলকাতাকেন্দ্রিক রাঢ়ভূমির লোকেরা বা তাদের সাংস্কৃতিক অনুসারীরা তা চাইতো না বলেই তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে সেই রাঢ়ভূমির সংস্কৃতির ধারকরাই দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে মূল বঙ্গ ও বাংলা ভাষার প্রধান স্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে 'বাঙালী' ও বাংলা ভাষার পরিচয়কে গৌণ করে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তা ও হিন্দু বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে মূল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে পূর্ব বাংলা এগিয়ে যেতে থাকে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে তা-ই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কাজেই, পূর্ব বাংলা ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রকৃত বাঙালীবোধও ছিলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত।

বস্তুত আমাদের জাতিসত্তার তিনটি উপাদানের সব কয়টির সমন্বিত উন্মেষ ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে। ১৯৪৭ সালেই তা আরো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে এবং ৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে তা-ই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আমাদের রাজনৈতিক জাতিসত্তা বিকাশের প্রথম সোপান, আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রথম স্ফুরণ, আমাদের স্বকীয়তা উপলব্ধির প্রাথমিক মাইলফলক, আমাদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য-অস্তিত্ব নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নের সূচনা। এক কথায়, ১৯৭১-এ যে জাতি, যে স্বাধীনতার আমরা উত্তরাধিকারী ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গই হচ্ছে তার প্রাথমিক ভিত।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের মাতৃভাষা ঃ আদর্শিক প্রেক্ষিত

প্রত্যেকটি মানুষের একটি ভাষা আছে। এটি তার মাতৃভাষা। সে ভাষায়ই মানবশিশু প্রথম কথা বলতে শিখে। ভাবপ্রকাশ আর পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যম মাতৃভাষা। তবে মাতৃভাষা শুধু ভাব প্রকাশের মাধ্যমই নয় বরং মানুষের মনঃস্তত্বের সাথেও তা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এ জন্যই ভাষা কখনো কখনো জাতীয়তাবোধের, ঐক্যবোধের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে, হতে পারে বাহন। ভাষার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পরিচিতির মাধ্যম বা বাহন হিসেবে ভাষার ভূমিকা এত স্পষ্ট যে তা ব্যাখ্যার দরকার নেই। একটি সাধারণ ভাষা যত দ্রুত একজন আরেকজনকে জানার সুযোগ করে দেয়, বুঝার সুযোগ করে দেয়, অন্য কোনভাবে তা সম্ভব হয় না। অন্য মাধ্যমগুলো হচ্ছে পরোক্ষ আর ভাষা হচ্ছে প্রত্যক্ষ। একে অন্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। অতএব ভাষা আল্লাহর অন্যতম সেরা দান। ভাষা না থাকলে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠা সম্ভব হতো না, হতো না সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ। মানুষকে যে সম্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্ভাবনা বিকাশে মানুষের বাকশক্তি-ভাষা এক অপরিহার্য শর্ত। তাই তো আল্লাহ যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি দিয়েছেন কথা বলার শক্তি-দান করেছেন ভাষা ঃ "তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।" *[আর রহমান ঃ ২-৩]*

ভাষার পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আল্লাহর নিদর্শন

পৃথিবীর প্রথম মানবজোড়া একই ভাষায় কথা বলতেন। পরবর্তী সময়ে মানব জাতির বিস্তৃতির সাথে সাথে ভাষার ক্ষেত্রেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে- গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ভাষা* । কিভাবে এ পার্থক্য সুচিত হলো তা আমাদের আলোচ্য

---

* ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ছয় হাজার ভাষা রয়েছে। তবে অধিকাংশ ভাষায়ই খুব স্বল্প সংখ্যক লোক কথা বলে। দশ লক্ষ বা ততোধিক লোক কথা বলে এমন ভাষার সংখ্যা প্রায় ২০০। আবার পাঁচ কোটি বা ততোধিক লোক কথা বলে এমন ভাষার সংখ্যা মাত্র ২৩টি। সেগুলো হচ্ছে- আরবী, বাংলা, ক্যান্টনীয় ভাষা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানী, হিন্দি, ইতালী, জাপানী, জাভা, কোরীয়, মালয়-ইন্দোনেশীয়, মান্ডারিন-চীনা, মারাঠি, পুর্তুগীজ, পাঞ্জাবী, রুশ, স্পেনীয়, তামিল, তেলেগু, তুর্কী, ভিয়েতনামী এবং উও। আবার দশ কোটি বা ততোধিক লোক কথা বলে এমন ভাষার সংখ্যা মাত্র বারটি। লোকসংখ্যা বিচারে এই বারোটি ভাষার প্রথমে রয়েছে। (১) ইংরেজী তারপরে রয়েছে ক্রমান্বয়ে (২) মান্ডারিন চীনা (৩) স্পেনীয় (৪) হিন্দী (৫) আরবী (৬) বাংলা (৭) রুশ (৮) পুর্তগীজ (৯) জাপানী (১০) জার্মান (১১) মালয়-ইন্দুনেশীয় এবং (১২) ফরাসী।

www.nagorikpathagar.org

বিষয় নয়। ব্যাপারটা ঘটেছে একটি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই। ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সমভাষাভাষি লোকদের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ ও সমাজ গড়ে তোলা সহজতর হলো। ভাষার মাধ্যমে এক একটি গোষ্ঠী পরিচিতিও লাভ করলো, ঐক্য সৃষ্টি হলো। অবশ্য ভাষা এক হলেই যে ঐক্য গড়ে উঠবে, অন্য পরিচিতি পরিহার করে ভাষাভিত্তিক পরিচিতি প্রাধান্য লাভ করবে এমন কোন কথা নেই। একই ভাষাভাষি মানব গোষ্ঠীর মধ্যেও বর্ণ-গোত্র, অঞ্চল, সংস্কৃতি, ধর্ম-আদর্শ ইত্যাদি কারণে পার্থক্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে ভাষা ঐক্য রচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার ভাষাই বিভিন্ন সময়ে বিভেদ সৃষ্টির কারণও হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে এতগুলো ভাষা কেন সৃষ্টি হলো? এক ভাষা হলে তো মানব জাতির মধ্যে অপরিচিতির সমস্যা থাকতো না। বিভেদ সৃষ্টিও কম হতো। ভাষা একটা হলে সুবিধা অসুবিধা কি হতো তা আলোচনা না করেও এতটুকু বলা যায় যে বৈচিত্র্যই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। গোটা সৃষ্টি জগতেই বৈচিত্র্য বিরাজমান। বৈচিত্র্য না থাকলে গোটা বিশ্ব তখন আর সৃজনশীল, কুশলতাপূর্ণ সৃষ্টি হতো না, একটি জড়পিণ্ড বা শক্তিপুঞ্জে পরিণত হতো। গোটা সৃষ্টি জগতে তাকান। দেখবেন রকমারি আর বৈচিত্র্যের সুষমা সুশোভিত করে রেখেছে সারা বিশ্বকে। শুধু মানব জাতির দিকেই তাকিয়ে দেখুন না। কত বৈচিত্র্যপূর্ণ। স্বাস্থ্য, আকার-আকৃতি, বর্ণ ইত্যাদি কত দিক দিয়েই রয়েছে বিপুল পার্থক্য। কাজেই ভাষার ক্ষেত্রেও এটা ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। বস্তুতঃ ভাষা, বর্ণ ইত্যাদির পার্থক্য আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকুশলতারই নিদর্শন। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও জমীনের সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য। এতে অনেক নির্দশন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্যে।" (৩০ঃ২২)

কোন ভাষাই মন্দ নয়

ভাষার পার্থক্য যেহেতু আল্লাহ্‌র নিদর্শন, তাই সব ভাষাই আল্লাহর অনুমোদিত ভাষা। কোন ভাষা (ভাষা হিসেবে) মন্দ নয়। আর কোন ভাষাই নৈতিক বিচারে শ্রেষ্ঠ নয়। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সব ভাষাই ভাল ও গ্রহণযোগ্য। দেশ ও বর্ণের পার্থক্যের কারণে যেমন কাউকে মন্দ বলা বা ভালো বলা ইসলামে অনুমোদিত নয়, ঠিক তেমনি ভাষার কারণেও মর্যাদার পার্থক্য নির্দেশ করার সুযোগ ইসলামে নেই। তাই এটা আমাদের ভাষা আর ওটা শত্রুদের ভাষা বা এটা ইসলামী ভাষা, ওটা অন ইসলামী ভাষা এ ধরনের স্থায়ী ধারণা পোষণ করা কোন রকমেই সঙ্গত নয়। হিব্রো ভাষা বর্তমানে ইসলাম বিরোধীদের ভাষা। অথচ সেই হিব্রো

www.nagorikpathagar.org

ভাষায়ই তৌরাত নাজিল হয়েছিল। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী জানা যায় যে যখনই কোন জাতির মধ্যে নবী পাঠানো হয়েছে তখন সে জাতির ভাষায়ই ওহি নাজিল করা হয়েছে (১৪ঃ৪)। আবার কুরআন এও বলেছে যে প্রত্যেক জাতির (উম্মাত) নিকটই কোন না কোন সতর্ককারী (নবী) পাঠান হয়েছে (৩৫ঃ৪)। এ থেকে সংগতভাবে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন ভারতে নবীগণের নিকট হয়তো সংস্কৃত ভাষায়ই অহী নাজিল হয়েছিল। অথচ সংস্কৃত ভাষা বর্তমানে হিন্দু ভাষা হিসেবে বিবেচিত। ফার্সী ছিল এককালে ইসলামবিরোধীদের ভাষা। কিন্তু কাল-পরিক্রমায় তা আজ অন্যতম শক্তিশালী (আরবীর পরেই) ইসলামী ভাষায় পরিণত হয়েছে। এমনকি আরবী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। আরবী হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও শেষ নবীর (দঃ) ভাষা। বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইসলামী জ্ঞান চর্চার মূল ভাষাগত মাধ্যমও হচ্ছে আরবী। অথচ প্রাথমিক কালের কুরআন বিরোধীদের ভাষাও ছিল আরবী। আরবী যেমন কুরআনের ভাষা ঠিক তেমনি ছিল আবু জেহল আবু লাহাবের ভাষা। কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত (প্রায় দু-আড়াই হাজার বছর) আরবে কোন নবী আসেননি। আরবী বা আরবী মুবিন (কুরআনের ভাষা) মুলসামী বা প্রটো-সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। সাহিত্যের অস্তিত্ব বিচারে আরবী হচ্ছে সর্ব কনিষ্ঠ সেমিটিক ও সামী ভাষা। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আরবী সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে আরবী ভাষাকে অবিকৃত থাকার বিচারের মূল সামীর নিকটতম ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শেষ নবী (দঃ)-এর আর্বিভাবের পূর্ব পর্যন্ত আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যুগকে জাহেলী যুগ বলা হয়। আবার এ জাহেলী যুগই হচ্ছে আরবী কবিতার স্বর্ণ যুগ। অতএব, দেখা যায় যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরবী ছিল ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকদের ভাষা। অথচ আজ আরবীই হচ্ছে মূল ইসলামী ভাষা। কাজেই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা-ই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য নয়। আজকে যা ইসলাম বিরোধীদের ভাষা কালকে তা ইসলাম অনুসারীদের ভাষায় পরিণত হতে পারে।

ভাষায় নিজস্ব কোন আদর্শ নেই

ভাষা একটি সামাজিক প্রাকৃতিক বিষয় (Socio-natural Phenomenon)। ভাষা হচ্ছে কোন জনগোষ্ঠীর ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। সেই ভাব ভালোও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। ভাষার মাধ্যমে সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। তাই ভাষার নিজস্ব কোন চরিত্র থাকে না। কোন স্বতন্ত্র আদর্শ থাকে না। ভাষা সব ধরনের আদর্শ ও চিন্তার বাহন। একই ভাষার মাধ্যমে পরস্পর বিপরীতধর্মী চিন্তা ও

www.nagorikpathagar.org

মতবাদের প্রচার করা হচ্ছে। কাজেই ভাষার (ভাষা হিসেবে) সুনির্দিষ্ট কোন আদর্শিক চরিত্র নেই, থাকার কথাও নয়। ভাব প্রকাশক কিভাবে ভাব প্রকাশ করেছেন তার দ্বারাই তার ভাষার চরিত্র নির্ধারিত হবে, তিনি কোন ভাষায় কথা বলেছেন তার দ্বারা নয়। বিষয় বস্তুই চরিত্র নির্ধারক, পাত্রের রং বা আকার আকৃতি নয়। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক বিচারে সব ভাষাই ভাব প্রকাশের নিরপেক্ষ মাধ্যম মাত্র।

ভাষা বিশেষ কোন সংস্কৃতির বাহনও হতে পারে

ভাষা প্রকৃতি বিচারে ভাব প্রকাশের নিরপেক্ষ মাধ্যম হলেও এর একটি গভীর সাংস্কৃতিক দিকও রয়েছে। ভাষা নিরেট স্থির ও নিশ্চল কোন বিষয় নয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রবহমানতা। একটি ভাষা ঐতিহাসিক পরিক্রমায় কোন একটি সংস্কৃতিনির্ভর বিশিষ্ট রূপ ধারণ করতে পারে। এটা প্রাকৃতিকভাবেই সম্ভব।

একজন মানুষ বিচ্ছিন্ন কোন সত্ত্বা নয়। সেই মানুষটি একটি নির্দিষ্ট দেশ, যুগ ও সমাজের অংশ। তার রয়েছে যেমন একটি নির্দিষ্ট দেশ, সমাজ, যুগ ও ভাষা, তেমনি রয়েছে তার একটি নির্দিষ্ট ধর্ম, আদর্শ চেতনা, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সব মিলিয়েই তিনি একজন মানুষ। সে মানুষটি যখন কথা বলেন, ভাষা প্রয়োগ করেন তখন তার ভাষা বা কথাটিই শুধু প্রকাশিত হয় না, তিনিও প্রকাশিত হন তার সার্বিক মূর্তরূপেই। তার ভাষায় প্রকাশিত হয় তার দেশ, তার যুগ, তার সমাজ, তার ধর্ম, তার মূল্যবোধ তার আদর্শ চেতনা-তার সব কিছুই। ভাষা গঠন ও বিকাশে এসব উপাদানের প্রভাব ও প্রতিফলন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কাজেই কোন ভাষা যখন দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট কোন সমাজব্যবস্থা বা বিশেষ কোন সংস্কৃতির পরিচর্যা করে থাকে তখন অবশ্যই সে ভাষায় সেই বিশেষ সংস্কৃতির ছাপ পরিলক্ষিত হবে। সে সংস্কৃতি নির্ভর ধারণক্ষমতাও বাড়বে। এ দিক থেকেই আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষাকে ইসলামের অধিকতর ভাব প্রকাশক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই যে আরবী, ফার্সী বা উর্দু ইসলামী ভাবধারার অধিকতর ভাব প্রকাশক এটা সেগুলোর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতার কারণে নয় বরং দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্ত ভাষা ইসলামের ভাবধারা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে বলেই এগুলোর মধ্যে ইসলামী ভাবধারার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এটা স্থায়ী কিছু নয় বরং পরিচর্যা ও অনুশীলন যদি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় তাহলে সে ভাষাগুলোতেও অন্য কোন সংস্কৃতির প্রাধান্য হতে পারে। যেমন তুর্কী ভাষা। এককালে তুর্কী ভাষা ছিল অন্যতম ইসলামী ভাষা। কিন্তু ভিন্ন খাতে চর্চার ফলে তুর্কী ভাষার অতীত ইসলামী রূপটি আজ নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কোন ভাষা ঐতিহাসিক কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংস্কৃতির (আপেক্ষিক অর্থে) বাহন

www.nagorikpathagar.org

হয়ে পড়তে পারে। আবার সেই ভাষাও চর্চার ফলে নতুন একটি সংস্কৃতির বাহনে পরিণত হতে পারে। মূল কথা হচ্ছে, প্রকৃতি বিচারে ভাষার কোন আদর্শ নেই। কিন্তু কোন সময়ে সে ভাষাই আপেক্ষিকভাবে কোন বিশেষ সংস্কৃতির বাহন হতে পারে।

ভাষাঃ বিরোধ ও ঐক্য প্রসঙ্গ

একটি ভাষার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী পরিচিতি লাভ করতে পারে। যেমন বাংলা ভাষা যারা কথা বলে তারা বাঙালী। আরবী ভাষায় যারা কথা বলে তারা আরবী। ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা তারা ইংরেজ নামে পরিচিত। এ পার্থক্য স্বাভাবিক। এ পার্থক্যকে যারা অস্বীকার করেন বা ভুলে যান তারা একটি স্বাভাবিকতাকে বা সত্যকে অস্বীকার করেন। আমি বাঙালী এটা আমার ভাষাগত পরিচয়। এ পরিচয় সহজাত। এ পরিচয় বাদ দেয়া বা অস্বীকার করার মধ্যে কোন ধার্মিকতা নেই। অন্যদিকে ভাষাগত বা অন্য কোন স্বাভাবিক পরিচয় ও পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যারা বিরোধ সৃষ্টি করেন বা করতে চান তাদের কার্যক্রম ইসলামে জাহেলিয়াতের অন্তর্ভূক্ত। ইসলামে ভাষাভিত্তিক বা দেশভিত্তিক কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ যা অন্য কোন জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবতে প্ররোচিত করে তা সমর্থিত নয়। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভাষাগত পার্থক্য যেমন আল্লাহ্‌র নিদর্শন ঠিক তেমনি এ পার্থক্যের কারণে মানুষের জীবন ধারার ও পরিচিতির ক্ষেত্রে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাও স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এ পার্থক্য যারা মানতে চান না তারা সত্যকে এড়িয়ে যাচ্ছেন আর যারা এ পার্থক্যকে চূড়ান্ত ও চরম ভাবছেন তারা দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতায় ভুগছেন। দুটোই প্রান্তিকতা। দুটোই বাড়াবাড়ি যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ভাষা ও সাম্প্রদায়িকতা

একই ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী থাকতে পারে। ব্যাপক ব্যবহার ও প্রয়োগের ফলে সে ভাষায় কোন কোন শব্দ কালক্রমে কোন একটি সম্প্রদায় বা ধর্মীয় জনসমষ্টির জন্যে বিশিষ্টতা লাভ করতে পারে। এমনকি কখনও কখনও ঐ সমস্ত শব্দাবলী সেই সম্প্রদায়ের পরিচয়সূচকও হয়ে পড়তে পারে। এমনিভাবে একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষাগত বিভেদ গড়ে উঠা সম্ভব। এই ভাষা-সাম্প্রদায়িক বিরোধের দুটো দিক রয়েছে। একটি আদর্শিক আর অন্যটি ঐতিহ্যগত বা ঐতিহাসিক।

বাংলা ভাষাভাষী প্রধান দুটো ধর্মীয় জনসমষ্টি হিন্দু ও মুসলমান। উভয়েই বাংলা ভাষায় কথা বলে। কিন্তু তারপরেও দেখা যাবে যে উভয় সমাজেই এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা এক এক সমাজের বৈশিষ্ট্যের ধারক। যেমন আল্লাহ, রসূল, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, সালাত, অজু ইত্যাদি শব্দ মুসলিম সমাজের নিজস্ব ভাষা।

www.nagorikpathagar.org

এগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অন্যদিকে পূজাপার্বন, কালীদূর্গা, লক্ষী, ঈশ্বর, ভগবান, প্রণাম ইত্যাদি হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিচয় সূচক নিজস্ব শব্দ। কাজেই ভাষার ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বিশেষের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রভাব অনিবার্য। ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগতভাবে দেখা যায় যে মুসলমানগণ যে বস্তুকে পানি বলেন হিন্দুগণ তাকেই জল বলেন। একজন মুসলমান পারতপক্ষে পানিকে জল বলেন না। আবার একজন হিন্দুও পারতপক্ষে জলকে পানি বলেন না। এমনি ধরনের কিছু শব্দ রয়েছে যার ব্যবহার নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেন এই পার্থক্য? এ পার্থক্যের কি প্রয়োজন? পার্থক্যটা কি নিছক সাম্প্রদায়িক? বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবীদার। কিন্তু এখানে তার অবকাশ নেই।

ভাষা ব্যবহারে এই যে পার্থক্য সে সম্পর্কে পণ্ডিতজনেরা অনেক বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। কেউ বলেছেন এ ব্যবধান সত্য এবং স্বাভাবিক যেমন সত্য হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যবধান। ধর্মীয় পার্থক্য যেমন তুলে দেয়া সম্ভব নয় তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে এ ধরনের পার্থক্য তুলে দেয়া যাবে না এবং তা বাঞ্ছিতও হবে না। তাই এ গোষ্ঠী ভাষা প্রয়োগে এ ধরনের পার্থক্যটা কঠোরভাবে মেনে চলার পক্ষপাতি। আবার কেউ বলছেন এ ব্যবধান সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ। কাজেই তা তুলে দিতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। কিন্তু তারা কিভাবে তুলে দেবেন তার ফরমূলা বলতে পারেননি। অবশ্য কেউ কেউ ভাষায় সাম্প্রদায়িকতা দূর করার নামে যা করছেন তা নেহায়েত বোকামী এবং শুধু হাস্যাকরই নয় বরং একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকেই প্রকারান্তরে চালু করার চেষ্টা। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা দূর করার নামে সাম্প্রদায়িকতারই চর্চা। আল্লাহর পরিবর্তে ঈশ্বর বা ভগবান, সালামের পরিবর্তে আদাব চালু করার চেষ্টাসহ এ জাতীয় যাবতীয় তৎপরতা সাম্প্রদায়িকতারই নামান্তর।

আমাদের বিবেচনায় এ সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণে কোন গ্রুপই পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। মূল সমস্যার কেউ দেখেছেন একদিক আবার কেউ দেখেছেন অন্যদিক। বস্তুতঃ একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌছুতে হলে প্রথমতঃ বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্যের বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান-তারা একই ভাষার মানুষ হওয়ার পরও তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা-মূল্যবোধ-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, ইতিহাস-ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই বলতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ পার্থক্য সুস্পষ্ট। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য ভাষার ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করবে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়টা অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা হচ্ছে ধর্মীয় বা সামাজিক পরিমণ্ডলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু শব্দকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের লক্ষণ মনে করা। যেমন ধরুন মুসলমানগণ 'সালাম শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। অন্যদিকে হিন্দুগণ আদাব বা নমস্কার ব্যবহার করেন। এটা কি ভাষার পার্থক্য? না তা নয়। কেননা সালাম মূলতঃ অভিবাদনের বা সম্মানের প্রতিশব্দ নয়। এটি শান্তির জন্য প্রার্থনা যা মুসলমানদের পারস্পরিকভাবে প্রযোজ্য। অর্থগত ও ব্যবহারিক কোনভাবেই সালামকে আদাব বা নমস্কারের পর্যায়ভুক্ত বলা যায় না। বস্তুতঃ এখানে পার্থক্যটা ভাষার নয় পার্থক্যটা সাংস্কৃতিক। কাজেই মুসলমানগণ সালাম পরিত্যাগ করে আদাব নমস্কার বা হিন্দুগণ আদাব নমস্কার পরিত্যাগ করে সালাম না দেয়া পর্যন্ত পার্থক্যটা দূর করা সম্ভব নয়। মুসলমানগণ নামাজ পড়েন রোজা করেন সালাম দেন হিন্দুগণ তা করেন না। তাই হিন্দু সমাজে সে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অন্যদিকে হিন্দুগণ পূজা করেন প্রণাম করেন, মুসলমানগণ তা করেন না, তাই মুসলিম সমাজে এ শব্দগুলোর প্রচলন নেই। এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার করার কি আছে? তাছাড়া আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। মুসলমানগণ হিন্দুগণের পূজার বর্ণনা দেয়ার সময় পূজাই বলেন, অন্য কিছু বলেন না। একইভাবে হিন্দুগণও মুসলমানের নামাজের উল্লেখের প্রয়োজন হলে নামাজই বলেন অন্য কিছু নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এসব বিশেষ শব্দ বা পরিভাষার মধ্যে বিভেদ বা সাম্পদায়িকতার কিছু নেই। উভয়ই এগুলো ব্যবহার করে। তবে যে সমাজের সঙ্গে কাজগুলো জড়িত সে সমাজে তাদের ব্যবহার বেশী। ব্যবহারের পার্থক্যটা এখানে গুণগত নয়, পরিমাণগত। অতএব সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্যজনিত কারণে শব্দ চয়ন ও ভাষা প্রয়োগে পার্থক্য স্বাভাবিক বরং বাঞ্ছিতও।

এরপর আসে সেসব শব্দের আলোচনা যেগুলো ধর্মীয় শব্দ নয় বা বিশেষ কোন আচরণ কাজ বা অনুষ্ঠানের নাম বা পরিভাষা নয়। যেমন জল পানি ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে যে এগুলো নেহায়তই ঐতিহাসিকভাবে চালু হয়ে গিয়েছে। এর পিছনে না আছে কোন দর্শন না আছে কোন যৌক্তিকতা। এ জাতীয় গোড়ামীকে যত দ্রুত দূর করা যায় ততই মঙ্গল। অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এ বিভেদ দূর করার দায়িত্ব উভয় সম্প্রদায়েরই। আপনি ভুলেও পানি বলবেন না আমাকে জল বলতে পীড়াপিড়ি করবেন, এটা হয় না। আপনি জল-হাওয়া বলবেন আর আমি আবহাওয়া বললে রাগ করবেন এটা সমাধানের কথা নয়। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি রয়েছেন বাংলাদেশে ও পশ্চিবঙ্গে যাঁরা নিজেদেরটা বদলাতে রাজী নন, অন্যেরটা পরিবর্তনের উপদেশ খয়রাত করছেন।

www.nagorikpathagar.org

নিজেরা বেছে বেছে সংস্কৃত শব্দ চয়ন করবেন। বহুল প্রচলিত আরবী ফার্সী শব্দ বাদ দেবেন। এভাবে ভাষার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব নয়। কেউ কেউ এমন আছেন যাঁরা মনে করেন যে পানি ও জলের মধ্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও চেতনা সক্রিয় রয়েছে। তাদের মতে এ পার্থক্যটা উড়িয়ে দেয়া মানে সাংস্কৃতিক পার্থক্যটা উঠে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। পানি ও জল দুটো ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে বলে যারা দাবী করছেন তাদের কাছে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে এ যুক্তি ছাড়া আর কোন যুক্তি নেই। কেননা জল ও পানি দুটোরই মূল উৎস সংস্কৃত ভাষা। কাজে উৎপত্তি বিচারে এতে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের কিছুই নেই। আবার প্রয়োগগত দিক থেকে পানি শব্দটি শুধু মুসলমানদের ভাষা নয়। হিন্দী ভাষী হিন্দুগণও পানি শব্দটি ব্যবহার করেন। এখন বাংলাভাষী হিন্দুগণ পানি ব্যবহার করলে তাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হওয়ার কথা নয়।

ভাষা ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্যবোধ

ভাষা ব্যবহারে কয়েক ধরনের স্বাতন্ত্রবোধ লক্ষণীয়। এর মধ্যে ধর্মীয়, জাতিগত দেশ ও অঞ্চলগত এবং গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যবোধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একই সাধারণ ভাষার আওতায় থেকেই বাংলাভাষায়ও এ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। এ অনেকটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের বিষয়টি পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে স্ব স্ব ধর্মের নিজস্ব পরিভাষাসমূহের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। মুসলমানদের জন্য এমন শব্দ চয়ন করা উচিত নয় যাতে তওহীদ বিরোধী ভাবধারা নিহিত রয়েছে। অন্য ধর্মের বা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর পরিচয়সূচক শব্দগুলোও মুসলমানদের পরিহার করা উচিত। তাছাড়া মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ও আচার-অনুষ্ঠানে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর পরিবর্তনও বাঞ্ছিত নয়। বাকী ক্ষেত্রে ভাষার প্রচলন, ব্যবহার ও সাধারণ প্রবাহের উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। আঞ্চলিক ও দেশীয় স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে বাংলা ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষার মধ্যে দুর্বোধ্য কোন প্রাচীর গড়ে তোলার প্রয়াস প্রশংসনীয় নয়। তবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ভাষা ইংরেজী হওয়া সত্ত্বেও বানানরীতি, উচ্চারণের ঢং, শব্দ চয়নের যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষাটাকে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা সহকারে লেখ্য ভাষায় রূপ দেয়া উচিত। এতে যদি পশ্চিম বাংলার ভাষার সহিত খানিকটা পার্থক্য দেখা দেয় তাতে কিছু করার নেই এবং এতে কোন ক্ষতিও নেই।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে কিছু উপজাতীয় জাতিগোষ্ঠী ছাড়া অন্য কোন জাতিগোষ্ঠীগত সমস্যা নেই। তাই বাংলা ভাষায় জাতিগোষ্ঠীগত কারণে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি একান্তভাবেই নিস্প্রয়োজন। এছাড়া অঞ্চল বিশেষের যে ভাষা তা নেহাতই আঞ্চলিক, সে ভাষাকে সাধারণ ভাষায় গ্রহণ যেমন সম্ভব নয় ঠিক তেমনি ঐগুলোকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের কোন প্রয়োজন এখনও সৃষ্টি হয়নি।

বাংলা ভাষা ও ইসলাম চর্চা

বাংলাদেশের ইসলামের আগমন ঘটে দক্ষিণ ভারতের মধ্য দিয়ে। প্রথমে মৌখিকভাবেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়। ১২০৩ খ্রীঃ বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হলেও ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা হয়নি বললেই চলে। মূলতঃ ইলিয়াস শাহী আমল থেকে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। হুসাইন শাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ব্যাপক রূপ ধারণ করে। তবে সে সময়কার ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় ইসলামের প্রভাব ছিল প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্য মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে ১৮৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা ফার্সী থাকার ফলে মুসলিম সমাজে ফার্সীর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়ে। তাছাড়া সুলতানী আমলে সোনারগাঁও, পাণ্ডুয়া, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থান ছিলো ইসলামের ব্যাপক চর্চার কেন্দ্র। এগুলোর প্রভাবও বাংলা ভাষার উপর পড়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মোগল আমল থেকেই বাংলা ভাষায় ইসলামের চর্চা ও মুসলিম ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনার প্রয়াস চলে। পুঁথি সাহিত্যের যুগটাই হচ্ছে বাংলা ভাষায় তথা জনগণের আটপৌরে ভাষায় মুসলিম ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য চর্চার যুগ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বাংলা ভাষায় ইসলামের পঠনপাঠন ও চর্চা ছিলো তখন পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত। বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে ইসলাম চর্চা ছিল দিল্লীকেন্দ্রিক তথা ফার্সীনির্ভর এবং মধ্যভাগে কলকাতা ও দেওবন্দ কেন্দ্রিক তথা প্রধানতঃ উর্দুনির্ভর। ফলে তখন বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রসার ও সাহিত্য সৃষ্টি খুবই অনুল্লেখযোগ্য। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ও পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চলে। তবুও ইসলাম চর্চার মূল মাধ্যম উর্দু-ফার্সীই থেকে যায়। পাকিস্তান আমলে ইসলাম চর্চায় উর্দুর প্রাধান্যের তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ আমলে মাতৃভাষায় ইসলাম চর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও এখন পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষার সর্বস্তরে ও সর্বমহলে মাতৃভাষার গুরুত্ব উপযুক্তভাবে স্বীকৃত হয়নি। যদিও সচেতনতা দিন দিন বাড়ছে।

বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চার অপ্রতুলতার ফলাফল

বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা এ পর্যন্ত যা হয়েছে তা অত্যন্ত কিঞ্চিতকর। বাংলা ভাষায় এদেশে ইসলাম চর্চা বা ইসলামী শিক্ষার মাধ্যম কোনকালেই ছিল

www.nagorikpathagar.org

না। এমনকি এককালের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানগণ বাংলা ভাষা মুসলমানদের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে এটা বিশ্বাসই করতে পারেননি। তদানীন্তন মুসলিম শিক্ষিত অভিজাত ও আলেম-উলামা কারো পরিবারেই বাংলার তেমন একটা চর্চা হতো না। এসব অবস্থা ও মানসিকতার পিছনে যে কারণই থাক না কেন ঐতিহাসিকভাবে এ প্রবণতা কোন কল্যাণ ডেকে আনেনি। এর ফলাফল হয়েছে মারাত্মক।

দীর্ঘদিনের এহেন দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা ভাষায় এক বন্ধ্যাত্য সৃষ্টি করেছে। এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সুনির্দিষ্ট কোন ইসলামী ধারা সৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠেনি। বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রসারও ঘটেছে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে। সাধারণ জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যে ব্যাপক অজ্ঞতা বিরাজ করছে তারও অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মাতৃভাষায় ইসলাম চর্চার অপ্রতুলতা। যুব সমাজ আজ ইসলাম সম্পর্কে যে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে মাতৃভাষায় ইসলামের চর্চা ব্যাপক হলে তা এতটা প্রকট হতো না। যুব সমাজের ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্নতার আরেকটি কারণ হচ্ছে মাতৃভাষা থেকে ইসলামের বিচ্ছিন্নতা।

ধর্মীয় শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছেন তাদের অনেকের মধ্যে মাতৃ ভাষায় দক্ষতার অভাবের কারণে তাদের পক্ষে জনমনে ও যুব মানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার সম্ভব হচ্ছে না। জনগণকে নেতৃত্ব দিতে হলে জনগণের ভাষা-মাতৃভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মাতৃভাষা পরিহার করে জনগণকে ব্যাপকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আলেম সমাজের এক্ষেত্রে অনগ্রসরতা তাদের নেতৃত্বের মানকেও করেছে ভীষণভাবে দুর্বল। বাংলা ভাষায় ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও ভাব ধারার ধারণক্ষমতাও এ পর্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলার কারণে ইসলামী জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রও এখানে অত্যন্ত সীমিত। বাংলা ভাষায় মৌলিক ইসলামী চিন্তানায়ক ও প্রতিভার আবির্ভাবও অত্যন্ত কম। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে আমাদের মনে হয় বাংলা ভাষায় তথা মাতৃভাষায় ইসলামের ব্যাপক চর্চার অভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব অর্জন ও স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই মৌলিক চিন্তার উন্মেষ ও প্রসারের জন্যে অবশ্যই নিজেদের ভাষায় অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ ও মাতৃভাষা

একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করতে হলে, কোন দেশে ইসলামী বিপ্লব করতে চাইলে সে দেশের জনগণের নিকট তাদের ভাষায়ই ইসলামের দাওয়াত-বিপ্লবী বাণী পৌঁছাতে হবে। যে ভাষা জনগণ বুঝে না সে ভাষার মাধ্যমে তাদেরকে জাগিয়ে তোলা যায় না। তাই যে অঞ্চলে আন্দোলন চালানো হবে সে অঞ্চলের

www.nagorikpathagar.org

ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে আন্দোলনের মাধ্যমে রূপে। পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, নবী-রসুলগণ (আঃ) সব সময় তাদের নিজ নিজ জাতির ভাষায় দাওয়াত দান করেছেন। নবীগণ কখনও এমন ভাষায় দাওয়াত দেননি যে ভাষার সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক ছিলো না। স্বীয় জাতির ভাষাই ছিলো তাদের পয়গাম পৌঁছানোর মাধ্যম। এ ব্যাপারে আল কুরআনের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট।

"আমি আমার বাণী পৌঁছাবার জন্য যখন যেখানেই কোন রাসূল পাঠিয়েছি তাঁর নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছি যেন সে তাদের নিকট খুব ভালোভাবেই কথা প্রকাশ করে বলতে পারে।" [১৪ঃ৪]

শেষ নবীর (দঃ) প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র ছিলো মক্কা ও আশেপাশের এলাকা। সেখানকার লোকদের ভাষা ছিলো আরবী। কুরআন প্রথম নাজিল হলো তাদের মাঝেই। তাই কুরআনের ভাষা হলো আরবী ঃ

"আর (হে নবীঃ) এরূপেই এ আরবী কুরআনকে আমি তোমার প্রতি ওহি করেছি যেন তুমি জনপদের কেন্দ্রস্থল (মক্কা নগরী) ও তার আশে পাশের বসবাসকারীদের সাবধান করতে পারো।" (৪২ঃ৭)

যে অঞ্চলে আন্দোলন ও দাওয়াতের কাজ করতে হবে সে অঞ্চলের ভাষা পরিহার করে তা তাকে কম গুরুত্ব দিয়ে অন্য কোন ভাষাকে গ্রহণ করলে বা প্রাধান্য দিলে তা যে ফলপ্রসূ ও লাভজনক হবে না এ কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। জনগণ যে ভাষা বুঝে না সে ভাষায় তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করলে এতে শুধু বিস্ময়ই সৃষ্টি হতে পারে- আকর্ষণ নয়। সে কারণেই আরবী ভাষায় কুরআন নাজিলের যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

"আমি যদি অন্য ভাষায় কুরআন পাঠাতাম তাহলে এ লোকেরা বলতঃ এর আয়াতগুলো প্রকাশ করে বলা হলো না কেন? ইহা কি আশ্চর্যের ব্যাপার যে কালাম বলা হচ্ছে অনারব ভাষায় অথচ শ্রোতা হচ্ছে আরবী।" (৪১ঃ৪৪)

সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন পরিবর্তনের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা। আর জনমত তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন আমরা যা চাই জনগণ তা ভালো করে বুঝবে, অনুধাবন করবে। এমন ভাষায় যদি কথা বলা হয় যা জনগণ আদৌ বুঝে না অথবা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয় তাহলে আদর্শের শিক্ষা কিতাবী বুলিই থেকে যাবে- জনগণের কোন কাজে আসবে না। আরবী বাদ দিয়ে যদি অন্য কোন ভাষায় কুরআন নাজিল হতো তাহলে কি আরব জাতির কোন লাভ হতো? না। তাই তো আরবীতে কুরআন নাজিল হয়েছে যাতে তদানীন্তন জনগণ তা বুঝতে পারে-

www.nagorikpathagar.org

"আমি উহাকে কুরআনরূপে আরবী ভাষায় নাজিল করেছি সম্ভবতঃ তোমরা (আরববাসীরা) তা অনুধাবন করবে।" (১২ঃ২)

মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় যত সুন্দর করেই বলা হোক না কেন সে অঞ্চলের জনগণের জন্যে তা যে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট থেকে যাবে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃত প্রস্তাবে জনগণের নিকট প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট বলে তখনই গৃহীত হতে পারে যখন তা নিজ জাতির ভাষায় পেশ করা হবে ঃ

"ইহা এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করা হয়েছে- আরবী ভাষায় কুরআন তাদের জন্যে যারা জ্ঞানবান।" (৪১ঃ৩)

তদানীন্তন মক্কার কোন কোন লোক এ বলে অভিযোগ করতো যে, কুরআন তো আমাদের নিজেদের ভাষায় বলা হচ্ছে। এ যদি অন্য কোন ভাষায় পেশ করা হতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে এটা মুহাম্মদের নিজের রচনা নয়-আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে আরবী ভাষার বাস্তব কার্যকারিতার কথাই বার বার উল্লেখ করেছেন। কুরআন নাজিল হওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত যদি আরবীর পরিবর্তে অন্য কোন ভাষায় তা নাজিল করা হতো। লোকেরা বরং আরো বেশী অভিযোগ উত্থাপন করতো (৪১ঃ৪৪)।

বস্তুতঃ পরম জ্ঞানী ও কুশলী আল্লাহ্ জানেন যে কোন জনগোষ্ঠীকে সাবধান করতে হলে, তাদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে হলে, তাদের মন মগজে সত্যের বাণী বদ্ধমূল করে দিতে হলে তাদের নিজেদের ভাষায়ই সর্বোত্তমভাবে সে মহৎ বাণী ও জ্ঞানের কথা পেশ করতে হবে। তাহলেই মানুষ সতর্ক হতে পারবে, তাদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত হবে এবং তারা সত্য পথে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো থেকে তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে, যেমন ঃ

"অতএব (হে নবী) ইহাকে সহজভাবে তোমার মুখ ও ভাষার মাধ্যমে নাজিল করেছি যেন তুমি মুত্তাকী লোকদের সুসংবাদ দিতে আর জেদী লোকদের ভয় দেখাতে পারো।" (১৯ঃ৯৭)

"স্পষ্ট ও পরিষ্কার আরবী ভাষায় ইহাকে নিয়ে আমানতদান রূহ তোমার দিলে অবতরণ করেছে যেন তুমি তাদের মধ্যে শামিল হতে পারো যারা সাবধানকারী।" (২৬ঃ১৯৩-১৯৫)

www.nagorikpathagar.org

"ইহা এমন কুরআন যা আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ যাতে কোন বক্রতা নেই যেন উহারা খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচতে পারে।" (৩৯ঃ২৮)

"আর (হে নবী) এমনিভাবে আমি উহাকে আরবী ভাষায় কুরআনরূপে নাজিল করেছি, এতে নানা রকম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছি সম্ভবতঃ এ লোকেরা বাঁকা পথে চলা হতে বিরত থাকবে। কিংবা উহার দরুন তাদের মধ্যে কিছুটা হুশ-জ্ঞানের লক্ষণ জাগবে।" (২০ঃ১১৩)

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কোথাও বিপ্লব করতে চাইলে আন্দোলনের বাণীকে জনগণের বোধগম্য ভাষায়ই পেশ করতে হবে, তাহলেই জনগণের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি হবে, আলোড়িত হবে তাদের হৃদয়মন, জাগবে সত্য পথে চলার দুর্নিবার আকাঙ্খা, চেতনা সৃষ্টি হবে অবচেতন হৃদয়ে, মানসিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবে জনগণ। এমনি করে আন্দোলনের দাওয়াত হবে কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

আন্দোলনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অন্য একটি দিক দিয়েও বিবেচনা করতে হবে। মাতৃভাষায় যখন কোন কিছু লেখা বা বলা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাতে বিশেষ দেশের সমাজ ব্যবস্থা সংস্কৃতি ও সময়ের অবস্থা প্রতিফলিত হয়। ফলে সে কথা ও বক্তব্য হয় বাস্তব ও জনগণের মানসিকতার উপযোগী। তাই অনুবাদ নির্ভর সাহিত্য দিয়ে জনগণের বাস্তব ও মনঃস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও বুদ্ধি বৃত্তিক প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ জন্য বাংলাদেশে বিপ্লব সংঘটন করতে চাইলে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের আঙ্গিকেই সাহিত্য রচনা করতে হবে এবং বক্তব্য পেশ করতে হবে।

বিপ্লবী ভাবধারা প্রসারে মাতৃভাষার আরেকটি ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি মাতৃভাষায় বিপ্লবী আদর্শের চর্চা ও সাহিত্য রচনা করা হয় তাহলে এমন এক সময় আসে যখন সমগ্র ভাষার মধ্যে সে আদর্শের ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হয়। আদর্শিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে সে ভাষাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ফলে গোটা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আদর্শের আলোকে পূর্ণগঠন হয় সহজতর। তাছাড়া এর প্রভাব সাধারণ সাহিত্যের মাঝেও প্রতিফলিত হয় এবং সাধারণ পাঠকরা পর্যন্ত অতি সহজে সে আদর্শ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। মূলতঃ আদর্শিক দিক থেকে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে মাতৃভাষায় ইসলামের ব্যাপক চর্চা অপরিহার্য।

বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় একটি শক্তিশালী ইসলামী ধারা সৃষ্টি ও বিকাশ আজ সময়ের অপরিহার্য দাবী। আমাদের মাতৃভাষাকে একটি শক্তিশালী "ইসলামী ভাষায়" রূপান্তরের জন্যে প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক জেহাদ, সৃজনশীল একটি আন্দোলনের।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষার বিকাশ ও বিবর্তন

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। এ ভাষার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিবর্তনের রয়েছে প্রায় সাড়ে তেরোশো বছরের দীর্ঘ ইতিহাস। এ ভাষার বিকাশের সঙ্গে বাংলার মুসলিম শাসনের সম্পর্ক অতীব গভীর। কথিত দেবভাষা সংস্কৃত ও তার ধারক-বাহক বর্ণবাদী আর্যব্রাহ্মণ সমাজের সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞার মোকাবিলা করে বাংলা ভাষার যে বিকাশ ঘটেছে সে দেবভাষা পন্থিরাই আজ বাংলা ভাষার উত্তরাধিকার দাবি করে বসে আছে। বঙ্গের অধিকাংশ মানুষ যারা প্রধানত মুসলমান ও অনার্য শ্রেণীভুক্ত বাংলা ভাষা যে মূলতঃ তাদেরই ভাষা, এ কথা আজ অনেকে ভুলতে বসেছেন।

সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেনি

এক সময় একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিলো যে, সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ তত্ত্ব ঠিক নয়। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কোন বুৎপত্তিগত সাদৃশ্য নেই। গৌড় প্রকৃতির পরবর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ হতেই বাংলার উৎপত্তি। সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সাক্ষাত কোন সম্পর্ক নেই। ডঃ শহীদুল্লাহর ভাষায় "বাংলা সংস্কৃতর দুহিতা নয়। তবে দুর সম্পর্কের আত্মীয়া।" (বাংলা ভাষায় ইতিবৃত্ত, ডঃ শহীদুল্লাহ)। আর এ রকম দুর সম্পর্কিয়া আত্মীয়া শুধু সংস্কৃত নয় বরং ইন্দো-ইউরোপী মূল ভাষা *

---

* ভাষা গোষ্টি বা ভাষা পরিবার ঃ একই মূল ভাষা থেকে উদ্ভুত ভাষাসমূহের সমষ্টিকে ভাষা পরিবার বা ভাষা গোষ্টি বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেক ভাষা পরিবারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. ইন্দো-ইউরোপীয়; ২. চীনা-তিব্বতীয় ;৩. আফ্রো-এশিয়ান ;৪. উরালিক-আলটেইক;৫. জাপানী-কোরীয়; ৬. দ্রাবিড়ীয়; ৭. মালয়-পলিনেশীয়; ৮. অষ্ট্রো-এশিয়াটিক; ৯. নীল-সাহারা; ১০. নাইজার-কারডোফেনীয় এবং ১১. খইসান।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্টি হচ্ছে সর্বাধিক বিস্তৃত। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকসংখ্যা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ভাষায় কথা বলে। উপমহাদেশ থেকে শুরু করে পশ্চিম ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড, এবং উত্তর আমেরিকা, দক্ষিন আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার লোকদের প্রধান ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাভাষীরা কৃষ্ণ সাগরের উত্তরাঞ্চলে বাস করতো বলে অনুমান করা হয়। এই ভাষাগোষ্টির প্রাচীনতম ভাষা হচ্ছে হিট্টাইট। তারপর আসে গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষা। বর্তমান পৃথিবীতে এ ভাষাগোষ্টির দশটি শাখা জীবন্ত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ১. আলবেনীয়; ২. আরমেনীয়;৩. বাল্টিক;৪. স্লাভ ;৫. কেল্টিক; ৬. জার্মানিক (ইংরেজী, জার্মান, ডেনিশ, ডাচ, নরওয়েজিয়ান, সুইডিশ এ শাখার প্রধান ভাষা) ৭. গ্রীক ; ৮. ইন্দো-আর্য : ৯. ইরানী এবং ১০. রোমান (ফরাসী, ইতালী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ এ শাখার প্রধান ভাষা)।

www.nagorikpathagar.org

থেকে উদ্ভুত কমবেশী সবকটি ভাষাই। ব্রাহ্মন্য সমাজ তথা হিন্দু সমাজের বাইরেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ। বাংলা ভাষা সূচনা করেন বৌদ্ধগণ। ৬৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে বৌদ্ধ নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৎস্যন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার আদি লেখক বলে পরিচিত। পরবর্তী চারশ বছর বৌদ্ধ পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটতে থাকে। তাদের সুশাসন ও সংস্কৃতি সেবার কারণে বাংলা ভাষার যথেষ্ট চর্চা ও অগ্রগতি হয়। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও বিপ্লব হয়েছিলো উত্তর ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ ও আর্য-ব্রাহ্মণ ধর্মীয় বর্ণবাদের বিকল্প হিসেবে। যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং আর্য-ব্রাহ্মন্য ধর্মের শোষণ ও পীড়নে গোটা ভারত উপমহাদেশীয় জনতা নিষ্পেষিত হচ্ছিলো বাংলাদেশে বৌদ্ধ সাম্যবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে তার অবসানের প্রয়াস চলে। ফলে গোটা ভারতেই সংস্কৃত ভাষা ও

---

* চীনা-তিব্বতীয় ভাষা পরিবার ঃ জনসংখ্যা বিচারে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা পরিবার। প্রায় দেড়শো কোটি লোক সে পরিবারের ভাষায় কথা বলে। চীনা, থাই বর্মী, তিব্বতীয় হচ্ছে এ গোষ্টির প্রধান ভাষা।

আফ্রো-এশীয় ভাষা পরিবার ঃ সেমিটিক ভাষাসমূহ অর্থাৎ আরবী, হিব্রু, উত্তর আফ্রিকার বার্বার, ইথোপিয়ার অ্যামেরিয় হচ্ছে এ পরিবারের প্রধান ভাষা সমূহ। প্রায় ২২ কোটি লোক এ পরিবারের ভাষায় কথা বলে।

উরালিক-আলটেইক পরিবার ঃ ফিনিশীয়, এস্তোনীয়, হাঙ্গেরীয় ও তুর্কী সহ মধ্য এশিয়া ও উত্তর এশিয়ার অধিকাংশ ভাষাসমূহ এ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। প্রায় সাড়ে ষোল কোটি লোক এ পরিবারের ভাষায় কথা বলে।

জাপান-কোরীয় পরিবার ঃ জাপান, উত্তর ও দক্ষিন কোরিয়া এ পরিবারের ভাষায় কথা বলে। এ পরিবারে প্রায় বিশ কোটি লোক রয়েছে।

দ্রাবিড়ীয় ভাষা পরিবার ঃ দক্ষিন ভারত ও শ্রীলংকার অংশবিশেষের প্রায় ২৪ কোটি লোক সে পরিবারের ভাষায় কথা বলে। এ গোষ্টির প্রায় ২০টি ভাষা রয়েছে। তন্মধ্যে তামিল, তেলেগু, কন্নাডা ও মালয়লম এই চারটি ভাষা এ পরিবারের প্রধান ভাষা।

মালয়-পলিনেশীয় পরিবার ঃ ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, ফিলিপাইন, হাউয়াই-নিউজিল্যান্ড, মাদাগাস্কার এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় অধিকাংশ দ্বীপসমূহের প্রায় সাড়ে সাতাশ কোটি লোক সে পরিবারের ভাষায় কথা বলে।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবার ঃ দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের কোন কোন অঞ্চলের এগারো কোটি লোক সে পরিবারের ভাষায় কথা বলে।

নীল-সাহারা, নাইজার-করডোফেনীয় এবং খইসান ভাষা পরিবার ঃ কালো আফ্রিকার ভাষা সমূহ এই তিনটি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। দক্ষিন সাহারা এবং সুদান, সুমালিয়া, ই[illegible] উত্তরাঞ্চলের লোকেরা এ তিনটি ভাষা গোষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রায় ৪৪ কোটি মা[illegible] কথা বলে।

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্যের ঘটে পরাজয়। প্রাকৃত ও দেশজ ভাষা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে ভারতে বিভিন্ন ভাষার সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ শাসনের অনুকুল পরিবেশে বাংলা ভাষারও গোড়াপত্তন হয়। চর্যা পদের কবিদের মাধ্যমে এদেশের জনগণের কথ্য ভাষার বিকাশ ঘটতে থাকে।

নেমে এলো দুর্যোগ ও অন্ধকার

বারো শতকে বৌদ্ধ প্রধান বাংলাদেশে দাক্ষিণ্যত্যের কর্ণাট থেকে এসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ বাংলাদেশ অধিকার করে। এরা ছিলো কঠোর বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ শাসন উৎখাত করে এরা এদেশে সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম (যাকে আজকে হিন্দু ধর্ম বলা হয়) প্রচার প্রসারের ব্যবস্থা করে। এ সেন বংশেরই বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) কান্যকুব্জ থেকে ব্যাপক হারে ব্রাহ্মনদেরকে এনে বাংলাদেশে কৌলিন্য ও বর্ণ প্রথা চালু করেন। শুধু তাই নয় সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত আদর্শ আমদানি করে ভাষাগত কৌলিন্য প্রথা চালু করা হয়। এমনকি রাজাদেশ বলে বাংলা ভাষার চর্চা বন্ধ করে দেয় হয়। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়। রাজাদেশ অনুসরণ করে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দেবভাষা সংস্কৃতের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় তথা বাংলা ভাষায় শাস্ত্র আলোচনায় কিংবা সাহিত্য চর্চায় তীব্র বিরোধিতা করেন। আর্য শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকরা জনগণের ভাষা বাংলার প্রতি এতটা বিরূপ ছিলো যে, বাংলায় শাস্ত্র আলোচনা বা ধর্মের প্রচারকদেরকে রোরব নামক নরকের হুমকি দেয়া হয়েছে। কাজেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ ও প্রসারের যে কোন অনুকুল পরিবেশ ছিলো না তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশে সমাজ, ধর্ম ও বাংলা ভাষার জন্য হিন্দুসেন আমল ছিলো এক কালো যুগ।

বাংলাদেশে মুসলমানদের শাসন ছিলো চরম আর্শীবাদ

সেন রাজাদের আমলে একদিকে যেমন বর্ণ প্রথার কঠোর পীড়নে শোষণে বাংলার সাধারণ জনগণ নিষ্পিষ্ট ছিলো তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও প্রায় লুপ্ত হতে চলেছিলো। যদি সেন রাজত্ব আরো দীর্ঘায়িত হতো তাহলে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণপ্রথা ও ধর্মমত যেমন গোটা সমাজদেহকে চিরতরে পঙ্গু করে দিত তেমনি বাংলা ভাষার বদলে হয়তো সংস্কৃত ভাষাই এখানকার ভাষারূপে স্থায়ীভাবে চেপে বসতো। কিন্তু সৌভাগ্য এ জাতির ও বাংলা ভাষার। অত্যাচার-অনাচারে পিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এদেশের সাধারণ জনতার মুক্তির দুত হয়ে দেখা দিলো বাংলাদেশে মুসলিম শাসন। উৎখাত হলো ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক শ্রেণী। বাংলায় মুসলমান শাসনকে তদানীন্তন বৌদ্ধ সমাজ কিভাবে গ্রহণ করেছিলো তার একটি প্রকৃষ্ট নমুনা পাওয়া যায় রামাই পণ্ডিতের লিখা 'নিরঞ্জনের রুষ্মা 'নামক কবিতায়। এ কবিতায় রামাই পণ্ডিতের দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের সীমাহীন অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে "নিরঞ্জণ" কর্তৃক স্বর্গের দেবতাদের যবন অর্থাৎ মুসলমানরূপে নিযুক্ত করেন ব্রাহ্মণদের শাস্তি দেয়ার জন্যে, যেমন ঃ

www.nagorikpathagar.org

"ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন"
(দ্রষ্টব্য ঃ আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৭৭, পৃঃ ৭১; মোতাহার হোসেন মুন্সী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৮, পৃঃ ১৮-১৯)।

বাংলার জনগণ মুসলিম শাসনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। বাংলাদেশে ইসলামের আগমনে যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিপ্লব সংঘটিত হয় তাতে অবদমিত ও অধিকার বঞ্চিত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বিপুলভাবে ও সহজেই ইসলাম গ্রহণ করে। (গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ১৯৮৪, পৃঃ ২১৫)। ইসলামের এ প্রভাব কোন চাপিয়ে দেয়া বিষয় ছিলো না। বরং জনগণের স্বতস্ফুর্ততায় ইসলামের আত্মসচেতনতার নিকট পূর্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরাজয় ঘটে। (দ্রষ্টব্য গোপাল হালদার ঐ, পৃঃ ১৯৪)। ফলে "সৃষ্টি হয় এদেশের মানুষের মনোরাজ্যে নবচেতনা, তাদের মানস জগতে হয়ে উঠে বিপ্লবমুখী ও সৃজনশীল।" (আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃঃ ১০৬)। আর এ বিপ্লব ও সৃজনশীলতাকে ঠেকানোর জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি ও ক্ষমতাসীনরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। "কিন্তু ইসলামের আত্মসচেতনতার কাছে তাদের সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটে।" (গোপাল হালদার ঐ, পৃঃ ৭২) বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মুসলিম বিজয়ের ফলে আবার ব্যর্থ হলো, বাঙ্গালীর চিত্তও প্রাচীন সংস্কার ও শাস্ত্রীয় শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেলো। (বাংলা কাব্য, হুমায়ুন কবির)। অবশ্য মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে দেড়শো বছর (১২০০-১৩৫০ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য চর্চা তেমন একটা পরিদৃষ্ট হয় না। এ যুগটাকে সন্ধিযুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। সেই সময় সাহিত্য চর্চা ও বিকাশের কোন পরিবেশ সৃষ্টি কার্যতঃ সম্ভব ছিলো না। ১৩৫০-১৮০০ সাল পর্যন্ত যুগটিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য যুগ বলা হয়। এ সময় বাংলা সাহিত্য ও ভাষার উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ইলিয়াসশাহী সুলতানদের (১৪৯৩-১৫৩৮) পৃষ্টপোষকতায় বাংলা চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। মুসলিম আমলে সংস্কৃতের প্রাধান্য খর্ব হয়ে বাংলার প্রাধান্য সৃষ্টি হলেও বাংলা চর্চায় সংস্কৃতের প্রভাব বাস্তব কারণেই থেকেই যায়। সেন আমলে ব্রাহ্মণ শ্রেণী বাংলা চর্চাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও মুসলিম আমলে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে নিম্নশ্রেণী যাদেরকে এতদিন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরের মনে করা হতো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করে। এ ধর্ম সমন্বয়ের মূলগত উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামের প্রভাব হ্রাস করা, অব্রাহ্মণ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখা। এ ধর্ম সমন্বয়ের লক্ষ্যে তাদেরকে একান্ত বাধ্য হয়েই বাংলা

www.nagorikpathagar.org

চর্চার দিকে নজর দিতে হয়। মুসলিম শাসকরা এ বাংলা চর্চার অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে এবং এদেশের পুরনো ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জানার প্রয়োজনে সংস্কৃত থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাদির অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করে, উৎসাহ যোগায়। ফলে সে সময়কার বাংলা চর্চায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থেকে যায়। বাংলা ভাষায় উর্দু হিন্দু ও ফার্সীর প্রভাব বাড়তে থাকে মোগল আমল হতে (১৫৭৬ খ্রীঃ) রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রভাবে (১৭০৫-১৭৫৭ খ্রীঃ)। এবং ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার কিছু দিন পর্যন্ত (১৭৫৭-১৮০০) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফার্সী ও উর্দুর প্রভাব দ্রুত বেড়ে যায়। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের প্রয়াসে সৃষ্টি হয় দো-ভাষী বাংলা, গড়ে উঠে পুঁথি সাহিত্য। ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে বিকশিত হয় বাংলা ভাষা। সেই নতুন বিকশিত দো-ভাষী বাংলার প্রভাব থেকে হিন্দু লেখকগণও মুক্ত ছিলো না। কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চলমান ও বিকাশমান ধারাকে বদলে দিলো। ডঃ শহীদুল্লাহর ভাষায় ঃ "যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটতো তাহলে এ পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের পুস্তকের ভাষা হতো"

(ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড ১৯৮১, পৃঃ ২৭১)

সংস্কৃতঘেঁষা ভাষার অভ্যুত্থান

১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। সূত্রপাত হয় নতুন আরেক ধারা। শুরু হয় ভিন্ন ধরনের বাংলা চর্চা। তবে তা জনগণের বাংলা নয়-সংস্কৃত ভাষারই কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক গতিপথকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ কৃত্রিম উপায়ে সংস্কৃতানুসারী করার প্রয়াস পান। এ বিদ্যাসাগরী সংস্কৃত বাংলার সাথে বাংলার জনগণের বিশেষ করে মুসলিম জনগণের কোন সম্পর্ক ছিলো না। যার ফলে মুসলিম জ্ঞান চেতনা নির্ভর সমাজ চিত্র ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাংলার সাথে বিদ্যাসাগরীয় বাংলার তীব্র পার্থক্য সৃষ্টি হলো। এ অবস্থার প্রতিরোধ মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভাষায় "পলাশীর বিপর্যায়ে দিশেহারা মেরুদণ্ডভাঙ্গা মুসলমানদের তখন প্রতিবাদ করার শক্তি ছিলো না। তাদের সাহিত্য চর্চার খেয়ালও একরূপ লোপ পেয়েছিলো। ফলে সেই থেকে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অমুসলমানদের একচেটিয়া হয়ে উঠেছিলো। অমুসলমান সাহিত্যিকদের সাধনায় বাংলা সাহিত্য যে রূপগ্রহণ করলো মুসলমানদের ভাবধারা ও জীবনধারার সাথে তার কোন সংশ্রব ছিলো না।" *(আবুল কালাম শামসুদ্দীন সভাপতির অভিভাষণ, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, সম্পাদনা সরদার ফজলুল করিম, পৃঃ ১২০)*

www.nagorikpathagar.org

ভাষা-সাহিত্যে মুসলিম জাগরণ

অনেকদিন পর যখন মুসলমানরা আবার সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করে তখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে ছিলো যে, হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের অনুসরণ-অনুকরণই বিশেষ করে ভাষা ও স্টাইলের ক্ষেত্রে মুসলিম সাহিত্যিকদের অন্যতম উপজীব্য হয়ে দাঁড়ালো। এরপর ধীরে ধীরে মুসলমানদের জাগরণ আসে। মুসলিম সাহিত্যিকগণ মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত বহুল আরবী, ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করতে থাকেন। এ ছিলো আত্মসচেতনতার ফল। এর ফলাফলও হয়েছিলো সুদুর প্রসারী। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায় "জাগরণ ও সচেতনতার যে লক্ষণ ও কলরোল এতে দেখা ও শোনা গেছে তা এমন একটি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলো যার ফলে স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে পড়ে।" সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী (প্রবন্ধ) পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, পৃঃ ৬৯)। এদেশের জনগণ অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলো। তাদের স্বপ্ন ছিলো, আশা ছিলো স্বাধীন পাকিস্তানে তারা তাদের মাতৃভাষা বাংলার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের স্বকীয়তা ও জীবনধারা বিকশিত হবে। যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিলো মুসলিম আমলে। যে বাংলাকে কৃত্রিমভাবে মুসলিম জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিলো পাকিস্তানে আবার সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সঠিক ধারায় বিকশিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে এই ছিল তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তদানীন্তন পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর ভাষাকে উপেক্ষা করলো, এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো। পাকিস্তান হওয়ার অল্প কয়েকদিন পরেই এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো ইসলামী সংগঠন তমদ্দুন মজলিস এবং অধ্যক্ষ আবুল কাসেম প্রমুখ মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদগণ। তাদের প্রয়াসে সৃষ্টি হলো ভাষা আন্দোলন। ৫২-এর রক্তঝরা ভাষা আন্দোলন ৪৭-৪৮-এ সৃষ্ট ভাষা আন্দোলনেরই চূড়ান্ত পরিণতি। অথচ বাম ও সংস্কৃতপন্থীরা গোটা ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনাকে বিকৃত করার প্রয়াস পায় যা আজো অব্যাহত।

ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই ৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ঘটে ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের এক নতুন ও বিশাল দিগন্তে উন্মোচিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভুত হয়নি বরং প্রাথমিক যুগে বাংলার চর্চা ছিলো সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃত তথা বর্ণ আর্য

www.nagorikpathagar.org

ভাষার বিকল্প ভাষা ও সাহিত্য গড়ে তোলার প্রয়াসে। সে প্রয়াসেই বাংলার সাহিত্যের উৎপত্তি।

২. বৌদ্ধ পাল শাসকগণের সময়েই প্রাচীন বাংলা উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকাশ সাধিত হয়। তখন উত্তর ভারতে ছিলো সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের প্রাধান্য আর বাংলাদেশে ছিলো জনগণের ভাষা তথা বাংলা ভাষার প্রাধান্য।

৩. বর্ণ হিন্দু শাসক সেন রাজগণের আমলে বাংলা ভাষার চর্চা ব্যাহত হয়। সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষার উপর যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন তার ফলে বাংলা একরূপ প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বাইরেই বাংলা চর্চা কিছু অব্যাহত ছিলো। অবশ্য হিন্দু সমাজের সবাই বাংলা চর্চার বিরোধী ছিলো না। শুধু ব্রাহ্মণ সমাজই বিরোধিতা করে।

যাইহোক, এটা স্পষ্ট করেই বলা যায়, সেন বংশ তথা হিন্দু রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হয়তো চিরতরে অবলুপ্তি ঘটতো।

৪. মুসলমান শাসনামলেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। মুসলিম শাসনামলে বাংলার জনগণ তাদের মাতৃভাষার চর্চা ও সাহিত্য রচনার অনুকুল পরিবেশ পায়। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ গঠিত ও সংহত হওয়ার পর মুসলিম সমাজেওইসলামী ভাবধারা পূর্ণ ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষা সংস্কৃত প্রাধান্য মুক্ত হয়। বাংলার অধিকাংশ জনগণের ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে বাংলা ভাষা অন্যতম একটি ইসলামী ভাষায় পরিণত হতো।

৫. বৃটিশ আমলে তদানীন্তন হিন্দু কবি সাহিত্যিক যে ভাষার চর্চা করেছেন, যে সাহিত্য কর্ম সৃষ্টি করেছেন তার সাথে এদেশের বাঙালী জনগণের তথা মুসলিম জনতার মন-মনন, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাজ চিত্রের কোন সম্পর্ক ছিলো না। সাহিত্যে তার প্রতিফলনও ঘটেনি। কাজেই সে সাহিত্যকর্ম ও ভাষার সাথে বাঙালী বর্ণ হিন্দুদের যত বেশী সম্পর্ক আছে বাঙালী মুসলমানদের ততই কম সম্পর্ক আছে।

৬. বিশ শতকের দিকে এসে সাহিত্যে মুসলমানদের জাগরণ আসে। গণমানস কেন্দ্রিক-ব্রাহ্মণ্য চিন্তা ও সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়।

৭. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে সর্বাধিক অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে বাঙালী মুসলমানদের প্রত্যাশা ছিলো। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এদেশবাসীর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে বাংলা ভাষার প্রত্যাশিত মর্যাদার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়।

৮. বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। পৃথিবীতে বাংলা রাষ্ট্রভাষা বাংলাদেশেই আছে। কাজেই বাংলা ভাষা ও বাঙালীত্বের মূল ধারক বাংলাদেশ ও তার মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

জনগোষ্ঠী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত বিকাশ নির্ভর করে বাংলাদেশের উপর। পশ্চিম বঙ্গ কেন্দ্রিক বাংলা ও সাহিত্য দিয়ে বাংলা ভাষার বিকাশ তরান্বিত হবে না। বাংলাদেশ কেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্যই হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল ধারা। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের মূলধারা নয়। মনে রাখা দরকার বাংলা আমাদের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা আর পশ্চিম বঙ্গে বাংলা হচ্ছে কার্যত তৃতীয় ভাষা। হিন্দী ও ইংরেজীর পর।

৯. বাংলাদেশের সমাজ ও গণ-নির্ভর ভাষা ও সাহিত্য রচনার মাধ্যমেই বাংলা ভাষার বিকাশ সাধন করতে হবে। এদেশের মুসলিম জনতার আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটাতে হবে। এদেশবাসীর চিন্তা-চেতনা সাহিত্যে ফুটে উঠতে হবে। এদেশবাসীর ভাষায়ই সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হতে হবে।

১০. বাংলার মুসলমানদেরকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় এতটা যত্নবান হওয়া প্রয়োজন যাতে এককালের অগ্নিপুজকদের ভাষা ফারসী যেমন একটি শক্তিশালী ইসলামী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে তেমনি বাংলাকেও একটি শক্তিশালী ইসলামী ভাবধারা পুষ্ট ভাষায় পরিণত করা সম্ভব। এটি ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতিসেবীদের লক্ষ্য হওয়া চাই। ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলা প্রধানত আমাদেরই ভাষা, মুসলমানদেরই ভাষা। তাকে সমৃদ্ধ করার প্রধান দায়িত্ব আমাদেরই। তবে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবস্থানকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বাংলা ভাষার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে মুসলিম লেখকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। আজ যারা বাংলা চর্চার নামে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতানুসারী করতে চায়, বহুল প্রচলিত মুসলিম সমাজের ভাবধারাপুষ্ট আরবী ফার্সী শব্দ বেছে বেছে বাদ দিতে চায় তারা আমাদের ভাষা বিকাশের ও গণ-ভিত্তিক ভাষার অন্তরায়। তারা মূলতঃ সেন যুগের সংস্কৃতিপন্থীদেরই অনুসারী। এদের প্রতিরোধ করতে হবে। এরা ঢাকা নয় কোলকাতাকে বাংলা ভাষার রাজধানী মনে করে। এদের ভাষা অনুগত্য এদেশের মাটি ও মানুষ নয়। এরা ইসলাম, মুসলিম ও বাংলাদেশের গণমানুষের চেতনার প্রতিপক্ষ। আমাদের ভাষার বিরুদ্ধে এদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে আরেকটি ভাষা আন্দোলন প্রয়োজন। পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হচ্ছে প্রধানত বাংলার মুসলমানরাই। বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই এককালের বৌদ্ধ ও অনার্য নিপীড়ত শ্রেণী থেকে উদ্ভুত। কথিত 'অনার্য' ও মুসলমানরাই বাংলা ভাষার জন্মদাতা। আজ তাদেরকেই আবার এ ভাষার প্রকৃত বিকাশে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত সমস্ত ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করতে হবে, নস্যাৎ করতে হবে। এটা আজ আমাদের অন্যতম জাতীয় দায়িত্ব।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখন ঢাকামুখী

কোলকাতা ও ঢাকা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুটি কেন্দ্র। একটি ঔপনিবেশিক যুগের। অপরটি স্বাধীন যুগের। একটি অপসৃয়মান। অপরটি উদীয়মান। একটি ইতিহাসের বিষয়। অপরটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিষয়। কিন্তু এ সরল সত্যটি নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটেনি। তাই ঢাকার কেউ কেউ এখনও কোলকাতার স্বীকৃতির অপেক্ষা করেন। কোলকাতা পুরনো আভিজাত্যের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছে না। অথচ কোলকাতা ও ঢাকার অবস্থান 'ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের সাধারণ নিয়মেই পরিবর্তিত হচ্ছে। এ বিষয়টি এখনও কারো কারো কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়শঃ দেখা যায় যে, কোন দেশ ও জাতির ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ধারায় একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে। দৃশ্যতঃ ঐ 'কেন্দ্র' ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐ কেন্দ্রটি কার্যতঃ সংশ্লিষ্ট ভাষা ও সাহিত্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ঐ কেন্দ্রই ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে নেতৃত্ব প্রদান করে। অবশ্য একাধিক কেন্দ্র যে হতে পারে না, এমন নয়। তবে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি প্রধান কেন্দ্র লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সময়ে গৌড়, আরাকান, মুর্শিদাবাদ ও কোলকাতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছে।

ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ঐসব কেন্দ্র ভাষা-সাহিত্য চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। ইতিহাস থেকে আরো একটি বিষয় বুঝা যায় যে, ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র সব সময় এক স্থানে থাকেনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। আর এসব কেন্দ্র গড়ে উঠার পিছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাই মূখ্য কারণ হিসেবে কাজ করেছে। সাধারণতঃ দেশের রাজধানীই ভাষা-সাহিত্যের কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। মোটকথা, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে স্থান বিশেষের কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকতে পারে, কোন স্থান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এটি একটি বাস্তবতা।

কেন্দ্র হিসেবে কোলকাতা

ঊনিশ শতকের পুরোটাই এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল কোলকাতা। এ যুগটি হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগ। কোলকাতা হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগের কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের প্রভাবাধীন যে ভাষা ও সাহিত্যের

www.nagorikpathagar.org

বিকাশ ঘটেছে, তা প্রধানতঃ সংস্কৃত মুখী ও আর্য-হিন্দু ভাবধারাপুষ্ট। ভৌগলিকভাবে রাঢ়ীয়। এসব সাহিত্যে পূর্ববাংলার সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব গৌণ। অধিকাংশ বাঙালী জনগোষ্ঠীর তথা মুসলিম মন-মানস, তাদের সুখ-দুঃখ, অনুভূতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজচিত্র কোলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যের অপ্রধান অংশ। তাছাড়া ঔপনিবেশিক প্রভাব তো রয়েছেই। এক কথায় উনিশ শতকের বৃটিশ সহযোগিতা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতা কেন্দ্রিক যে ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়েছে, তা গোটা বাঙালীর জাতির মূল অংশ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না।

ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার উত্থান

ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হবার পর এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (পাকিস্তানের প্রধান অংশ হিসেবে) পূর্ববাংলা গঠিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ইতিমধ্যেই এদেশের ভাষার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র দানাবেধে উঠে।

এদেশের তরুন সমাজ ভাষার জন্যে আন্দোলন গড়ে তুলে। রক্তের বিনিময়ে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলা (তথা প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঢাকা হয় এর রাজধানী। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এ নতুন মাত্রা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে ঢাকার উত্থানকে বলিষ্ঠতর ও বেগবান করে। এখন ঢাকাই হচ্ছে তত্ত্বগত ও বাস্তব অর্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখন ঢাকামুখী। কোলকাতামুখীনতা অপসৃয়মান। বর্তমান পরিস্থিতি ও বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষা সাহিত্যের কেন্দ্র হিসেবে বর্তমান ঢাকার কোন বিকল্প নেই। একটি ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠার জন্যে যেসব কার্যকারণ ও উপাদানের উপস্থিতি প্রয়োজন, তার সব কয়টিই এখন ঢাকার অনুকুলে। নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ক. রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য ঃ ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য থাকে, সেখানেই ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ দ্রুত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে সত্য। বিভিন্ন যুগে-গৌড়, আরাকান, কোলকাতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই। এখন রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য স্থানান্তরিত হয়েছে বাংলাদেশে তথা ঢাকায়। কোলকাতা হিন্দী প্রধান ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানে রাষ্ট্রীয় আনুকল্য অনুল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ ও কোলকাতাকে বাংলা ভাষা ও

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্যের ক্ষেত্রে দিল্লীর নয়, ঢাকার আনুকুল্যের উপরই নির্ভর করতে হবে। কাজেই ঢাকাই হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক কেন্দ্র।

খ. রাষ্ট্রভাষা ঃ বাংলা এদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে বাংলা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা, সরকারীভাষা। কাজেই বাংলা চর্চা, পুষ্টি ও বিকাশ যে এখানেই সবচেয়ে বেশী হবে তাই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষার 'আপন ঘর' হচ্ছে বাংলাদেশ। এখানে সে লালিত হবে। বিকশিত হবে। পুষ্টি লাভ করবে। যে দেশের রাষ্ট্রভাষা-সরকারী ভাষা বাংলা, সে দেশ ও তার রাজধানী বাদ দিয়ে অন্য কোন দেশ ও অঞ্চল ভাষার কেন্দ্র হবে এটি অবাস্তব, অমূলক।

গ. দেশের জনগণের ভাষা ঃ বাঙলাদেশের জনগণের প্রায় একশ ভাগই বাংলায় কথা বলে। বাংলা তাদের মাতৃভাষা। উপজাতীয় লোকদের নিজস্ব কথ্য ভাষা থাকলেও তাদেরও লেখাপড়া ও সাহিত্যের ভাষা বাংলা। কাজেই যে জাতির মাতৃভাষা ও রাষ্ট্র ভাষা উভয়টি বাংলা, সে জাতির আবাসভূমি ও তার রাজধানী যে ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র হবে এটিই তো স্বাভাবিক।

ঘ. জাতি গঠনের অন্যতম ভিত্তি ঃ আমাদের জাতি গঠনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে বাংলা ভাষী পরিচয়। বাঙালী জাতির মূল অংশের আবাস ভূমি বাংলাদেশ। বাঙালী জাতির প্রধান ও মূল অংশের আজ একটি স্বাধীন দেশ ও রাষ্ট্র রয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী অধিকাংশ মানুষই বাংলাদেশে বাস করে। বাঙালী নিয়েই বাংলাদেশ গঠিত। অন্যদিকে কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ভারতের অধীন একটি অঞ্চল মাত্র। সেখানে তাদের পরিচয় ভারতীয়। এরা সেখানে সংখ্যালঘু। তাদের বর্তমান জাতিসত্ত্বা বিনির্মানে বাংলা ভাষার কোন ভূমিকা নেই। অন্যদিকে বাঙালী জাতি, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ আজ এক সমন্বিত জাতি-সত্ত্বায় লীন। তাই বাংলাদেশই হচ্ছে বাংলা ভাষার লালনভূমি, বিকাশভূমি। বাংলা হচ্ছে এখানকার শিক্ষার মাধ্যম ঢাকা হচ্ছে এর কেন্দ্র। যেখানে যে ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়, সেখানে সেই ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ যে দ্রুত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চ. পাঠক ও সাহিত্যের বাজার ঃ বাংলাদেশ হচ্ছে বাংলা বই-পুস্তকের ক্রমবর্ধমান বাজার। বাংলা পাঠক সংখ্যা বিপুল এবং ক্রমবর্ধমান। ভবিষ্যতে এদেশই হবে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বাজার। যেখানে পাঠক থাকে, বাজার থাকে, সেখানে সাহিত্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। পাঠক ও বাজার ছাড়া আজকের যুগে সাহিত্য বিকাশ প্রায় অসম্ভব। তাই পশ্চিমবঙ্গকেও ভবিষ্যতে তাদের সাহিত্যের বাজারের জন্যে, পাঠকের জন্যে বাংলাদেশের উপর নির্ভর করতে হবে। বাংলাদেশে যদি পশ্চিমবঙ্গ তার সাহিত্যের বাজার না পায়, তাহলে তার সাহিত্য কর্ম এমনিতেই সংকোচিত হয়ে পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

ছ. ভাষার জন্য সংগ্রাম ঃ বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছে, চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। রক্ত দিয়ে তারা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা অন্য কোন ভাষার আধিপত্য মেনে নেয়নি। অথচ কোলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এর উল্টো। সেখানে তারা ভারতীয় জাতীয়তায় বিলীন। হিন্দীর চাপে পিষ্ট। কোলকাতা শহরেই আজ বাংলা গৌণভাষায় পরিণত হয়েছে। কাজেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব দেয়ার কোন বাস্তবতা ও যোগ্যতা তাদের আর নেই। সেদিন তাদের আগেই ফুরিয়ে গেছে।

জ. কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঃ বড় বড় কবি সাহিত্যিকগণ ভাষা ও সাহিত্যের গতিপথ রচনা করেন। তাদের সৃজনশীল প্রচেষ্টা ও অবদানের কারণেই ভাষা ও সাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। ফলশ্রুতিতে এর বিকাশ হয় ত্বরান্বিত। সাধারণতঃ তাদের চর্চার ক্ষেত্রই ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আবার ভাষা ও সাহিত্যের অনুকুল কেন্দ্রই খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আজকের বাংলাদেশ ও তার রাজধানী ঢাকাই হচ্ছে কবি-সাহিত্যিকদের সবচেয়ে অনুকুল কেন্দ্র। প্রতিভা বিকাশের সর্বাধিক অনুকুল ক্ষেত্র এখানে রয়েছে। কাজেই দিন যতই যাবে ততই বাংলাদেশে ভাষা ও সাহিত্য প্রতিভা জন্ম নেবে। মধ্যযুগেও এর প্রমাণ যথেষ্ট। ইতোমধ্যেই এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্রমেই কাব্য, নাটক, ছোট গল্প ও উপন্যাস প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঢাকার প্রাধান্য সৃষ্টি হচ্ছে। যতটুকু ঘাটতি আছে, তা সময়ের ব্যবধানে কেটে যেতে বাধ্য। বস্তুতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রাজধানী যে ঢাকা হতে বাধ্য, একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোলকাতা এক্ষেত্রে ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হবে। তা যেমন প্রত্যাশা, তেমনি চলমান ধারার যৌক্তিক পরিণতিও বটে। এখনও যারা কোলকাতার স্বীকৃতির জন্য লালায়িত, তারা ভাষা-সাহিত্যের বিকাশমান ধারাটি বুঝতে অপারগ। ঢাকার সাহিত্য কোলকাতার স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়, থাকবে না। বরং সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন ঢাকার স্বীকৃতি ছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হবে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতিপথ গৌড়, আরাকান, মুর্শিদাবাদ, কোলকাতা হয়ে এখন ঢাকামুখী। ঢাকাই হচ্ছে এর বর্তমান লালন কেন্দ্র, বিকাশ কেন্দ্র।

জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি সময়ের দাবী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কোলকাতা মুখীনতা পরিহার করে ঢাকামুখী হয়েছে, একথা সত্য। তবে বাংলা দেশের সাহিত্য এখনও স্বকীয়তাবোধে পুরোপুরি উজ্জীবিত হয়ে উঠেনি। স্থানগত পরিবর্তন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কোলকাতা থেকে ঢাকায় কেন্দ্র স্থানান্তর নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এবং এ পরিবর্তনই অনিবার্যভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনবে। তবে এখন পর্যন্ত অন্যান্য

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তনগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। এখনও আমাদের সাহিত্যে এদেশের বৃহৎ সমাজের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, ভাবাদর্শ, মুল্যবোধের প্রভাব দুর্বল। আমাদের স্বকীয়তাবোধ, আমাদের আদর্শিক চেতনা, আমাদের জাতীয় চেতনা, জাতীয় ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের দায়বোধ এখনও আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে তেমন বলিষ্ঠ নয়। স্বকীয় মূল্যবোধের বিকাশের পরিবর্তে পশ্চিমা ও কোলকাতা কেন্দ্রিক বিচ্যুত ধ্যান-ধারণা ও জীবনদৃষ্টিকে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াস আছে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের একাংশে। আমাদের সমাজকে পশ্চিমাকরণের একটি প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট লক্ষ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে প্লট নির্মাণে, চরিত্রায়নে, প্রতিটি ক্ষেত্রে। আমাদের স্বকীয়তার প্রতি কমিটেড, আমাদের জনগণের মুল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লেখকের সংখ্যা নগণ্য। মহৎ মানবিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসও অনুল্লেখযোগ্য। পুরানো, গতায়ু, উত্তেজক রাজনৈতিক শ্রেণী হিংসার তত্ত্ব কপচানো বা পশ্চিমের নৈরাজ্যিক ধ্যান-ধারণা প্রসারের চেষ্টা এখনও শেষ হয়নি। প্রেমের নামে সুস্থ মূল্যবোধকে ধ্বংস করার, পরিবার প্রথায় ভাঙ্গন ধরিয়ে সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা আছে আমাদের শিল্প সাহিত্যের কোন কোন ক্ষেত্রে। ব্যষ্টিক আশা-আকাঙ্খা ও যন্ত্রণা প্রাধান্য পাচ্ছে জাতীয় ও সামষ্টিক আশা-আকাঙ্খার উপরে। ফলে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস হচ্ছে ব্যাহত। মূলকথা, আমাদের বর্তমান সাহিত্য দ্রুত ঢাকামুখী হচ্ছে, এটি যেমন সত্য, তেমনি আমাদের সাহিত্য এখনও জাতীয় সাহিত্য হয়ে উঠেনি তাও সমভাবে সত্য। ব্যতিক্রম নেই, তা নয়। তবে এখনও চলমান সাহিত্যের মুখ্যধারা জাতীয় সাহিত্যের পরিমন্ডলকে সমৃদ্ধ করছে না। অথচ জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক উজ্জীবনের জন্যে জাতীয় সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার গড়ে উঠা প্রয়োজন। অথচ আমরা এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। ঢাকা কেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্যের এ সন্ধিযুগে বিকাশপর্বে আমাদেরকে বাংলাদেশের গণ-মানুষের আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-চেতনা, ভাবাদর্শ-মূল্যবোধের প্রতি কমিটেড সাহিত্য রচনা করতে হবে। শুধু কোলকাতা থেকে ঢাকামুখী হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং কোলকাতার ভাবাদর্শ পরিহার করে ঢাকার ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই ভাষা সাহিত্য হবে গতিময় ও সমৃদ্ধ। পূরণ করবে জাতীয় প্রয়োজন। গড়ে উঠবে এক বিশাল সমৃদ্ধ বাংলাদেশী বাঙালী সাহিত্য কর্ম। কোলকাতার যুগে খন্ডিত সাহিত্য যতটুকু এগিয়েছে, তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী এগিয়ে যাবে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। ভাষা ও সাহিত্যের ঢাকামুখীনতা আজ সাহিত্যসেবীদের নিকট এটিই দাবী করছে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের সংস্কৃতি

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি একটি ব্যাপক ভিত্তিক প্রত্যয়। কোন জনগোষ্টির বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, শিল্পকলা, জীবনাচরন, প্রযুক্তি ইত্যাদি সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত।

প্রত্যেক সংস্কৃতির দুটো প্রধান দিক রয়েছে- বস্তুগত দিক ও অবস্তুগত বা বিমূর্ত দিক। সমাজের মানুষ যা তৈরী করে মানবিক প্রয়োজন মিটায় তা হচ্ছে সংস্কৃতির বস্তুগত দিক আর সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, আচরণ, জীবন ধারা ইত্যাদি হচ্ছে সংস্কৃতির অবস্তুগত দিক। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির অবস্তুগত দিকটাই কোন জনগোষ্ঠির স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচায়ক হয়ে দাড়ায়।

ব্যাপ্তি বিচারে সংস্কৃতি স্থানীয়-আঞ্চলিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন হতে পারে। আবার একই সংস্কৃতির অধীনে বিভিন্ন উপ-সংস্কৃতি (Sub-culture) গড়ে উঠতে পারে।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট

সংস্কৃতির সাধারণ কতকগুলো বৈশিষ্ট বা চরিত্র রয়েছে। তন্মধ্যে চারটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন ক) সংস্কৃতি কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বা ধারায় সমাজের মানবিক প্রয়োজন পূরন করে। খ) সংস্কৃতি কোন জৈবিক/প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারের বিষয় নয়- এ হচ্ছে সামাজিক বিষয়। সংস্কৃতি শিক্ষা-দীক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেহেতু সংস্কৃতি অর্জিতব্য বিষয় তাই সংস্কৃতি পরিবর্তন ও রূপান্তরযোগ্য। গ) সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশ প্রতীক নির্ভর। শব্দ-ভাষা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক যার মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রকাশ, বিকাশ ও প্রসার ঘটে। ঘ) সংস্কৃতি বিভিন্ন অঙ্গ বা উপাদান (Traits) নিয়ে গঠিত। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অঙ্গ বা উপাদান নিয়ে গড়ে উঠে নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন।

সংস্কৃতির উপাদান

সংস্কৃতির অনেক উপাদান রয়েছে। তন্মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- ক) প্রাকৃতিক উপাদান খ) ঐতিহাসিক-ঐতিহ্যিক উপাদান গ) প্রযুক্তিগত-বস্তুগত উপাদান ও ঘ) ধর্মীয় উপাদান।

ভূগোল, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু-আবহওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদানের অন্তর্ভূক্ত। মানুষের জীবন ধারাকে প্রাকৃতিক উপাদান সমূহ গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। একই ভাষা-সাহিত্য-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, জয়-পরাজয়, গৌরব গাঁথা ইত্যাদি হচ্ছে সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক-ঐতিহাসিক উপাদান।

www.nagorikpathagar.org

এ উপাদানটি জাতি-সত্ত্বা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উৎপাদিত দ্রব্যাদি ও উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তিগত মান ও ব্যবহার ইত্যাদি হচ্ছে সংস্কৃতির বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উপাদান। মানুষের বাহ্যিক জীবন ধারা গঠনে এ উপাদানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির বিমূর্ত অংশের প্রধান উপাদান। মানুষের বিশ্বাস-চিন্তা-চেতনা-বিশ্ব দৃষ্টি-জীবনবোধ-আধ্যাত্মিকতা-নৈতিকতা-মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ-পরিবার গঠন-সামাজিক প্রথা-উৎসব-সমাজ গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্ম সর্বাধিক প্রভাবশালী উপাদান। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম মৌলিক উপাদান রূপে কাজ করে। মানুষের মানস জগতে ও জীবনে ধর্মের মতো কোন কিছুই এত গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বস্তুতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির ভিত্তি উপাদান আর অন্যগুলো হচ্ছে গৌণ উপাদান।

সংস্কৃতির রূপান্তর

সংস্কৃতি নিশ্চল কোন বিষয় নয়। সংস্কৃতি পরিবর্তন ও রূপান্তরযোগ্য। এ পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে নানা কারনে। তন্মধ্যে অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ও যোগাযোগ এবং নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে।

অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ও যোগাযোগের ফলে কয়েকভাগে পরিবর্তন আসতে পারে। সমীভবনের (Assimilation) মাধ্যমে প্রভাবশালী সংস্কৃতিটি অন্য সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নিতে পারে। ফলে তার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন জনগোষ্টি নিজেদের সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে অন্য সংস্কৃতি গ্রহন করতে পারে। ধর্মান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে এটি প্রায়শঃই ঘটে থাকে। আবার প্রসারন (Diffusion) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি অন্য জনগোষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তা ঐ জনগোষ্টির সংস্কৃতির অঙ্গে পরিনত হতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেতে সংযোগের ফলে সাংস্কৃতিক বিনিময়ও ঘটতে পারে। প্রত্যেক সংস্কৃতিই অন্য সংস্কৃতির কাছ থেকে কিছু না কিছু গ্রহন করতে পারে। প্রত্যেকেই অন্যের দ্বারা কিছু না কিছু প্রভাবিত হতে পারে। মোট কথা যোগাযোগ ও সংযোগের ফলে সংস্কৃতির ঘটে পরিবর্তন ও রূপান্তর। এ রূপান্তর যেমন বৈপ্লবিক ও আমূল হতে পারে তেমনি হতে পারে ধীর গতি ও আংশিক।

নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে মানুষের জীবন ধারার ও অভ্যাসের অনেক পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদন পদ্ধতি, ভোগ ব্যবহার, রুচি অনেক বদলে যায়। ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘটে পরিবর্তন। বিশেষ করে সংস্কৃতির বস্তুগত দিকটি অনেকটাই আবিষ্কার-উদ্ভাবনের উপর নির্ভরশীল।

www.nagorikpathagar.org

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

সভ্যতা উন্নত ও প্রভাবশালী শিল্পকলা, নিয়ম-প্রথা, প্রযুক্তি, সরকার ও সমাজ পদ্ধতি ইত্যাদির সমষ্টিগত রূপ। সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কযুক্ত হলেও ঠিক এক নয়। যে কোন জীবন ধারায়ই তা সরল হোক, অনগ্রসর হোক, আর জটিল ও অগ্রসর হোক সবই সংস্কৃতি। তাই জনগোষ্টি মাত্রই তার সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু সভ্যতা জটিল ও প্রভাবশালী জীবন ধারাকে বুঝায়। তদুপরি প্রযুক্তি ও বস্তুগত উপাদানগুলো সভ্যতার সাথে বেশী সংশ্লিষ্ট। সে কারনে প্রত্যেক জনগোষ্টির নিজস্ব সভ্যতা নাও থাকতে পারে। তাছাড়া সংস্কৃতি যে কোন পরিসরে হতে পারে। কিন্তু সভ্যতার পরিসর অনেক বিশাল। সমকালিন সভ্যতার ধারকরাই সাধারণতঃ ইতিহাসের সে স্তরে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

সংস্কৃতি ও ধর্ম

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত সুগভীর। বেশীর ভাগ ক্ষেতেই ধর্ম সংস্কৃতির ভিত্তি রূপে কাজ করে। কেননা মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, পরিবার গঠন, সমাজ পদ্ধতি, নিয়ম প্রথা, উৎসব শিল্পকলা-স্থাপত্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ধর্ম সর্বাধিক প্রভাবশালী ভুমিকা পালন করে। ধর্মের প্রভাব মুক্ত কোন সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিরল। বৈপ্লবিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। কাজেই কোন জাতির সংস্কৃতি বিশ্লেষণে ধর্মের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। একে এড়িয়ে কোন জাতির সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝা সম্ভব নয়।

ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ ও জীবন ধারা নির্ভর যে সংস্কৃতি তাই ইসলামী সংস্কৃতি। তাওহীদ হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মর্মমূলে। ন্যায়, সত্য, সুন্দর, মানবিকতা, স্বাভাবিক ও সুষম-সুস্থ জীবনধারা ইসলামী সংস্কৃতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। পরিশীলিত উন্নত মহৎ জীবন হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির স্বাভাবিক ফল। তাওহীদের পরিপন্থী জীবন ধারা, বিপর্যয়-ধ্বংস, অমানবিকতা, জুলুম, ভারসাম্যহীনতা, কদর্যতা-অশ্লিলতা হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির বিপরীত। কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক যে জীবনাচরন তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী নির্দেশনা নির্ভর আধ্যাত্মিক, মানবিক ও ব্যবহারিক গুনাবলী ও আচরনের সমষ্টি হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতি এক ব্যাপক বিষয়। চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস-মূল্যবোধ-নৈতিকতা থেকে শুরু করে ব্যক্তি গঠন, পরিবার গঠন, সমাজ গঠন, রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তা পরিব্যাপ্ত। জীবনের কোন স্তরই ইসলামী সংস্কৃতির বাইরে থাকতে পারেনা। ইসলামী সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে তার সার্বজনীতা। এ সার্বজনীনতা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে। মানব জাতির জন্যে এক সাধারণ সংস্কৃতির প্রবক্তা ইসলাম। সবদেশের, সবকালের

www.nagorikpathagar.org

মানবজাতির উপযোগি এক সাংস্কৃতিক বোধ ও প্যাটার্ন শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য কোন স্থানীয়, জাতীয় বা এথনিক সংস্কৃতিকে মিটিয়ে দেয়া নয় বরং তাকে ইসলামের আলোকে পরিশীলিত করা, ইসলামের সঙ্গে সংগতিশীল করা ও বিকাশ দান করা এবং যাবতীয় সংকীর্নতাকে পরিহার করে মানবিক সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিন্ডলের সঙ্গে সেতুবন্ধন তৈরি রচনা করা।

মুসলিম সংস্কৃতি

নীতিগত ভাবে মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি ভিন্ন কিছু নয়। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী সংস্কৃতি আবশ্যিকভাবেই ইসলামী আদর্শ নির্ভর, ঐতিহাসিকতা বা স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মিকরন-সমীভবন এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির ভিত্তি অনিবার্যভাবে ইসলাম হলেও ঐতিহাসিকতা ও ঐতিহ্য, আত্মিকরন ও সমীভবন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক পরিক্রমায় কোন আচরন ও প্যাটার্ন যখন মুসলিম জাতির পরিচয়সূচক হয়ে পড়ে তখনই তাকে মুসলিম সংস্কৃতি বলা হয়। মুসলমানরা আরব, পারস্য সহ বিভিন্ন দেশের নির্দোষ অনেক কিছুকে আত্মস্থ করে নিজের করে নিয়েছে। এসব এখন অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম পরিচয়সূচক হয়ে দাড়িয়েছে। ভাষা-পরিভাষা, পোশাক-আশাক, নামকরন, সামাজিক আচরন ইত্যাদি প্রায় সব ক্ষেত্রেই সংকীর্ন অর্থে ধর্মীয় বৈশিষ্ট ছাড়াও মুসলিমজাতিগত বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে আমরা মুসলিম সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

মুসলিম সংস্কৃতির দুটো দিক রয়েছে- বিশ্বজনীন ও আপেক্ষিক। বিশ্বজনীন দিকটি প্রধানতঃ ইসলাম নির্ভর আর খানিকটা আরব ও মুসলিম সভ্যতার যুগে প্রচলিত ও গৃহীত সংস্কৃতি নির্ভর। আপেক্ষিক দিক বলতে কোন একটি দেশ ও জাতির প্রেক্ষিতে পাশাপাশি অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়/জাতি থেকে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সে দেশের/জাতির মুসলিম জনগোষ্টি যে সব আচরন ও বৈশিষ্ট্যকে নিজদের পরিচয় সূচক মনে করে সেসবের সমষ্টিকে বুঝানো হয়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, এদেশের হিন্দু ও মুসলমানরা একই দেশে, একই ভাষার অধীনে দীর্ঘদিন বাস করা সত্ত্বেও তাদের জীবনাচরন, পোশাক-পরিচ্ছদ-নামকরন-সামাজিক উৎসব ইত্যাদির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কিছু পার্থক্য নির্ভেজাল ধর্মীয় আর কিছু পার্থক্য সাংস্কৃতিক। যেমন- নামকরনের কথা বলা যায়। ভালো, সুন্দর ও শির্ক মুক্ত নাম রাখা হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ। ভাষা এখানে গৌণ। কিন্তু বাংলাদেশসহ সব দেশেই মুসলমানদের নামের প্রধান অংশ (বা মূল নাম) আরবী রাখা হয়। আমাদের দেশে আরবীর পাশাপাশি কখনও কখনও ফার্সী নামও রাখা হয়। হিন্দু সম্প্রদায় সব সময়ই সংস্কৃতি ঘেষা বাংলা নাম রাখেন। তাদের নামের সঙ্গে প্রায়ই কোন না কোন দেবতার নাম থাকে। অন্যদিকে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র দাসত্ববোধক নাম পছন্দ

www.nagorikpathagar.org

করে। এদেশে হিন্দু নাম আর মুসলিম নামকরনের ব্যাপারে দুটো পৃথক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এখানে আরবী-ফার্সী নাম অনিবার্য ভাবেই মুসলিম নাম তথা মুসলিম সংস্কৃতি। এমনকি কোন আরবী নাম যদি ইসলামী ভাবধারার পরিপন্থীও হয় তবু এটি মুসলিম নাম বলেই মানুষের কাছে বিবেচিত হয়। যেমন- আবদুন্নবী (নবীর দাস), আব্দুস শামস (সূর্যের দাস) ইত্যাদি নাম শির্ক যুক্ত নাম তথা ইসলাম বিরোধী নাম হলেও আরবী ভাষায় হওয়ার কারনে মুসলিম নাম বিবেচনা করা হয়। ফার্সী ভাষায় কোন নাম রাখলেও তার অর্থ যা ই দাড়াক তাকেও আমাদের দেশে মুসলিম নাম মনে করা হয়। পোশাক আশাক, সামাজিক অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রেও অনেক মুসলিম ঐতিহ্যগত রূপ গড়ে উঠেছে। একইভাবে সাহিত্য সংগীত শিল্পকলা স্থাপত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মুসলিম ধারা গড়ে উঠেছে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে কোন সামাজিকতা/আচরন, অনুষ্ঠানাদি কোথাও মুসলিম সংস্কৃতি বলে বিবেচিত হলেও তা যদি সরাসরি ইসলামের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হয় তাহলে অবশ্য তা পরিত্যাজ্য। যা হোক মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে মুসলমানদের ঐতিহ্যিক জীবনধারা যা তাকে অন্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। বিশ্বজনীন দিক বিচারে দুনিয়ার সব মুসলমানের সংস্কৃতি প্রায় এক্। কিন্তু আপেক্ষিক দিক বিচারে দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও অঞ্চলের সংস্কৃতিতে কিছুটা পার্থক্য থাকবেই।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি

যেকোন দেশের সংস্কৃতিই প্রাকৃতিক, কারিগরী, নৃতাত্বিক, ধর্মীয় ইত্যাদি উপাদান সমন্বয়ে গড়ে উঠে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাকৃতিক-ভূগৌলিক পরিবেশ, ভাষা, নৃতত্ত্ব, উৎপাদন ব্যবস্থা, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি। তবে এদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ধর্ম। বলতে গেলে ধর্ম হচ্ছে এখানকার সংস্কৃতির মূল উপাদান। ঐতিহাসিকভাবে এখানে কখনও জৈন, কখনও বৌদ্ধ, কখনও আর্য-হিন্দু সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছে। সবশেষে ব্যাপক প্রভাব নিয়ে এসেছে ইসলাম যা আজো অব্যাহত।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল ধারা হচ্ছে মুসলিম ধারা। এদেশে ইসলামের প্রসারের পর থেকে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধিত হয়। শির্কবাদী-বর্ণবাদী সাংস্কৃতিক ধারার পরিবর্তে তাওহীদী ধারা বিজয় লাভ করে। জনগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধারা গ্রহন করে জীবনের অঙ্গ করে নেয়। তখন থেকেই বিকাশের পথ ধরে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি বাংলাদেশের মূল ধারায় পরিণত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস-মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক চেতনা, বিশ্বদৃষ্টি, পরিবার গঠন, নামকরন, সামাজিক, অনুষ্ঠান, উৎসব, ভাষা-পরিভাষা, স্থাপত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম ও মুসলিম এতিহ্য বোধ অনস্বীকার্য। এমনকি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক-দেশজ উপাদান নির্ভর সংস্কৃতিও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত। প্রাকৃতিক-দেশজ এবং ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

ও মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি। তাই এখানে বাঙালী, বাংলাদেশী ও মুসলিম সংস্কৃতি এক দেহে লীন। এ তিনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। এ তিনের সমন্বয়েই এদেশের জাতীয় সংস্কৃতি। যারা বাঙালী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করতে চায় তারা এ জাতি সাংস্কৃতিক দুশমন। যারা বাংলাদেশী ও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে চায় তারা জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের পথে তীব্র বাধা।

মূল ধারা ও গৌণ ধারা

যেকোন দেশের সংস্কৃতিতে একাধিক ধারা থাকতে পারে। তবে তন্মধ্যে যে ধারাটি বেশীর ভাগ জনগনের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটিই মূল ধারা। অন্যগুলো গৌণ ধারা। বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯০% জনগোষ্টির জীবনধারা ইসলামের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বিগত হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে ইসলাম বাঙালী-বাংলাদেশী জাতির জীবনের প্রধান ধারায় পরিনত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল ধারা হচ্ছে মুসলিম ধারা। অন্যান্য ধারাগুলো হচ্ছে গৌণ ধারা। মূলধারা সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ কোন সাংস্কৃতিক ধারায়ই জাতীয় সংস্কৃতি হতে পারেনা।

হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত কোন সাংস্কৃতিক ধারা নেই

যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তাদের একটি অংশ বাঙালী সংস্কৃতির নামে প্রাক-মুসলিম বাঙলার সংস্কৃতিকে এদেশের জাতীয় সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ অংশটি যে দেশের বেশী ভাগ জনগোষ্টির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আবার আরেকটি অংশ হিন্দু-মুসলিম মিলিত বা সমন্বিত ধারার সংস্কৃতির প্রবক্তা। এরাও সমন্বয়ের কথা বলে প্রকারান্তরে মুসলিম ধারাটিকে ধ্বসিয়ে দিতে চায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে হিন্দু-মুসলিম মিলিত কোন সাংস্কৃতিক রূপ নেই। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাওহীদবাদী আর হিন্দুরা অংশীদারী। মুসলমানরা স্রষ্টাকে আল্লাহ্ নামে ডাকে আর হিন্দুরা ডাকে ইশ্বর-ভগবান বলে। হিন্দুরা পৌত্তলিক আর মুসলমানরা পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। হিন্দুরা চরম বর্ণবাদী আর মুসলমান জীবনে বর্ণবাদের অবকাশ নেই। মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ, নামকরন হিন্দুদের মতো নয়। মুসলমানদের বিয়ে, ঘরসংসার, সন্তান লালনপালন, উত্তরাধিকার নীতি হিন্দুদের চেয়ে ভিন্ন। মুসলমান মৃত্যু বরন করলে জানাযা পড়ে কাফন পড়িয়ে কবরস্থ করা হয়। আর হিন্দু মৃত্যু বরন করলে শ্মশান ঘাটে দাহ করা হয়। মরনোত্তর অনুষ্ঠানও এক নয়। হিন্দুদের শ্রাদ্ধ আর মুসলমানদের দোয়া, কুলখানি এক নয়। মুসলমানদের সামাজিক রীতিনীতি আর হিন্দুদের সামাজিক নীতি এক নয়। একদল সালাম-খোদা হাফেজ-আল্লাহ্ হাফেজ বলে আরেকদল নমস্কার-আদাব বলে। মুসলমানদের খাদ্য তালিকা আর হিন্দুদের খাদ্য তালিকা হুবহু এক রকম নয়। হিন্দুরা যে গরুকে

www.nagorikpathagar.org

দেবতা জ্ঞান করে মুসলমানরা তাকে সুস্বাদু খাবার মনে করে। মুসলমানদের ঈদ আর হিন্দুদের দূর্গাপূজা সম্পূর্ণ পৃথক সংস্কৃতির ধারক। মসজিদ আর মন্দির এক সংস্কৃতির প্রতিনিধি নয়। আজান ও শাখের ঘন্টা-হুলধ্বনির ব্যবধান এত যে এর মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। এমনি অবস্থায় সমন্বিত সংস্কৃতির অবকাশ কোথায়?

একটি গোষ্টির মতে যেহেতু বাঙালী মুসলিম ও হিন্দু উভয়ের ভাষা এক, সাহিত্য এক, তারা একই ভৌগলিক পরিবেশে বাস করে, তাদের সবারই প্রধান খাদ্য ভাত-মাছ, তাদের প্রযুক্তিগত মানও এক, উৎপাদন ব্যবস্থাও এক; কাজেই তাদের সংস্কৃতিও এক। কিন্তু ভাষা এক হলেই যে সাহিত্য-সংস্কৃতি এক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা এক হলেও তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এক নয়। লাতিন আমেরিকার দেশ সমূহের ভাষা এবং ল্যাটিনীয় ইউরোপের ভাষা এক হলেও তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এক হয়নি। একই ভূখন্ডে একই ভাষার অধীনে দীর্ঘদিন বাস করা সত্ত্বেও সাদা আমেরিকান ও কালো আমেরিকান সংস্কৃতি হবহু এক নয়। তেমনি বাঙালী মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের ভাষা ও ভূখন্ড এক হলেও তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এক নয়। তাদের উভয় জনগোষ্টির কবি-সাহিত্যিকগনের রচনাবলী একই জীবনধারার প্রতিনিধিত্ব করে না, তাদের উপজীব্য বিষয়, এমনকি শব্দ চয়ন, পরিভাষার মধ্যেও রয়েছে বিস্তর ব্যবধান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি। তার কবিতায়-সাহিত্যে অনেক কিছু থাকলেও নেই বাংলার অধিকাংশ জনগোষ্টি তথা মুসলিম জীবনের চিত্র। নেই তাদের হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখের কথা। রবীন্দ্রনাথের বাঙালী মানে বাঙালী হিন্দু। বাঙালা ও বাঙালী কবি হয়েও তার সাহিত্য কর্মে মুসলমানরা অনুপস্থিত কেন? অবাঙালী মারাঠা নেতা শিবাজীর বন্দনায় বাঙালী কবির এত ভাবাবেগ কেন? বলা হবে রবীন্দ্রনাথ ভালো করে মুসলিম সমাজকে জানতেননা-এর সাথে গভীর ভাবে পরিচিত ছিলেন না বলে তার পক্ষে মুসলিম চরিত্র ফুটিয়ে তোলা বাস্তব সম্মত ছিল না। বলা হবে তিনি যেহেতু হিন্দু ছিলেন তাই মারাঠা হিন্দু বীর শিবাজীর প্রতি তার আকর্ষন থাকাই স্বাভাবিক। তাই যদি হয় তাহলে একথা মেনে নিতে হবে যে রবীন্দ্র সাহিত্য বাংলা সাহিত্য হলেও অধিকাংশ বাঙালী তথা মুসলমানদের জাতীয় বা নিজস্ব সাহিত্য নয়। এ সাহিত্য বাংলার বেশীর ভাগ জনগোষ্টির প্রতিনিধিত্ব করেনা। জীবনান্দ দাসের কবিতায় বাংলার রূপ নিখুতভাবে চিত্রায়িত হলেও বাংলার অধিকাংশ জনগোষ্টি তথা মুসলমানের রূপ অনুপস্থিত। অন্যান্য হিন্দু কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কেও একই কথা। অন্যদিকে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের লিখায় নানাভাবে মুসলিম জীবনও ঐতিহ্য ফুটে ফুটে উঠেছে। এমনটি কেন? কারন খুবই স্পষ্ট। প্রত্যেকেই স্ব স্ব জনগোষ্টির সংস্কৃতিকে প্রতিনিত্ব করেন। কাজেই একই ভাষাভাষি হলেও উভয় জনগোষ্টির সংস্কৃতি এক নয়। বস্তুতঃ এদেশের হিন্দু-মুসলমানের ভাষা, ভূখন্ড, বস্তুগত উপাদান এক হলেও তাদের ধর্ম

www.nagorikpathagar.org

পৃথক, ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৃথক, জীবন ধারা পৃথক তাই তাদের সংস্কৃতি পৃথক। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে দুটো জনগোষ্টির স্বাতন্ত্র্য মানে এই নয় তাদেরকে সব ব্যাপারেই পৃথক হতে হবে। তাদের মধ্যে কোন মিলই থাকবে না।

আমাদের বুঝতে হবে যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে, তাদের জীবন ধারার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে নানান দিকদিয়ে অমিল ও স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে। এ স্বাতন্ত্র্যই এক জনগোষ্টিকে অন্য জনগোষ্টি থেকে পৃথক করে দেয়। তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য সৃষ্টি করে। সমস্ত মানুষের মধ্যেই যেমন কিছু বিষয়ে মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে অমিলও। সব মিলই সাংস্কৃতিক মিল সৃষ্টি করে না আবার সব অমিলও অনিবার্যভাবেই সাংস্কৃতিক পার্থক্য সৃষ্টির কারন নয়। মূলতঃ যে সব বিষয় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে সেগুলোই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কিছু বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও কতিপয় বিষয়ে অমিল থাকার কারনেই সংস্কৃতির পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির-জনগোষ্টির সংস্কৃতি বিশ্লেষন করলে এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ভাত যেমন বাঙালীর প্রধান খাদ্য তেমনি এশিয়ার বহুদেশেরও প্রধান খাদ্য। একই ধরনের প্রযুক্তিও আজ পরস্পর বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্টির ব্যবহার করছে। কাজেই উৎপাদিত দ্রব্য, উৎপাদন পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস বা প্রযুক্তির ব্যবহারের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক পার্থক্য নির্ধারন খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কারণ একাত্মতাবোধ বা স্বাতন্ত্র্যবোধের বিষয়টি প্রধানতঃ আত্মিক-মানসিক। তাই যন্ত্রপাতি-প্রযুক্তি বা বস্তুগত উপাদানের বা প্রাকৃতিক উপাদানের উপর তা এতটা নির্ভরশীল নয়। এক্ষেত্রে ধর্ম, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিমূর্ত বিষয়গুলো সর্বাধিক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই বাঙালী মুসলমান ও হিন্দু জনগোষ্টির মধ্যে কিছু বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের স্বাতন্ত্র্যই মুখ্য। তাই উভয় জনগোষ্টির সমন্বিত সংস্কৃতির ধারনাটি একটি অলিক ও অবাস্তব বিষয়। এদেশের ইসলামী ও মুসলিম সংস্কৃতিকে নির্মূল ও নস্যাত করার লক্ষ্যেই সমন্বিত সংস্কৃতির ধারনার প্রচার করা হয়। এ হচ্ছে এক গভীর ষড়যন্ত্র। একে রুখতে হবে।

সেক্যুলার-ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিরই নামান্তর

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিরই নামান্তর। কেননা, এখানে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি বলতে হয় প্রাক-ইসলামী তথা সেন-বর্মন যুগের সংস্কৃতিকে বুঝানো হয় নতুবা সমন্বিত সংস্কৃতিকে বুঝানো হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এদেশের নব্বই ভাগ মানুষের উপর দশভাগের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চলে। এ হচ্ছে সংখ্যাগুরু অংশকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে চালু করার ষড়যন্ত্র। ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ, অমীহ বা উপেক্ষা থেকেই এসব সৃষ্ট। মুসলিম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করাই এসবের উদ্দেশ্য। তাই সেগুলো সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য

www.nagorikpathagar.org

প্রাকৃতিক উপাদানজাত কিছু স্থানীয় প্রভাব আমাদের সংস্কৃতিতে রয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বকীয়তা নির্ধারক হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি। একে পাশ কাটিয়ে প্রাকৃতিক উপাদানজাত স্থানীয় সংস্কৃতিকে বড় করে দেখার কোন সুযোগ নেই। মুসলিম বোধের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে সেগুলোকে সংরক্ষন ও বিকাশ দান করা যেতে পারে।

আরেকটি গোষ্টি সেক্যুলার সংস্কৃতির নামে পশ্চিমা বস্তুবাদী-ভোগবাদী-নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতিকে এখানে চালু করার ঘৃণ্য প্রয়াসে লিপ্ত। মোটকথা বাংলাদেশে সেক্যুলার-ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির চর্চা মানে সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্টির সংস্কৃতির বিপরীত ধারায় চলা, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশকে নস্যাৎ করে দেয়া, আমাদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে মুছে ফেলা, আমাদের জাতি সত্ত্বাকে মূল ধারাচ্যুত করা এবং সর্বোপরি বিশেষ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে কৌশলে করে সবার উপর চাপিয়ে দেয়া। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এদেশে মুসলিম সংস্কৃতির মানে কোন ভাবেই হিন্দু বিদ্বেষ নয়। ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে সহনশীলতা-সহঅবস্থান ও মানবিক সংস্কৃতি। ইসলাম অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দান করে স্ব স্ব পরিমন্ডলে তার বিকাশের সুযোগ দান করে থাকে। কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রশ্নে ইসলাম অত্যন্ত উদার। কিন্তু এই উদারতা মানে এই নয় যে সেই সংস্কৃতিকে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হবে। বা তাকে মুসলিম সমাজে চালু করার সুযোগ দেয়া হবে। অথচ বাংলাদেশ সেক্যুলার পন্থিরা সে কাজটি করারই অপচেষ্টা লিপ্ত।

আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। অন্যান্য উপাদানজাত সাংস্কৃতিক দিকগুলো সমীভবন প্রক্রিয়ায় মুসলিম সংস্কৃতির মূল কাঠামোর সঙ্গে মিশে গেছে। মুসলিম বোধ হচ্ছে এখানকার সংস্কৃতির মর্মমূলে। মুসলিম পরিচয়বোধের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন কিছু এখানে বিজাতীয় সংস্কৃতি। ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে এদেশের সংস্কৃতির মূল ধারা। অন্য সব হচ্ছে গৌণ ধারা। ইসলামকে পাশ কাটিয়ে এখানে জাতীয় সংস্কৃতি বলতে কিছু সেই। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি মানে বিগত হাজার বছরের বিবর্তন ও বিকাশের ধারায় ইসলামের ভিত্তিতে পরিশীলিত ও পরিস্রুত সংস্কৃতি। এ ভাবধারার যারা বিরোধী তারা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিপরীত পক্ষ। তারা সেন-বর্মন যুগের তল্পী বাহক। তারা রাজা বল্লাল সেন-গনেশ-গৌড় গবিন্দ-পরশু রাম-শ্রী চৈতন্যের উত্তরসুরী। তাদের যাবতীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র রুখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঃ বিকাশের ধারা

সংস্কৃতি একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রত্যয়। চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-মূল্যবোধ, জীবনাচরণ সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতির নিয়ামক উপাদানগুলোর মধ্যে ধর্ম সর্বাধিক প্রভাবশালী ও স্থায়ী। কোন যুগেই সংস্কৃতির উপর ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায়নি। ধর্মকে অস্বীকার করে সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা কখনই সফল হয়নি। এ শতাব্দীতে কমিউনিজম এ ধরনের প্রয়াস চালিয়েছিলো। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কয়েক দশকের তীব্র প্রচারণা এবং অমানবিক দমন নীতি চালিয়েও জনগণের মন থেকে ধর্মের প্রভাবকে মুছে ফেলা যায়নি। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ধর্মের প্রভাবমুক্ত সংস্কৃতি কখনই মানুষের জীবন ও সমাজে স্থায়ী শিকড় গাড়তে পারে না। কাজেই যেকোন জাতির সংস্কৃতি বিশ্লেষণে ধর্মকে প্রধান বিবেচনায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে এখানকার ধর্মীয় বিকাশ ও রূপান্তর সরাসরি সম্পৃক্ত। ধর্মীয় পরিবর্তনের সাথে সাথে এদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তন। ধর্মীয় ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে এখানকার জীবন ধারা। যখনই ধর্মের পরিবর্তন ঘটেছে তখন জীবন ধারার ক্ষেত্রেও ঘটেছে পরিবর্তন। আর সেই সাথে রূপান্তর ঘটেছে সংস্কৃতিরও।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারাকে প্রধানত চারটি স্তরে ভাগ করা যায়- [ক] প্রাচীন বঙ্গ-দ্রাবিড়ীয় যুগ [খ] জৈন-বৌদ্ধ যুগ [গ] আর্য-ব্রাহ্মণ্য যুগ ও [ঘ] মুসলিম যুগ।

বঙ্গ-দ্রাবিড়ীয় যুগ

বাংলাদেশের প্রাচীন যুগের অধিবাসী হচ্ছে প্রধানত দ্রাবিড় জাতি। তাই এখানকার সংস্কৃতিও ছিলো দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতি। দ্রাবিড় জাতি পশ্চিম এশিয়ার সেমিটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্ট জন্মের হাজার হাজার বছর আগে তারা ভারতবর্ষে আগমন করে। গড়ে তুলে সিন্ধুর হরুপ্পা ও মোয়েঞ্জুদারোতে সুবিশাল এক সভ্যতা। পর্যায়ক্রমে এই দ্রাবিড় জাতি বাংলাদেশে তাদের স্থায়ী আবাস গড়ে তুলে। এ প্রসঙ্গে ডঃ রমেশ মজুমদার লিখেন "..সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর বা তাহারও পুর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।" [বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ষষ্ঠ সংস্করন, ১৯৭৪, পৃঃ ১৩] আলেকজান্ডারের সময়কার [মৃত্যু খৃঃ পৃঃ ৩২৩] গ্রীক ঐতিহাসিক বিবরণীতে গংগার পূর্বদিকে অর্থাৎ বাংলাদেশে অত্যন্ত শক্তিশালী-উন্নত-সভ্য 'গংগারিড়ী" নামক এক রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গংগারিড়ী রাজ্য যে দ্রাবিড় রাজ্য ছিল তা

www.nagorikpathagar.org

অনেকে মনে করেন। এথেকে বুঝা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকেও বাংলাদেশে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিলো। খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে আর্য জাতি ভারতেবর্ষে প্রবেশ করে। তারা সিন্ধুর দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা ধ্বংস করে সেখানে আধিপত্য স্থাপন করে। তারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু দ্রাবিড় জাতির প্রবল বাধার কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি।

জৈন ও বৌদ্ধ যুগ

আর্যরা ভারতবর্ষের জনগণের উপর বর্ণবাদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়। পৌত্তলিক-বর্ণবাদী-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জুলম ও অনাচারের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এবং অতি দ্রুত তা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। দ্রাবিড় অধ্যুষিত বাংলাদেশে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের আগেই জৈন ধর্ম এখানে প্রবেশ করে। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে খৃঃ পূঃ চার থেকে তিন শতকের মধ্যেই উত্তর বঙ্গে জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল [বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ১৩০]। শত শত বছর ধরে জৈন ধর্ম ছিল এদেশের একটি প্রধান ধর্ম [আব্দুল মান্নান, বাংলা ও বাঙালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, পৃঃ ৩৭] পরবর্তীতে জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম এর স্থলাভিষিক্ত হয়। সম্রাট অশোকের সময়ে [খৃঃ পূঃ ২৭৩-২৩২] বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বাংলাদেশ বৌদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। খৃষ্টীয় পাঁচ-ছয় শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিলো বাংলাদেশের মূল ধর্ম ও সংস্কৃতি। কিন্তু খৃষ্টীয় ছয়-সাত শতক পর্যন্ত গুপ্ত শাসন ও শশাংকের রাজত্ব কালে এবং সাত শতকের মাঝামাঝি থেকে আট শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাৎস্যান্যায়ের যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অবশ্য পরবর্তীতে পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। সেসময়টি ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। বস্তুত খৃষ্ট পূর্ব ৩য় অব্দ থেকে খৃষ্টীয় ১২ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত [মধ্যবর্তী কিছু কাল ব্যতীত] প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। মূলত বারো শতকে সেন-বর্মন আমলেই বাংলাদেশ থেকে স্থায়ী ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি সমূলে উৎখাত হয়ে যায়।

আর্যের আগমন ও গুপ্ত-শশাংকের যুগ

খৃঃ প্রথম শতকে আর্যরা বাংলায় আসে। কিন্তু পাঁচ-ছয় শতকের আগে আর্যরা এখানে দৃঢ়প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্ত শাসকদের পৃষ্টপোষকতায়ই পাঁচ-ছয় শতকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে। গুপ্ত বংশের পর সাত শতকের শুরুতে গৌড়ে [পশ্চিম বঙ্গে] শশাংক নামে এক রাজার আবির্ভাব ঘটে। ব্রাহ্মণ্যবাদী শৈব ধর্মে বিশ্বাসী শশাংক ছিলেন চরম

www.nagorikpathagar.org

বৌদ্ধ বিদ্বেষী। তার শাসনামলে যদিও ব্রাহ্মণরা ছিলো রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী কিন্তু দেশের জনগণ ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, ব্যবসা-বানিজ্যেও ছিলো তাদের আধিপত্য, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিলো বর্ধিষ্ণু। তাই তিনি বৌদ্ধ নির্মূল অভিযান চালান। [ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙলার ইতিহাস, আদি পর্ব পৃঃ৮১-৮২]। সে সময় বৌদ্ধ ধর্ম বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

মাৎসন্যায় বা অরাজকতার যুগ

শশাংকের কুশাসন, সীমাহীন অত্যাচার-অনাচার ও বর্ণবাদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মকে এদেশের সংখ্যা গরিষ্ট জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের সমাজে প্রচন্ড অন্ত-বিরোধ দেখা দেয়। সেকারণে শশাংকের মৃত্যুর সাথে সাথে দেশে চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয় [যা মাৎসান্যায় নামে পরিচিত]। সাত শতকের মাঝামাঝি থেকে আট শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সে সময় দেশে কোন কেন্দ্রিয় শাসন ছিলোনা। অরাজকতার সুযোগে ব্রাহ্মণরা জনগণের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। তারা জনগণের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে বৈদিক-সংস্কৃত ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ডঃ নীহার রঞ্জনের ভাষায় "সাত শতকের মাঝামাঝি থেকে আট শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আস্তানা সমুদ্র তীর পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। আর বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শের উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচ ছায়া বিস্তার করেছে। ছোট-বড় ভূ-স্বামীত্ব তখন ব্রাহ্মণদের দখলে। বৌদ্ধ মঠগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেগুলোর ইট-কাঠ খুলে নিয়ে ঘর বাড়ী করা হচ্ছে। "[বাংলার ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ৫৫]। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বৌদ্ধ জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। তারা তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অধিকার পূনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

পাল বিপ্লব ও বৌদ্ধ পুনরুত্থান

৭৫০ সালে মাৎসান্যায়ের অবসান ঘটিয়ে জনগণের সমর্থনে এক সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মাবলী পাল সরকার গঠিত হয়। তাদের রাজত্ব কাল প্রায় সাড়ে চারশো বছর স্থায়ী হয় [৭৫০-১১৬২]। পাল বংশের শ্রেষ্ট রাজা ধর্মপাল [৭৭০-৮১০] ও দেব পাল [৮১০-৮৪০] এর আমলে সমগ্র ভারতবর্ষই তাদের প্রভাবাধীনে চলে আসে। পাল আমল বাংলার শিক্ষা-ভাষা-সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল যুগ। গুপ্ত শাসন, শশাংকের রাজত্ব ও মাৎসান্যায়ের যুগে বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতির যে গতিরোধ করা হয়েছিল পাল আমলে তার অবসান ঘটে। পাল আমলেই বাঙালী জাতি ও ভাষার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। এ সময় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের জয়জয়কার। বৌদ্ধ ধর্ম তখন বাংলা-বিহার ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা পায়। পাল বৌদ্ধ আমলে শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপক

www.nagorikpathagar.org

প্রসার ঘটে। তদানিন্তন বৌদ্ধ পণ্ডিত শীল ভদ্র, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞানার্জনে ছাত্ররা বাংলায় আসতেন। বাংলা ভাষারও প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে পাল-বৌদ্ধ আমলে। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য চর্যাপদ তখনকারই সৃষ্টি। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে সেসময়। জনজীবনে আসে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। মোটকথা বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো তদানিন্তন বাংলার সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি। তবে পাল আমলের শেষের দিকে বৌদ্ধ শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু-বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নামে বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে পরাভূত করার ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র অনেকটা সফল হয়।

সেন-বর্মন আমল ঃ ভাষা-সংস্কৃতির বিপর্যয়

বাংলাদেশে সেন-বর্মনদের আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতা দখল এদেশের ইতিহাসের এক দূর্ভাগ্যজনক অধ্যায়। তাদের সংক্ষিপ্ত শাসনামল বাংলাদেশের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি ও ভাষার জন্যে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। সেন-বর্মন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মন্যবাদী, বর্ণবাদী। তাদের শাসনামলে বাংলার বদলে সংস্কৃত ভাষাকে রাজ ভাষা করা হয়। বাংলার বিকাশ থামিয়ে দেয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য নীতির পরিবর্তে বর্ণপ্রথার নিগড়ে সমাজকে বেধে ফেলা হয়। বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ জনগোষ্টীকে নির্মূলের ব্যবস্থা করা হয়। বৌদ্ধ জনগোষ্টী ও তথাকথিত নিম্ন বর্ণের অনার্য জনগনের উপর নেমে আসে চরম অত্যাচার-অনাচার। ডঃ নীহার রঞ্জনের ভাষায়ঃ "সেন-পর্বের এই দেড়শো বছরে বাংলাদেশ জুড়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই জয়জয়কার। জৈন ধর্মের কোন চিহ্ন নেই। বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধেরা নিষ্প্রত। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বিরল। বৌদ্ধ বিহার থাকলেও তাদের সেই অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নেই। এই তিন বংশের সচেতন চেষ্টাই ছিল বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাংলায় একছত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা" [বাংলার ইতিহাস আদি পর্ব,পৃঃ১৪৭-১৪৮]। "এই যুগের প্রধান চেষ্টাই হল পৌরানিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শ অনুযায়ী বাংলার সমাজকে একেবারে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো। সেই চেষ্টার পিছনে ছিল রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন। উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেরাও ছিল তার পোষকও সমর্থক। এই যুগে বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে বর্ণ ও শ্রেণীর দিক থেকে খন্ড খন্ড করে ভেঙে নতুন করে গড়া হয়েছিল ; এই গড়ার পিছনে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবার কিংবা নিজের করে নেবার কোন আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ এই ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, স্তরে-উপস্তরে দুর্লংঘ প্রাচীরে বিভক্ত। রাজসভার চরিত্রবল ও আত্মশক্তির অভাব। ধর্ম ও সমাজ বিলাসব্যসনে মশগুল। শিল্প ও সাহিত্য বাস্তবতা হারিয়ে ফাঁকা উচছাস, অত্যুক্তি ও দেহসর্বস্বতায় ভরে উঠেছে। জনসাধারনের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড ও তুক-তাকে পঙ্গু। উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট।"[ঐ পৃঃ ৯৮]

www.nagorikpathagar.org

সেন-বর্মন আমলে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিই শুধু ধ্বংস হয়নি বরং দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা বানিজ্যও ধবংসের মুখে নিপতিত হয়েছিল। চর্যাপদের বিভিন্ন গীতিতে তার ভূরি ভূরি প্রমান মিলে। যেমন একটি গীতিতে বলা হয়েছেঃ'টিলাতে আমার ঘর, পাড়াপড়শী নেই। হাড়িতে ভাত নেই; সারাদিন ক্ষুধায় ধুঁকছি। আরেকটি গীতিতে আছেঃ'শিশুরা ক্ষুধার্ত, তাদের দেহ কংকালসার, বন্ধুবান্ধবেরা বিমুখ, পুরনো ফুটোফাটা পাত্রে সামান্যই জল ধরে। অন্যত্র আরো করুণ চিত্রঃ পরনে তার ছেঁড়া কাপড়, বিষণ্ন শীর্ণ দেহ। ক্ষুধায় শিশুদের চোখ গর্তে-ঢোকা, পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে; তারা খাবে বলে কাঁদছে। দীন দুস্থ ঘরের বৌ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করছেন, এক মুঠো চালে যেনো একশ দিন চলে। বসত বাড়ীর দৈন্য দশার বর্ণনা পাওয়া যায় আরেকটি গীতিতেঃ 'কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে; কেঁচোর সন্ধানে আসা ব্যাঙেরা আমার ভাঙা ঘর ছেয়ে ফেলেছে।' [ঐ, পৃঃ৭৬]

মোট কথা সেন-বর্মন রাজত্বে বাঙালী জাতি, বাংলার সমাজ, বাংলা ভাষা ও জনগনের জীবন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বাংলার মাটি থেকে স্থায়ী ভাবে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি। যেকোন বিচারে সেন-বর্মন শাসন ছিল বাংলাদেশের জন্যে চরম অভিপাশ। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশে বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কখনই সাদরে গৃহিত হয়নি। প্রথমে গুপ্ত আমলে ও শশাংকের রাজত্ব কালে এবং পরবর্তীতে সেন-বর্মন যুগে এ ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে মাত্র। প্রবল রাজনৈতিক-সামাজিক অত্যাচার ও চ পর মুখে জনগণের একটি অংশ দেশান্তরি হয়েছিল, আরেকটি অংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করে সমাজের অধঃপতিত নিম্ন শ্রেণীর ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, আর অন্য অংশটি অবদমিত অবস্থায় মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছিল।

প্রসঙ্গত এটা ও জানা দরকার যে মুসলিম শাসনের পূর্বে হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্ম বলে কিছু ছিলনা। সমাজ ছিল কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যেমন ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র ইত্যাদি। এসব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি, উপাস্য দেবতা, সামাজিক নিয়ম-কানুন ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। সমাজের সর্ব নিম্ন স্তরে অবস্থান করছিল শুদ্র-অন্তজ শ্রেণী। তারা ছিল অস্পৃশ্য শ্রেণী। ব্রাহ্মণ, শুদ্র-অন্তজ শ্রেণী একই সমাজভুক্ত ছিল না। ছিল ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ভুক্ত। সেন আমলে বাংলাদেশে এ ভাগ বিভক্তি আরো প্রকট আকার ধারন করে। ব্রাহ্মণ তথা আর্য শ্রেণীর সাথে অনার্য শ্রেণীর কোন সম্পর্ক ছিলনা। তাই সবাইকে নিয়ে এক ধর্মীয় জাতি গঠনের ছিল না কোন অবকাশ। কিন্তু মুসলিম শাসকগণ এ অসম্ভব কাজটিকে সহজ করে দেন। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের ভাষায় ঃ ".....বর্ণমূলক জাতি কিংবা স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তবায় ইত্যাদি ব্যবসায়মূলক জাতি ছিল কিন্তু হিন্দু জাতি ছিলনা। এই নাম মুসলমান বাদশাদেরই বদৌলত। হিন্দু জাতি যেমন ছিলনা, হিন্দু ধর্মও ছিলনা;

www.nagorikpathagar.org

ছিল শৈব, শক্তি, বৈষ্ণব, সৌর, গণপতি সম্প্রদায়।" [ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ১৯] পরিচয় ও শাসনের সুবিধা হবে মনে করে সমস্ত অবৌদ্ধ অমুসলিম সম্প্রদায়কে মুসলমান শাসকরা এক সাধারণ হিন্দু নামে আখ্যায়িত করেন। অথচ আজকে যারা হিন্দু বলে পরিচিত তাদের সবার ধর্ম এক ছিলনা। জাতিতেও তারা এক ছিল না।

বস্তুত বহিরাগত আর্য দ্বারা হাজার বছর ধরে নিগৃহীত হয়েছে অনার্যশ্রেণী তথা এদেশবাসী। অনার্যরা ছিল আর্যদের দ্বারা শোষিত-বঞ্চিত অদমিত। এ অবস্থায় তারা সবাই মিলে এক জাতি এক ধর্মভুক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মুসলমান শাসকদের রাজনৈতিক ভুলের কারণে ব্রাহ্মণ, শুদ্র, অন্তজ শ্রেণী মিলে এক হিন্দু জাতি গঠিত হয়ে গেল। এতে সংখ্যালঘু বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদেরই চরম রাজনৈতিক সুবিধা হয়েছে। হিন্দু নামের আড়ালে সবাই মিলে এক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। অথচ ব্রাহ্মণ শ্রেণী বর্তমানেও মোট হিন্দু জনসংখ্যার শত করা ছয় ভাগের বেশি নয়। তারা আজো সংখ্যালঘু। যদি সাধারণ হিন্দু জাতি বলে কোন জাতি গঠনের সুযোগ সৃষ্টি না করা হতো তাহলে আজ কথিত অনার্য তথা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মিলে গোটা ভারত উপমহাদেশে উগ্র বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য শাসনের অবসান ঘটাতে পারতো। এ ভুলের খেসারত মুসলমান ও সমস্ত অনার্য অমুসলমানদেরকে আজ দিতে হচ্ছে।

মুসলিম যুগ

বাংলাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারায় ইসলাম বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামের আগমন ও প্রচার-প্রসার এদেশের ধর্মীয়-সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনে সৃষ্টি করেছে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব। সেই বিপ্লবই পরবর্তীতে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েমের পথ সুগম করে। ইসলাম ছিল এদেশ বাসীর মুক্তি সনদ। বর্ণবাদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষন-জুলুম-নির্যাতন ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনতার মুক্তির লড়াইয়ে ইসলাম ছিল মূল প্রেরণা-ইসলাম প্রচারকগণ ছিলেন তাদের নেতা। ইসলাম প্রচারক সূফী-দরবেশ-আলেমগণের নেতৃত্বে এদেশে সৃষ্টি হয়েছিল এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ফলে নিপীড়িত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ও দলিত অবর্ণ হিন্দু জনতা দলে দলে আশ্রয় নিয়েছিল ইসলামের ছায়া তলে। বিকাশের পথ ধরে ইসলাম এদেশের সংস্কৃতি মূল ধারায় পরিণত হয়েছে। হাজার বছর পরেও এ ধারা অব্যাহত। আজ দেশের জাতি পরিচয়-ভাষা-সংস্কৃতি কোন কিছু থেকেই ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। ইসলাম আজ এদেশের সংস্কৃতির মূল উপাদান। হাজার বছরের বিবর্তন, বিকাশ ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে এদেশ বাসীর জীবনে ইসলাম স্থায়ী রূপ লাভ করেছে।

ইসলামের আগমন ও প্রসার

বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ইতিহাস হাজার বছরের। রাজা শশাংক ও মাৎসান্যায়ের সময়ে এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। তবে ইসলামের ব্যাপক

www.nagorikpathagar.org

প্রচার শুরু হয় পাল ও সেন আমলে। পাল আমলের শেষের দিকে ব্রাহ্মণ সামন্ত রাজাদের সাথে ও সেন শাসকদের সাথে ইসলাম প্রচারকদের প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয়। এবং স্থানে স্থানে তা গণঅভ্যুত্থান ও সশস্ত্র জিহাদে রূপ নেয়। দাওয়াত ও জিহাদের পথ ধরেই এদেশে ইসলামের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিত রচিত হয়। এবং রাজনৈতিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্টা

১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দী মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি তদানীন্তন বাংলার রাজধানী নদীয়া দখল করে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন। পরবর্তী একশো বছরের মধ্যেই প্রায় সমগ্র বাংলা মুসলিম শাসনের অধীনে চলে আসে। বিশেষ করে সিলেটের অত্যাচারী রাজা গৌর গোবিন্দের পরাজয়ের [১৩০৩ খৃঃ] মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মুসলিম শাসন সম্প্রসারনের পথে একটি বড় ধরনের বাধা দূর হয়। এসময়ে বাংলাদেশে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। সংহত মুসলিম সমাজ গড়ে উঠে। ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র ও গতি ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত হয়।

স্বাধীন সুলতানী আমল

স্বাধীন সুলতানী আমল [১৩৩৮-১৪৩৮] এদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এসময়ে এদেশের সমগ্র অঞ্চল বাংলাদেশ নামে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। নির্মিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীন জাতি সত্ত্বা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির আরো ব্যাপক প্রসার ঘটে। জনগণ ব্যাপক ভাবে ইসলামের দিকে এগিয়ে আসে।

তবে অগ্রগতির পাশাপাশি এসময়ে ইসলামের জন্যে দুটো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটে। প্রথমটি ছিল রাজা গনেশের অভ্যুত্থান [১৪১৫-১৪১৮]। আর দ্বিতীয়টি ছিল শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব [১৫০৬]। রাজা গনেশের অভুত্থানের মাধ্যমে বর্ণ হিন্দু শ্রেণী মুসলিম শাসন এবং ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মূলের প্রচেষ্টা চালায়। অবশ্য চার বছরের ব্যবধানে গনেশের মৃত্যুর সাথে সাথে এ বিপর্যয়ের অবসান ঘটে।

শ্রী চৈতন্য দেবের আন্দোলন

শ্রী চৈতন্যের আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দু পুনর্জাগরন আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিল অবর্ণ হিন্দু সমাজকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার আন্দোলন। শ্রী চৈতন্য ছিলেন প্রচণ্ড ইসলাম বিদ্বেষী। তার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বাংলার মাটি থেকে ইসলামকে উৎখাত করা। জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। রাজা গনেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রাহ্মণ্য রাজত্বকামীরা সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মুসলিম সুলতানদের উদারতার সুযোগে একদিকে কোশলে বড় বড় সরকারী পদগুলো লাভ করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে হিন্দু

www.nagorikpathagar.org

ভাবধারাপুষ্ট সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। বিশেষ করে সুলতান হোসেন শাহের উদারতা ও অপরিনামর্শীতার সুযোগ নিয়ে শ্রী চৈতন্য দেব মুসলিম বিদ্বেষী এক হিন্দুবাদী সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। একদিকে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি করে অন্যদিকে ইসলাম-বিদ্বেষ ছড়িয়ে শিষ্যদের মধ্যে তিনি প্রবল উন্মত্ততা সৃষ্টি করেন। এক কথায় চৈতন্য পরিচালিত আন্দোলন ছিল ইসলামের উৎখাতকামী ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসী। ডঃ রমেশ মজুমদার পর্যন্ত শ্রী চৈতন্যের ব্যাপারে তার উষ্ণ আবেগকে চেপে রাখতে পারেননি। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেন "তিন শত বছরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই-মন্দির ও দেব মূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।" [ডঃ রমেশ বন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ. পৃঃ ২৬১]। চৈতন্যের জীবনের মূল লক্ষ্য যে মুসলিম উৎখাত তা তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন এভাবে ঃ

"পাষণ্ডি সংহারিতে মোর, এই অবতার।
পাষণ্ডি সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।" *[চৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা, পৃঃ ১২০]*

শ্রী চৈতন্যের আন্দোলন প্রসঙ্গে আকরাম খাঁ লিখেছেন "প্রকৃত কথা এই যে, বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধ ধর্মকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে সমুলে উৎখাত করার পর তাঁহাদের নেক নজর পড়িয়াছিল মুসলমান সমাজের উপর। তাই যুগপৎভাবে তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন 'যবন রাজদিগকে' রাজনৈতিক কৌটিল্যের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে। পক্ষান্তরে ধর্মের নামে একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া মুসলমান সমাজকে আত্মবিস্মৃত ও সম্মোহিত করিয়া রাখিতে। ইহাই ছিল তৎকালের অবতার ও তাহার ভক্ত ও সহকারীদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।" [মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১০০-১০২]। এমনকি সে উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে হোসেন শাহের দু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী শ্রী চৈতন্যের শিষ্য সনাতন গোঁসাই ও রূপ গোঁসাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুলতান হোসেন শাহের বোধোদয় হয়। তিনি ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। সে প্রসঙ্গে আকরম খাঁ লিখেন ঃ "ছোলতান হোসেনের প্রাথমিক দোষ দুর্বলতা সুযোগ লইয়া গৌড় রাজ্যের সাধু-সন্ন্যাসীরূপী বৈষ্ণব জনতা বাংলাদেশ হইতে ইসলাম ধর্ম ও মোসলেম শাসনকে সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিবার জন্য যে গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ছোলতানের ও স্থানীয় মোছলেম নেতাদের যথাসময়ে সতর্ক হওয়ার ফলে তাহার অবসান ঘটিয়া যায়।" [মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১১০]। চৈতন্য বাংলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িক হিংসা ও ভেদনীতি এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার সুচনা করেন। বৃটিশ উপনিবেশিক যুগে তারই ব্যাপক প্রসার ঘটে। চৈতন্য সাম্প্রদায়িক

www.nagorikpathagar.org

উত্তেজনা সৃষ্টি ও প্রেমের নামে আদিরসের সঞ্চার করে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের একটি বড় অংশকে ইসলাম থেকে দুরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অবর্ণ হিন্দু জনতার ইসলাম গ্রহনের প্রবল জোয়ার রোধ করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মন্তব্য করেছেনঃ "শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব না হলে জাতি ভেদের জন্যই কিছু উঁচু বর্ণের হিন্দু ব্যতীত সকলেই মুসলমান হয়ে যেতো।" [কাজী আমিনুল ইসলাম উদ্ধৃতঃবাংলার রূপরেখা, কলিকাতা, পৃঃ ২৭]। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চৈতন্যের আন্দোলন গভীর প্রভাব বিস্তার করে। চৈতন্যের জীবন ও দর্শন নিয়ে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়। বৈষ্ণব চিন্তা ও ভাবধারা বাংলা ভাষাও সাহিত্যের সমগ্র অঙ্গনকে প্লাবিত করে। এক কথায় রাজনৈতিক দিক থেকে এ আন্দোলন মুসলমানদের তেমন ক্ষতি করতে না পারলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মোগল শাসন ও নবাবী আমল [১৫৭৬-১৭৫৭]

সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলাদেশ মোগলদের অধীনে আসে [১৫৭৬খৃঃ]। মোগলদের সময়ে নবাবদের দ্বারা বাংলাদেশ শাসিত হতো। শেষের দিকে মুর্শিদ কুলি খান থেকে শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত সবাই কার্যতঃ স্বাধীন ভাবে দেশ পরিচালনা করতেন। নবাবী আমলে বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ফার্সীর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব দৃঢ়মূল হয়। তবে মোগল সম্রাট আকবর সৃষ্ট নতুন ধর্ম "দীনি ইলাহীর" ফিৎনা ও বিপর্যয় ভারত বর্ষে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির জন্যে ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে। বিগত পাঁচশো বছর ধরে বাংলাদেশ সহ ভারত বর্ষে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটেছিল তা নস্যাৎ হয়ে যাবার আশংকা সৃষ্টি হয়। তবে অচিরেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। জৈনপুরের কাজী সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার ফতওয়া দেন। এ ফতওয়া বাংলার বারো ভুঁইয়াদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামকে যথেষ্ট শক্তি দান করে। অন্যদকে শায়খ আহমদ সেরহিন্দ মুজাদ্দেদে আলফে সানী [১৫৬৫-১৬২৪] আকবর-জাহাঙ্গীর সৃষ্ট ফিৎনার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এই ভয়াবহ ফিৎনা দূর হয়ে যায়। ইসলাম আবার নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়। বিশেষ করে সম্রাট আরঙ্গজেবের শাসনামলে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি গতিশীল ও বেগবান হয়ে উঠে। কিন্তু পরবর্তী শাসকদের নৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা এবং দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের কারনে বাংলায় [এবং পরবতীতে সমগ্র ভারত বর্ষে] নেমে আসে উপনিবেশিক শাসনের কালো যুগ। মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি আবার ভয়াবহ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়।

ইংরেজ উপনিবেশিক শাসন

উপনিবেশিক শাসনের ফলে এদেশে নেমে আসে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়। বর্ণহিন্দু ও ইংরেজ যোগ সাজসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতিকে মুসলিম সংস্কৃতি বিমুখ করে হিন্দু-সংস্কৃত মুখী করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেলার জন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতি-সমাজ ধবংস করার জন্যে রাষ্ট্র ভাষা পরিবর্তন, শরীয়া আইনের বিলুপ্তি, লা-খেরাজ সম্পত্তি বায়জাপ্ত করা হয়। আধুনিক শিক্ষার নামে পাশ্চাত্য মতবাদ ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। খৃষ্টান মিশনারীগণ ইসলাম সম্পর্কে আক্রমনাত্মক নীতি গ্রহন করে। মোট কথা সার্বিক দিক দিয়ে মুসলমানরা ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়।

প্রথম দিকে মুসলমানরা সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে উপনিবেশিক শাসনের অবসানের চেষ্টা চালায়। শুরু হয় সংস্কার ও পুনর্জাগরন আন্দোলন। উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম সমাজে হতাশা দেখা দিলেও বিশ শতকে এসে মুসলিম সমাজ আবার আত্মসম্বিত ফিরে পায়। হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে মুসলমানরা মাথা উচু করে দাড়ায়। শিক্ষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মুসলিম জাগরন দেখা দেয়। আজাদী আন্দোলন ও পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের উত্থান ঘটে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারার উজ্জীবন ঘটে। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনরূত্থানের স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাকিস্তান আমল

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ শতকেএকটি ইসলামী সমাজ-সংস্কৃতি বিনির্মাণের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্ত শাসক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা-ক্ষমতার লিপ্সা -বেইনসাফী-জুলুম-অত্যাচার-শোষন ইত্যাদি এবং বাম-সেক্যুলার গোষ্ঠি ও অখণ্ড ভারতপন্থীদের গভীর ষড়যন্ত্রের কারনে তা নস্যাৎ হযে যায়। জনগণ বিশেষ করে বাংলার মানুষ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শুরু হয় আন্দোলন। অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই কমিউনিষ্ট ও সেক্যুলার শক্তি এদেশ থেকে ইসলামী ভাবধারা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দেশের সচেতন জনতা তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। অবশ্য ষড়যন্ত্র এখনও অব্যাহত রয়েছে। এবং বর্তমানে তা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারন করেছে।

বর্তমানে দেশের সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিদের এক অংশ হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি বলার চেষ্টা করছেন। অন্য এক দল ইসলামকে পাশ কাটিয়ে প্রাক-ইসলামী সংস্কৃতিকে বাঙালী সংস্কৃতি বলার মতো দুঃসাহসও দেখাচেছন। কিন্তু তাদের এই তৎপরতা কোনক্রমেই এদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। বিভিন্ন ধর্মের বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির এখানে কোন অবকাশ নেই। অথবা ইসলামকে পাশ কাটিয়ে আবহমান বাঙলার নামে প্রাক-ইসলামী সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি আখ্যায়িত করারও কোন তাত্তিক বা বাস্তব ভিত্তি নেই। এদেশের বিগত হাজারো বছরের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল ধারা হচ্ছে ইসলাম। তাই এদেশের সংস্কৃতি

www.nagorikpathagar.org

অনিবার্যভাবেই ইসলাম ভিত্তিক হবে। এতে যাদের আপত্তি তারা এদেশের ইতিহাসের মূলধারাটি বুঝতে অক্ষম। এরা সাংস্কৃতিক পরগাছা, স্ব-সংস্কৃতির বিপক্ষ শক্তি। তবে এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি স্ব স্ব পরিমণ্ডলে অনুশীলন করবে, বিকাশদানের চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক-এতে আপত্তির বা অসহনশীল হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি অবশ্যই ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট হতে হবে। কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়াস জাতীয় সংস্কৃতিকে নস্যাত করার শামিল।একে রুখতে হবে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশে বর্তমানে প্রধানতঃ দুটো সাংস্কৃতিক ধারা রয়েছে। একটি ইসলামী ও মুসলিম ধারা। অপরটি সেক্যুলার-হিন্দুধারা। প্রথম ধারাটি হাজার বছর ধরে লালিত ও বিকশিত হয়ে আসছে। এটি বাঙালী জাতির মূল সাংস্কৃতিক ধারা। অপরটি বাঙালী জাতি-ভাষা-সংস্কৃতি নির্মূলকারী সেন-বর্মনদের কালোছায়া প্রভাবিত ধারা। একটি বায়জিদ বোস্তামী-বাবা আদম শহীদ-শাহমুখদুম-খান জাহান আলী-শাহ জালাল-নূর কুতবুল আলম-আলাউল-মুজাদ্দেদে আলফেসানী অনুসৃত ধারা। অপরটি রাজা শশাংক-বল্লাল সেন-পরশুরাম-বলরাম-গৌবিন্দ-আকবরের ধারা। একটি বিন বখতিয়ার-ইলিয়াস শাহ-জালাল উদ্দিন-হোসেন শাহ-ঈসা খাঁর ধারা। আর অপরটি লক্ষন সেন-গনেশ-শ্রী চৈতন্য-মানসিংহের ধারা। একটি হাজী শরিয়তুল্লাহ-দুদু মিয়া-তিতুমীরের ধারা। অপরটি বাল গঙ্গাধর তিলক-স্বামী বিবেকান্দ-অরবিন্দু ঘোষ- সূর্যসেন প্রমুখের ধারা। একটি সিরাজী-নজরুল-ফররুখের ধারা। অপরটি বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্র ধারা।

একটি তওহীদ-আল্লাহু আকবর-বিসমিল্লাহ-নামাজ-রোজা-ঈদ-কোরবানী-মহররম-শবে বরাত-শবে কদর-আজান-মসজিদ-দোয়া দরূদ-মুনাজাত-দাফন-কাফন-কবরস্থান-সালাম-খোদা হাফেজ আল্লাহ হাফেজ এর ধারা। অপরটি শির্ক-বেদাত-পৌত্তলিকতা-ইশ্বর-ভগবান-মঙ্গল প্রদীপ-শ্মশান-দাহ-শ্রাদ্ধ-দাড়িয়ে নিরবতা পালন-আদাব-নমস্কার-প্রণাম-সিঁদুর-শুভ রাত্রির ধারা।

প্রথম ধারাটি বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল ধারা আর দ্বিতীয় ধারাটি একটি গৌণ ধারা। প্রথম ধারাটি ইসলাম আশ্রিত ধারা আর অপর ধারাটি হিন্দু আশ্রিত পাশ্চাত্য প্রভাবিত ধারা। প্রথম ধারাটি বিগত হাজার বছরের ঐতিহ্য লালন করছে। আর দ্বিতীয় ধারাটি লালন করছে প্রাক-ইসলামী যুগের ঐতিহ্য। প্রথমটি বাংলাদেশের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতার অনুকুল আর দ্বিতীয়টি স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতার প্রতিকুল। প্রথম ধারাটি আদর্শবাদী কিন্তু সহনশীল ও উদার। দ্বিতীয় ধারাটি ইসলাম বিদ্বেষী-গণ বিমুখ-ভারতমুখী-পাশ্চাত্যমুখী। একটি জীবনাশ্রিত-সংযত-শালীন-ঐতিহ্যাশ্রিত ধারা। অপরটি জীবনবিমুখ-অসংযত-অশ্লীল-শিকড়হীন ধারা। বাংলাদেশের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষন-উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্যে প্রথম ধারাটির লালন, পুষ্টি ও বিকাশ প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা

আমাদের স্বাধীনতা অনেক সংগ্রামের ফসল। এ জাতি স্বাধীন থাকতে চায়, স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। স্বাধীনতা মানে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার অর্থ শুধু ভৌগলিক স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের স্বাধীন-বিকাশ ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুদৃঢ় হবে না। ভিত্তি তার থেকে যাবে দুর্বল, নড়বড়ে। জাতি বেঁচে থাকার জন্যে যেমন ভৌগোলিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন তেমনি এর বিকাশ ও পুষ্টির জন্যে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা জাতিকে তার স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর করে তোলে। প্রজ্জ্বল হয় তার স্বরূপ। সুনির্দিষ্ট হয় তার গতিপথ। গড়ে উঠে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস। বিকশিত হয় নিজস্ব জাতিসত্ত্বা। দ্বিধাদ্বন্দ্ব অসংগতি তার যায় কেটে। ঋজু হয়ে দাঁড়াতে পারে বিশ্বের দরবারে। নিজের পরিচয়ে প্রতিটি নাগরিক হয় উদ্ভাসিত। নিজের পরিচয়ে থাকে না কোন অস্পষ্টতা। জাতির লক্ষ্য থাকে সুস্পষ্ট, সুনির্ধারিত। বস্তুত, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা জাতির স্বাধীনতাকে প্রকৃত ও স্বকীয় রূপ দান করে। বর্তমানকে ঐতিহ্যিক রূপ দেয়। ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট ও নিশ্চিত করে। করে গতিশীল ও বেগবান।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অর্থ

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা একটি ব্যাপক প্রত্যয়। সুবিশাল তার পরিধি। চিন্তাচেতনা, জীবনবোধ, বিশ্বাস, মনন, ভাষা-সাহিত্য- সর্বত্র তা পরিব্যাপ্ত। জাতির আত্মপরিচয়, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবনবোধ, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি নিজস্ব জাতিবোধ, আদর্শ ও ঐতিহ্য চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে বলা চলে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। কোন 'বিজাতীয়' সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তাচেতনা, জীবনবোধ যখন জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সংস্কৃতির বাহনগুলো 'বিজাতীয়' আগ্রাসনমুক্ত থাকে তখনই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়। জাতির নিজস্ব ভাবধারা ও স্বাধীনতা যখন শিল্পে-সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়, স্বীয় জীবনধারায় যখন তার স্বাধীন প্রতিফলন ঘটে তখন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা মূর্ত হয়ে ওঠে। জাতির স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গনে প্রতিফলিত হওয়া ছাড়া সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয় না। জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতি যখন নিজস্ব অবয়ব নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠে, জাতির বিকাশ যখন স্বকীয়তার রাজপথ ধরে এগুয় সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা তখনই বাস্তব হয়ে উঠে। বস্তুতঃ বিজাতীয় সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের শক্তি ও অধিকারই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। জাতীয় স্বকীয়তা বিরোধী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের

www.nagorikpathagar.org

সামর্থ্য ও নিজস্ব ভাবধারা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নাম সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। আমার সংস্কৃতিতে আমার জাতির আদর্শ বলিষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠভাবে রূপায়ণের নাম সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। তাই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা একটি গতিশীল প্রত্যয়, স্বকীয়তার যুগপৎ ভাবকল্প ও রূপকল্প। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আমার অস্তিত্বের দৃপ্ত ঘোষণা-এ প্রকাশ ও ঘোষণা আমার সাহিত্যে-শিল্পে-ভাষায়, আচরণে, লোকাচারে, উৎসবে, পোশাক-আশাকে, মুল্যবোধে, জীবনবোধে। এর প্রকাশ ঘটবে জীবনধারনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক আচরণে। এক কথায় সর্বত্র যখন 'আমি' আমার স্বরূপ ও স্বকীয়তা নিয়ে উদ্ভাসিত হবো তখনই আমার সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করবে।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার উপাদান

একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে কতকগুলো অত্যন্ত মৌলিক।

সেগুলো হচ্ছেঃ

ক. স্বকীয় জাতিসত্ত্বার উপলব্ধি ও বিকাশ

খ. জাতীয় আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার ও তার রূপায়ন

গ. স্বকীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

ঘ. স্বকীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও লালন।

স্বকীয় জাতিসত্ত্বার উপলব্ধি ও বিকাশ

জাতিসত্ত্বার যথার্থ উপলব্ধি জাতিগঠন ও অগ্রগতির অপরিহার্য শর্ত। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত রচিত হয় জাতিসত্ত্বার উপর। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও জাতিসত্ত্বার পরিচিতি থেকে উৎসারিত। স্বাধীনতা মানেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ববোধ, সে অস্তিত্ববোধেরই অবাধ বিকাশের সুযোগ। আর জাতিসত্ত্বার উপলব্ধিই স্বতন্ত্র অস্তিত্ববোধের জন্ম দেয়। তাই জাতিসত্ত্বা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি।

জাতিসত্ত্বা হচ্ছে জাতির মৌল পরিচয় ও জাতির একাত্মতাবোধ। জাতীয়তাবোধ ও জাতি গঠনের মর্মমূলে নিহিত যে অনুভূতি, ভাবাদর্শ, ঐক্য-চেতনাবোধ, সংহতি, প্রেরণা ও চালিকাশক্তি তা সবই জাতিসত্ত্বা প্রত্যয়ের অন্তর্ভূক্ত। জাতিসত্ত্বা জাতি-পরিচিতির সার নির্যাস।

আমাদের জাতিসত্ত্বা

এদেশের মানুষ ভাষা বিচারে বাঙ্গালী। ভূগোল বিচারে বাংলাদেশী। ধর্মপরিচয়ে মুসলিম। বাঙ্গালী, বাংলাদেশী ও মুসলিম-এ তিনটি পরিচয়ের সমন্বিত রূপই আমাদের জাতিসত্ত্বার সঠিক পরিচয়। এ তিন পরিচয়ের মধ্যে বিরোধ আবিষ্কার অথবা এ তিনটির একটি আরেকটির বিপরীতে দাঁড় করানো আমাদের জাতিসত্ত্বার সঠিক পরিচয়কে নস্যাৎ করতে বাধ্য। জাতিসত্ত্বার পূর্ণ অবয়ব যুগপৎ উল্লেখিত তিনটি পরিচয় থেকেই পাওয়া সম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা আমাদের ভাষা। বাঙ্গালী আমাদের ভাষাগত পরিচয়। এদেশের সমস্ত মুসলমান জনগোষ্ঠীই বাঙ্গালী। এ পরিচয়কে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। না তত্ত্বে না বাস্তবে। ইসলামী তত্ত্বানুসারে ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি। ভাষা স্রষ্টার অন্যতম নিদর্শন। তাই ভাষা পরিচয়কে কোন মুসলমান অস্বীকার করতে পারে না।

তাছাড়া ঐতিহাসিকভাবে এদেশের মুসলমানরাই বাঙালীত্বের যথার্থ উত্তরাধিকার। কেননা বাংলা ভাষা সৃষ্টি পুষ্টি ও বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে মুসলমানদের বিশেষ সাধনা (দ্রষ্টব্য ঃ আহমদ শরীফ, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫, পৃঃ ১৪৭)। বাংলা ভাষার ঘোরতর দুর্দিনে মুসলমান শাসকরাই এগিয়ে এসেছিলো এর পৃষ্ঠপোষকতায়। আর তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সত্ত্বার আত্ম-বিকাশের সূচনা (দ্রষ্টব্য ঃ অধ্যাপক মুয়াযযম হোসেন খান, মুজিববাদ, বর্ণমালা প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৭১, পৃঃ ৪২)। বস্তুতঃ দেশের সাধারণ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাংলা বরং হিন্দুরাই এ ভাষা সহজে গ্রহণ করতে পারেনি (আহমদ শরীফ, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৯)। তাই বলা যায় বাংলা ভাষা ও বাঙালীত্বের মর্যাদা ও বিকাশ মুলতঃ মুসলমানদেরই অবদান। আবুল মনসুর আহমদের ভাষায়ঃ বাঙলাকে নিজস্ব জাতি, নাম, ভাষা ও সাহিত্য মুসলমানরাই উপহার দিয়েছিল। সে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যদিয়ে বাঙালীত্বকে নতুন মর্যাদা, তার ভাষায় নতুন সুর, তার গলায় নতুন জোর দিয়েছিলো মুসলমানরাই *(আবুল মনসুর আহম্মদ, বাংলাদেশের কালচার, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬, পৃঃ ২৫)।*

অতএব বাঙালী পরিচয়ের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হচ্ছে প্রধানতঃ এদেশের মুসলমানরাই। তাই বাঙালী সত্ত্বা আমাদের জাতি পরিচয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরাই লালন করে আসছি বিগত প্রায় আটশো বছর ধরে আমাদের বাঙালী পরিচয়। আমাদের এ বাঙালী পরিচয় আমাদের আদর্শিক পরিচয়ের বিপরীতে নয়। আমাদের মুসলিম পরিচয় আমাদের বাঙালী পরিচয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ সম্পর্ক নিবিড় অতি গভীর। এসম্পর্ক বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতেই হবে।

ভূগোল পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী। যে দেশ অঞ্চল নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ তার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এদেশের মুসলমানরাই। মুসলিম শাসন শুরুর আগে বাংলাদেশ বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিলো। মুসলমান শাসনামলেই বঙ্গ নামে বাঙলার বিভিন্ন জনপদকে একতাবদ্ধ করে তোলার কাজ সম্পাদিত হয়। পাঠান আমলে বঙ্গ নামেই বাঙলার সব জনপদগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। (দ্রষ্টব্য ঃ অজয় রায়, বাঙালা ও বাঙালী বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ঃ ১৯৭৭ পৃঃ ১-২)। সম্রাট আকবরের সময়ই বঙ্গদেশ সুবে বঙ্গলহ নামে পরিচিত হয়। অবশ্য ইংরেজ আমলে এসে (বিহার উড়ষ্যাসহ) ইহার বিশাল আয়তন খর্বকৃত হয়ে পড়ে। অতএব বাঙালা বলতে যা বুঝায় তার সৃষ্টির কৃতিত্ব মুসলমানদেরই প্রাপ্য।

(দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ এনামুল হক, মুসলিম বাঙালা সাহিত্য, পৃঃ ১-২)।

www.nagorikpathagar.org

১৯৪৭ সালে বৃটিশের হাত থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বাংলা বিভক্ত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়। অবশ্য মূল লাহোর প্রস্তাবে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। একটি সুগভীর ষড়যন্ত্রের ফলে সমস্ত বঙ্গ বা কমপক্ষে মুসলিম প্রধান সমস্ত বঙ্গ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি। তা যাই হোক বাংলাদেশ সাবেক পূর্বপাকিস্তানেরই বর্তমান রূপ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনও হয়েছে সে সীমানার ভিত্তিতেই। কাজেই আমরা সন্দেহাতীত ভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে ভূ-খন্ড হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান বিবর্তিত রূপের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সরাসরি সম্পর্কে রয়েছে। দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভিত্তি নিছক প্রাকৃতিক নয় বরং আদর্শিক ও রাজনৈতিক। একে অস্বীকার করা মানে সত্যকে অস্বীকার করা, ইতিহাসকে অস্বীকার করা। বস্তুতঃ মুসলিম চেতনাই এদেশের বিবর্তন ও বর্তমান রূপ পরিগ্রহের মর্মমূলে। অতএব আমাদের জাতি-সত্ত্বার বাংলাদেশী পরিচয় মুসলিম পরিচয় বাদ দিয়ে নয়। আমাদের বাংলাদেশীত্ব মুসলিম সত্ত্বার সাথে সম্পর্কযুক্ত-মুসলিম সত্ত্বারই ভৌগোলিক রূপ।

আমাদের জাতিসত্ত্বার আদর্শিক রূপ হচ্ছে মুসলিম সত্ত্বা। এদেশের জাতিসত্ত্বায় মুসলিম পরিচয়টি সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত। এদেশবাসীর ইতিহাস, সংস্কৃতি, মনন সর্বক্ষেত্রে এ পরিচয় গভীরে প্রোথিত। একাদশ শতক থেকে ধীরে ধীরে এদেশের জাতিসত্ত্বায় ইসলামী ভিতটি নির্মিত হয়েছে। এদেশে ইসলামের সূচনার পর থেকে কয়েক শতাব্দীব্যাপী আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে ইসলাম একটি স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। ইসলামের এ প্রভাব কোন চাপিয়ে দেয়ার বিষয় ছিলো না। বরং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততায় ইসলামের আত্মসচেতনতার নিকট পূর্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরাজয় ঘটে (দ্রষ্টব্য ঃ গোপাল হালদার, সাংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারাঃ ১৯৮৪, পৃঃ ১৯৪)। সৃষ্টি হয় এদেশের মনোরাজ্যে নব চেতনা, তাদের মানসজগত হয়ে উঠে বিপ্লবমূখী ও সৃজনশীল। (দ্রষ্টব্য ঃ আহম্মদ শরীফ, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০৬)। ফলে জন্ম হয় পূর্ববতন ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবাদী সমাজ থেকে পৃথক এক সমাজ ব্যবস্থার-নতুন এক সমাজের। এরই নাম মুসলিম সমাজ। সময়ের বিবর্তনে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহে নতুন সৃষ্ট মুসলিম সমাজটি মুসলিম জাতিতে পরিণত হয়। সৃষ্টি হয় তার রাজনৈতিক রূপ। গড়ে উঠে তার পৃথক জাতি পরিচয়। মুসলিম জাতি পরিচয় এদেশের জাতিসত্ত্বার মর্মমূলে। এদেশের জাতিসত্ত্বা থেকে এ পরিচয়কে মুছে ফেলার কোন সুযোগ নেই। একে গৌণ বিবেচনারও কোন অবকাশ নেই।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের জাতির অস্তিত্বই নির্ভর করে আমাদের মুসলিম পরিচয়ের উপর। আমাদের মুসলিম পরিচয় বাদ দিয়ে যা থাকে তা আমাদের আদর্শ, ইতিহাস, ঐতিহ্যের বিপরীত আমাদের অস্তিত্বের অস্বীকৃতি। তাই আমাদের জাতিসত্ত্বার মুখ্য দিক মুসলিম পরিচয়।

মোটকথা, আমাদের জাতিসত্ত্বার পূর্ণ পরিচয় বাঙালী, বাংলাদেশী ও মুসলিম পরিচয়ে মূর্ত হয়ে উঠে। তিনটি পরিচয়ের সমন্বিতরূপই আমাদের পূর্ণ জাতিসত্ত্বা। কোন একটি বাদ দিলে আমাদের জাতি পরিচয় হবে বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ।

আবার এ তিন পরিচয় একই সূত্রে গাঁথা। ইসলামী ভাবাদর্শের ভিত্তিতে এ তিনটি পরিচয় যুগপৎ বিবর্তিত হয়েছে। কাজেই এদেশবাসীর বাঙালী বা বাংলাদেশী পরিচয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাদর্শের কোন সুযোগ নেই। এদেশবাসীর বাঙালী বা বাংলাদেশী পরিচয়কে মুসলিম পরিচয় থেকে পৃথক করা যাবে না। যারা পৃথক করতে চান তারা আমাদের জাতিসত্ত্বার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

বস্তুতঃ আমাদের বাঙালীত্ব, বাংলাদেশীত্ব, আমাদের মুসলমানিত্ব একই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দেহে লীন।

তাই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অনিবার্য দাবি হচ্ছে আমাদের জাতিসত্ত্বার সঠিক রূপটিকে উপলব্ধি করা, এর বিকাশ ও পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা করা। আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীন অস্তিত্বই নির্ভর করে আমাদের সংস্কৃতিতে-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমাদের বাঙালীত্ব বাংলাদেশীত্ব ও মুসলিম পরিচয়ের ধারা প্রতিফলনের উপর। আমাদের পূর্ণ জাতিসত্ত্বার রূপায়ণ ছাড়া আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হবে অস্পষ্ট, ধোয়াটে। জাতিসত্ত্বার খণ্ডিত রূপ নিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে না। হবে না বিকশিত। যদি আমরা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ চাই, চাই গড়ে তুলতে স্বাধীন সাংস্কৃতিক জগত, নির্মাণ করতে চাই স্বাধীন সাংস্কৃতিক রাজপথ তাহলে জাতিসত্ত্বার পূর্ণ এ সমন্বিত রূপটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আত্মস্থ করতে হবে, তার রূপায়ণে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রশস্ত রাজপথটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের জাতি হবে ঋজু, দ্রুত ও সম্মুখাভীমুখী। আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হবে অর্থবহ, বিকশিত।

জাতীয় আদর্শ

একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের উন্মেষ, উজ্জীবন, বিকাশ নির্ভর করে জাতীয় আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারের উপর। জাতীয় আদর্শ যদি হয় সুনির্ধারিত, সার্বজনীনভাবে অনুসৃত তাহলে সে জাতির সাংস্কৃতিক জীবন পুষ্ট ও গতিশীল হতে বাধ্য। জাতীয় আদর্শের অনুভূতি, উপলব্ধি ও অনুসরণ ছাড়া জাতির গতিপথও

www.nagorikpathagar.org

সুনির্দিষ্ট হতে পারে না। লক্ষ্যহীনতা সে জাতির জীবনকে আড়ষ্ঠ করে রাখে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বিশ্লিষ্টতা, বিক্ষিপ্ততা, অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও গোঁজামিল সে জাতির ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবনে নেমে আসে এক ভয়াবহ নৈরাজ্য, সংঘাত। বিকাশ হয় বারবার লক্ষ্যচ্যুত।

জাতীয় আদর্শের পথ ধরে জাতি এগোয়। জাতীয় আদর্শ জাতির দিগদর্শন, চালিকাশক্তি। জাতির জীবন জাতির আদর্শের ছাঁচেই গড়ে উঠে। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনও জাতীয় আদর্শেরই প্রতিফলন, মূর্তরূপ।

আদর্শ ও সংস্কৃতি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সব কিছুর সাথে জাতীয় আদর্শের সম্পর্কটি অত্যন্ত গভীর। জাতীয় আদর্শকে উপেক্ষা ও পাশ কাটিয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তাই করা যায় না। যেখানে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন, স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন, বিকাশের প্রশ্ন সেখানে জাতীয় আদর্শের কথাটি আসবেই। বিজাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে কোন জাতির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না। স্বকীয় আদর্শ পরিহার করে স্বকীয় সংস্কৃতি অসম্ভব।

মূলতঃ জাতীয় আদর্শের অনুসরণই জাতির সংস্কৃতি। তাই জাতীয় আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে জাতির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও উৎসারিত হবে সে উৎস থেকেই।

বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ কি? বাংলাদেশের হাজার বছরের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক ধারা তার মূল নির্ধারক। বাংলাদেশের মানুষের আদর্শিক পরিচিতি- তার মন-মননে, চিন্তা-চেতনায় যে বোধ অনুরণিত সেটাই হবে তার আদর্শের মূর্তরূপ। জাতির পরিচয় ও তার আশা-আকাঙ্খা যে আদর্শ ঘিরে আবর্তিত হয় তাই তার জাতীয় আদর্শ। জাতির আবেগ, সেন্টিমেন্ট, তার স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি যে আদর্শবোধ দ্বারা পরিচালিত তাই তার জাতীয় আদর্শের ভিত্তি।

আদর্শিক বিচারে এদেশের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষের জীবন যে ইসলাম নির্ভর তা সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ অঞ্চলে ধর্মীয় পরিবর্তন-বিবর্তন ও বিপ্লব ঘটেছে কয়েকবার। কিন্তু এদেশে ইসলামের সূচনার পর থেকে কয়েক শতাব্দীব্যাপী আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কার্যকারণে জনগণের জীবনে ইসলাম এক স্থায়ীরূপ লাভ করেছে।

ফলে সৃষ্টি হয়েছে ইসলাম ভিত্তিক ধর্মমুখী সমষ্টিগত ব্যবস্থা। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততায় ইসলামের আত্মসচেতনতার নিকট পূর্ব জীবন ও সংস্কৃতির পরাজয় ঘটে। *(দ্রষ্টব্য ঃ গোপাল হালদার; সংস্কৃতির রূপান্তর. পৃঃ ১৯৪)*।

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি হয় দেশের মনোরাজ্যে নব চেতনা, তাদের মনোজগত হয়ে উঠে বিপ্লবমুখী ও সৃজনশীল (আহমদ শরীফ, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য খ্রীঃ ১০৬)। আর এ সূত্র ধরেই এদেশবাসীর কাছে ইসলাম স্থায়ী আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে। জনগণ যুগে যুগে সে আদর্শের ভিত্তিতে তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার রূপায়ণ চেয়েছে। ইসলাম বরাবরই এদেশের জনগণের চালিকাশক্তি। তার মন-মগজে ইসলামের ছাপ স্থায়ী ও দৃঢ় মূল।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমনে যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিপ্লব সংগঠিত হয় তাতে অপদমিত ও অধিকার বঞ্চিত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বিপুলভাবে ও সহজেই ইসলাম গ্রহণ করে। (দ্রষ্টব্যঃ গোপাল হালদার সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২১৫)। আর সে বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য ব্রাহ্মণবাদী শক্তি ও ক্ষমতাসীনরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস পায়।

ইসলামের সুচনালগ্নে এদেশে যে সমস্ত যুদ্ধ-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে তার প্রধান আদর্শিক ভিত্তি ছিলো তওহীদ ও শির্ক। তা ছিলো ন্যায় ও অন্যায়ের লড়াই। মজলুম মানুষ তওহীদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে লড়াই করেছে শির্ক ভিত্তিক বর্ণ বৈষম্যের ধারক ও বাহকদের সাথে। শাহ সুলতান বলখী মাহিসোয়ার ও রাজা পরশু রাম বলরামের সংঘাত-সংঘর্ষ, বাবা আদম শহীদ ও রাজা বল্লাল সেনের (১১৫৮-১১৭৯) যুদ্ধ, রাজা গৌর গোবিন্দের সাথে হযরত শাহজালালের যুদ্ধ (১৩০৩ খ্রীঃ), শাহ নুর কতবুল আলম ও রাজা গনেশের (১০১৯) সংঘাত ইত্যাদি স্পষ্টতই ছিলো আদর্শের লড়াই। একদিকে মুসলিম সুফী সাধকদের নেতৃত্বে সমাজের নিগৃহীত শোষিত বঞ্চিত মানুষ অন্যদিকে শের্কবাদী-ব্রাহ্মণবাদী-বর্ণবাদী ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। এ সব লড়াই সংঘাতের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলামী আদর্শ স্থায়ী অবস্থান করে নিয়েছে।

বৃটিশ উপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশে বৃটিশ শাসন ও তদানীন্তন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ও আন্দোলন হয়েছে তা সবই ছিলো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে। মজনু শাহের ফকীর বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন ও শাহাদত, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়ার ফারায়েজী আন্দোলনসহ যাবতীয় সংগ্রাম ও বিদ্রোহ ছিলো ইসলামী চেতনা সঞ্জাত।

পাকিস্তান আন্দোলনের গোটা বিষয়টিই তো ইসলামী ভাবধারা ও আদর্শকে উজ্জীবিত ও সমুন্নত করার প্রয়াস ও আকুতি থেকে সৃষ্ট। বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমিও এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। ভাষা আন্দোলন প্রথম শুরু হয়েছিলো ইসলামী চেতনা ও ইসলামের সেবকদের দ্বারাই। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামকে কোন কোন মহল ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দেয়ার প্রয়াস পেলেও জনগণ কোন দিন এসব আন্দোলনকে ধর্মনিরপেক্ষ ও

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেনি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারক আওয়ামী লীগও এ সত্যটি ভালো করেই জানতো এবং তাদেরকে প্রকারান্তরে নীতিগতভাবে তা স্বীকার করে নিতে হয়েছিলো। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর তাদের সংবিধান কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় তদানীন্তন পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদন), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, সংযোজন-১, পৃঃ ৭৯৩) সে খসড়া সংবিধানেরই রাষ্ট্রীয় পলিসীর নীতি-নির্ধারক মূলনীতিতে (১) কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস করা হবে না, (২) কুরআন ও ইসলামিয়াত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং (৩) মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতা উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে এসব কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছিলো। (দ্রষ্টব্য ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯৪)। তাছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায়ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি (দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোক্ত, তৃতীয় খণ্ড, স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, পৃঃ ৪)। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যও লক্ষ্য হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি (দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯৭১)। কাজেই বুঝা যায় রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ঘোষণা পরবর্তী সময়ের কোন চাপের ফল। এসবের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও এদেশের মানুষের কোন সম্পর্ক ছিলো না। এছাড়াও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত ১৯৭২-এর রাষ্ট্রীয় সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরকারী কর্মকর্তারা নানাভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করেন। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি বলে প্রচারণা চালানো হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা ও যোগদানের মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়াস চলে যে দেশের শাসকগণ ইসলাম বিমুখ নন। ৭৫-এর পটপরিবর্তনের পরে সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা সংযোজন এবং আরো পরবর্তীতে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা সব কিছুই প্রমাণ করে যে এখানে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হলে ইসলামের কথা বলতে হবে। ইসলাম বিরোধী প্রমাণ হলে এখানে জনগণের আস্থা আর্জন করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

মূলকথা, জাতীয় আদর্শ হিসেবে ইসলামই যে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য, এর বিপরীত কোন আদর্শ গ্রহণযোগ্য নয় তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের দীর্ঘপরিক্রমায় তাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এখন জাতীয় আদর্শের প্রতি আমাদেরকে আন্তরিক ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, শিল্প-সাহিত্যে, সমাজে সর্বত্র ইসলামের আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক। জাতীয় আদর্শের অস্পষ্ট বা মানসিক উপলব্ধি থাকাই যথেষ্ট নয় বরং তার রূপায়ণ ও অনুসরণ প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা চাইবো অথচ সংস্কৃতিতে জাতীয় আদর্শের রূপায়ণ চাইবো না এটা হয় না। অথবা জাতীয় আদর্শের অনুসরণ পরিহার করে স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব এটা মনে করলেও চলবে না। আমাদের সংস্কৃতি মানেই আমাদের আদর্শের, জাতীয় ভাবাদর্শের মূর্ত প্রকাশ। তাই প্রতিটি সংস্কৃতিসেবিকে এ সত্যটি মনে রাখতে হবে। আদর্শই আমাদের রক্ষাকবচ। সেটি সমাজে রাষ্ট্রে সংস্কৃতিতে সর্বত্র। জাতীয় আদর্শের বিকাশই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার গ্যারান্টি, অন্যকিছু নয়।

ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য এবং সে ধারায় এর বিকাশ। ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ছাড়া একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কোনক্রমেই নিশ্চিত হতে পারে না। ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে অধিকতর স্পষ্টভাবে। ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির গতিশীলতা ও ব্যাপকতা আনে। সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলে। তাই ভাষা ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রধান বাহন।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, সাহিত্যের ভাষা। সপ্তম শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ তেরশো বছরের নানা চড়াই-উৎড়াই পাড় হয়ে বাংলা ভাষা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। আমরা যাকে বর্তমানে বাংলা ভাষা বলি আঠারো শতকের পূর্বে এর বিশেষ কোন নাম ছিলো না। সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা দুটি ভাষার নাম জানতেন একটি সংস্কৃত-শাস্ত্রের ও পাণ্ডিত্যের ভাষা। অন্যটি মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা। মাতৃভাষাটিকে তখন আখ্যায়িত করা হতো দেশী লৌকিক প্রাকৃত বলে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পণ্ডিতগণ একে গৌড়িয় ভাষা বলতেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই মূলতঃ বাংলা ভাষা কথাটি চালু হয়েছে।

বাংলা ভাষা হিন্দু-ইউরোপীয় মূল ভাষার ভারতীয় আর্য প্রশাখা হতে ক্রমশঃ বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে বর্তমান রূপলাভ করেছে। গৌড় প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃতের সাথে এর সরাসরি সম্পর্ক নেই।

www.nagorikpathagar.org

(দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৮১, পৃঃ ২৭) তাই ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডির বাইরেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ। বাংলা ভাষাকে কাল অনুসারে চারটি যুগে ভাগ করা যায়-প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ), সন্ধি যুগ (১২০০-১৩৫০ খ্রীঃ), মধ্যযুগ (১৩৫০-১৮০০) ও নব্যযুগ (১৮০০-বর্তমান সময় পর্যন্ত) (দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঐ, পৃঃ ৪)।

৬৫০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৎসেন্দ নাথ পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়া মত প্রচার করেন। তিনিই বাংলা ভাষায় আদি লেখক বলে পরিচিত। এরপর বৌদ্ধ পাল রাজাগণের সময়ে (৮ম-১২ শতক) প্রাচীন বাংলার বিকাশ ঘটতে থাকে। কিন্তু হিন্দু সেন রাজাগণের আমলে (১২ শতক) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি ব্যাহত হয়ে গেলো। কারণ তারা বাংলার বদলে সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্টপোষক ছিলেন। (দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৪-১৫)। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা বা আর্য ধর্মের (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম) ভাষাই শিক্ষিত মহলে চর্চা হতো। আর্য শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকরা বাংলার ব্যাপারে এতোটা বিরূপ ছিলো যে,তারা বাংলা ভাষাকে মানুষের ভাষা না বলে পাখির ভাষা বলে আখ্যায়িত করতো। এমনকি বাংলা ভাষা তাদের মতে অনার্য বলে এ ভাষায় ধর্ম বাক্য উচ্চারণকারীকে রৌরব নামক নরকের হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৭৩-৭৪)। তাই সে সময় দেশীয় ভাষা তথা বাংলা চর্চার কোন পরিবেশ ছিলো না। প্রসঙ্গত এখানে মনে রাখা দরকার যে, বাংলা ভাষা বিকাশের পথে বাঁধা সৃষ্টি করেছে শুধু ব্রাহ্মণ সমাজই, হিন্দু সমাজের অন্য সম্প্রদায়গুলো নয়। আর বস্তুতঃ মুসলমান রাজত্বের পূর্বে 'হিন্দু' এ সাধারণ জাতীয় কোন নামই ছিলো না। ছিলো ব্রাহ্মণ, শুদ্র ইত্যাদি।...কিন্তু হিন্দু জাতি বলে কোন জাতি ছিলো না। ব্রাহ্মণ, শুদ্র ইত্যাদি ছিলো পৃথক পৃথক জাতি, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়। কিন্তু মুসলমান শাসকদের কল্যাণেই ব্রাহ্মণ শুদ্র ইত্যাদি মিলে একই হিন্দু জাতি নামকরণ হয়।

(দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯)।

বাংলা ভাষার যখন ঘোর দুর্দিন সে সময়েই ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া অধিকার করেন। এর মাধ্যমেই বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত (১২০৪ খ্রীঃ)। ১২০৪ খ্রীঃ থেকে ১৩৫২ খ্রীঃ ইলিয়াস শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা ভাষার সন্ধিযুগ। তারপর শুরু হয় মধ্যযুগ। এ সময় বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিলো ইলিয়াস শাহী সুলতানদের (১৩৫২-১৪১৪, ১৪৪২-১৪৮৪ খ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষকতায়। হুসাইনশাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)বাংলার চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তবে সে বাংলায় তখনও সংস্কৃতের প্রাধান্য থেকে যায়। ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবও

www.nagorikpathagar.org

তেমন একটা সৃষ্টিহয়নি। সে সময় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ের ব্যর্থ প্রয়াস চলে। অবশ্য পাঠান যুগে মুসলমান সমাজে আরবী, ফারসী ও বাংলা চর্চা ছিলো। হিন্দু সমাজে ছিলো সাধারণতঃ সংস্কৃত, বাংলা এবং কিছু কিছু ফারসী, মৈথিলী ও হিন্দীর চর্চা।

(দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঐ, পৃঃ ১৩৮)

বাংলা ভাষায় উর্দু, হিন্দী ও ফারসীর প্রভাব বাড়তে থাকে মূলতঃ মোগল আমল থেকে (১৫৭৬ খ্রীঃ) রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রভাবে (১৬৭৫-১৭৫৭) এবং ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ারও কিছু কাল পর্যন্ত (১৭৫৭-১৮০০) বাংলা সাহিত্যে ফার্সী ও উর্দুর প্রভাব দ্রুত বেড়ে যায়। বাংলা ভাষায় ইসলামের বাণী প্রচার বা লিখা সঙ্গত হবে কিনা এ নিয়ে মুসলমান কবি-সাহিত্যেকদের মধ্যে নানা কারণে প্রাথমিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তারা বাংলা ভাষা চর্চার মাধ্যমেই ইসলামের রূপ তুলে ধরার প্রয়াস চালান। এভাবেই সৃষ্টি হয় দোভাষী বাংলা, গড়ে উঠে পুঁথি সাহিত্য। ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাহিত্য কর্মের মাধ্যমেই বিকশিত হয় বাংলা ভাষা। হিন্দু লেখকগণের রচনাও এ দো-ভাষী বাংলার প্রভাব মুক্ত ছিলো না। যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটতো তাহলে এ পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের পুস্তকের ভাষা হতো।

(ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঐ, পৃঃ ২৭১)।

১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। সূত্রপাত ঘটে নতুন আরেক ধারার। শুরু হয় ভিন্ন ধরনের বাংলা চর্চা। তবে তা জনগণের বাংলা নয়-সংস্কৃত ভাষারই কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। ফলে বাংলা ভাষা ফারসীর দিক থেকে সংস্কৃতের দিকে মোড় নিলো (দ্রষ্টব্য ঃ ঐঃ ১৮)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারা যে সহজ স্বাভাবিক গতিপথ ধরে চলছিলো পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সে গতিপথকে কৃত্রিম উপায়ে সংস্কৃতানুসারী করার প্রয়াস পান। এই বিদ্যাসাগরী বাংলার সাথে বাংলার জনগণের কোন সম্পর্ক ছিলো না। যার ফলে মুসলিম ও গণচেতনা নির্ভর সমাজচিত্র ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাংলার সাথে বিদ্যাসাগরী বাংলার তীব্র পার্থক্য সৃষ্টি হলো। কিন্তু 'পলাশীর বিপর্যয়ে দিশেহারা মেরুদণ্ড ভাঙ্গা মুসলমানদের তখন প্রতিবাদ করারও শক্তি ছিলো না। তাদের সাহিত্য চর্চার খেয়ালও একরূপ লোপ পেয়েছিলো। ফলে সেই থেকে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অমুসলমানদেরই একচেটিয়া উঠেছিলো।' (দ্রষ্টব্য ঃ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, পৃঃ ১২০)। কাজেই অমুসলমান সাহিত্যিকদের সাধনায় বাংলা সাহিত্য যে রূপ গ্রহণ করলো মুসলমানদের ভাবধারা ও জীবনধারার সাথে তার কোন সংশ্রব ছিলো না।

www.nagorikpathagar.org

অনেকদিন পর যখন মুসলমানরা আবার সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করলো তখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে ছিলো যে, কিছুদিন পর্যন্ত হিন্দু সাহিত্যেকদের অনুকরণ অনুসরণ বিশেষ করে ভাষা রীতির ক্ষেত্রে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চললো। তারপর ধীরে ধীরে মুসলমানদের জাগরণ আসে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবার মুসলিম ভাবধারা সঞ্চার হতে শুরু করে। সংস্কৃত বহুল বাংলা পরিহার করে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ সমাজে বহুল ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করতে থাকেন। এ ছিলো আত্মচেতনার ফল। এর ফলাফল হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী। 'জাগরণ ও সচেতনতার যে পথ ও কলরোল এতে দেখা ও শোনা গেছে তা এমন একটি আন্দোলন-সৃষ্টি করেছিলো যার ফলে স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে পড়ে।' (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি (প্রবন্ধ), পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, ঐ, পৃঃ ৬৯)।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তান আন্দোলনের মূলশক্তি বাংলার মুসলমানদের ভাষা বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। এর প্রতিরোধেও প্রথমেই রুখে দাঁড়ালো ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ লেখক-কবি-সাহিত্যিক ও তরুণ সম্প্রদায়। বাংলা বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা দিলো নতুন বিপর্যয়। স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হলো প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়ার পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদী লেখকগণ এদেশীয় বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করে আবার সংস্কৃত বহুল বাংলা চালূ করার প্রয়াস পেলো। এর প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপন্থা পরিহার করে আরবী-ফার্সী বহুল বাংলা চালুরও প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। অথচ বাংলাদেশের ভাষা হবে দেশেরই মানুষের মুখের ভাষা। এদেশের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমান সমাজচিত্রের রূপায়ণ। এভাবেই ফুটে উঠবে বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য।

আমাদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে কোলকাতা কেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্য আর ঢাকা কেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্য হুবহু এক নয়, এক হতে পারে না। বাংলা ভাষার প্রধান অঞ্চল বাংলাদেশ। বাংলার মূল উত্তরাধিকার বাংলাদেশের মুসলমানগণ। তাই ঢাকা শুধু বাংলাদেশেরই রাজধানী নয়, ঢাকা হবে বাংলা ভাষারও রাজধানী। তাহলেই নিশ্চিত হবে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের সমাজের আশা-আকাঙ্খার অবশ্যই রূপায়ণ হতে হবে। সাহিত্য শিল্পে আমাদের জীবন ও সমাজ অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটা আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নস্যাৎ করার প্রয়াস। ভুলে গেলে চলবে না বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল হলেও এরা দুটো পৃথক কালচারাল ইউনিট-একটি নয়। দুটি এলাকা দুটি পৃথক

www.nagorikpathagar.org

ভাবধারার ধারক-আদর্শগত, সংস্কৃতি, ভূগোল এবং রাজনৈতিক সব দিয়ে। যারা এর বিপরীত চিন্তা করেন তারা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ষড়যন্ত্রের শিকার। স্বকীয়তা হারিয়ে যারা সেবাদাস মনোবৃত্তি অর্জন করেনি, আধিপত্যবাদের গোলামী যাদের পেয়ে বসেনি তাদেরকে সেই স্বতন্ত্র ধারায় নব সৃজনশীলতায় এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, উভয় অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে নিস্প্রয়োজন বিরোধ সৃষ্টি করতে হবে। যা বাস্তব, যা সত্য, যা ঐতিহ্যের দাবি, যা ঐতিহাসিক তারই অনুসরণ করতে হবে। আর তাহলেই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হবে নিশ্চিত, বিকাশমান ও সৃজনশীল।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অন্যতম উপাদান হচ্ছে জাতির স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা। এ চেতনাবোধ যত প্রখর হবে ততই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আত্মপরিচয় হয়ে উঠবে বলিষ্ঠ। ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে এড়িয়ে সাংস্কৃতিক জীবন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। তাই এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। সচেতনতার তীব্রতা এক্ষেত্রে কাম্য।

সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীন অস্তিত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে জনগোষ্ঠীর ইতিহাস চেতনা, ঐতিহ্যবোধ, জয়-পরাজয়ের অনুভূতি, গৌরব ও বেদনার ঘটনাবলী, জাতীয় বীর এবং তাদের সাথে সহমর্মীতা, ঐতিহাসিক প্রেরণার উৎস ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং ইতিহাসের মুল্যায়নের দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি। এসব দিক দিয়ে বাংলার মুসলমানরা যে একটি পৃথক স্বতন্ত্র্য ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ধারক তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিক বিশ্লেষণ করলে তা অত্যন্ত স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হবে।

১। বাংলায় ইসলামের আগমন ছিলো বিপ্লবাত্মক। তদানীন্তন সমাজের অবদমিত নিগৃহীন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ইসলামকে মুক্তির উপায় বলে গ্রহণ করে। আর ব্রাহ্মণবাদী শাসকগোষ্ঠী তা প্রতিরোধের চেষ্টা চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলামের আত্মসচেতনতার কাছে তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরাজয় ঘটে। কিন্তু এ পরাজয় আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মানতে পারেনি। তাই তারা অস্বীকার করতে চেয়েছে, পরাজয়কে ঢাকতে চেয়েছে। এ মনোভাবটি স্পষ্ট হবে একটি উদ্বৃতি থেকে যে, 'সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খিলজী বাংলা জয় করেছিলো, এ কথা যে বাঙালীতে বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।' (মাসিক বঙ্গদর্শন, (সম্পাদক) বঙ্কিম চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ বাং, পৃঃ ৩৮৭)। বস্তুতঃ বখতিয়ার ও লক্ষণ সেন দুটো ভিন্ন ভিন্ন চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। ইতিহাসের যে অধ্যায় মুসলমানদের নিকট

www.nagorikpathagar.org

গৌরববোজ্জল হিন্দুরা সেটাকেই তাদের জাতীয় কলঙ্ক বলে মনে করে। ইতিহাসের যে অংশ নিয়ে হিন্দুরা গর্ব অনুভব করে মুসলমানরা তাতে গর্ব অনুভব করার কিছুই পায় না। ইতিহাসে যারা মুসলমানদের নিকট বীর ও আদর্শ শাসক বলে সম্মানিত হিন্দুরা তাদেরকেই অত্যাচারী নিষ্ঠুর গোঁড়া বলে মনে করে থাকে। বাংলার মুসলিম শাসন বিশেষ করে প্রথম তিনশো বছরের শাসনের মূল্যায়ণে হিন্দু-মুসলিম দৃষ্টিকোণ এক নয়। মুসলমানদের জাতীয় বীর ও আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর জাতীয় বীর ও ব্যক্তিত্ব এক নয়। শাহজালাল, শাহ মখদুম, শাহ আমানত, খান জাহান আলী, নূর কুতুবুল আলম, বখতিয়ার প্রমুখ মুসমানদের গৌরবোজ্জল ব্যক্তিত্ব। হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদেরকে আপন করে নিতে পারেনি-পারবে না।

বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের অপরাপর ইতিহাসের সাথে আমাদের সংযোগ-সম্পর্ক-সম্পর্ক-চেতনাবোধ সবই স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। মুহাম্মদ বিন কাশেম, খাজা মাইনউদ্দীন, নিজামুদ্দিন আওলিয়া, মুজাদ্দেদে আলফেসানী, সম্রাট আওরঙ্গজেব, শাহ উয়ালিউল্লাহ, শাহ আবদুল আজীজ, সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ও তাদের আন্দোলনের সাথে আমাদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। এরা আমাদের গৌরব। এদের সাথে আমাদের একাত্মতা আদর্শিক, আত্মিক, মানসিক। অন্যদিকে অপর জনগোষ্ঠীর গৌরব চৈতন্যদেব, শিবাজী প্রমুখ। তারা শিবাজী চরিত্রে খুঁজে পান তাদের নিজস্ব গৌরব গাঁথা-এক ধর্ম রাজ্যের স্বপ্ন।

(দেখুনঃ কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'শিবাজী উৎসব ও বন্দীবীর)।

উপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমানদের সংগ্রাম নেতৃত্ব স্পষ্ট স্বতন্ত্র ধারা পরিচায়ক। মজনু শাহের ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আন্দোলন ও শাহাদত, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন ইত্যাদির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক আদর্শিক, আত্মিক-ঐতিহাসিক। অপরদিকে বঙ্কিম চন্দ্র, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিবেকানন্দ, শ্রী রাম কৃষ্ণ স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বা ও ইতিহাস ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক।

এভাবে যদি আমরা এদেশের হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দুটো স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারা ও চেতনাই দেখতে পাবো। সাধারণ চেতনাবোধের যে সব উদাহরণ আছে তা হচ্ছে তাৎক্ষণিক, বিশেষ পরিস্থিতিজাত ও সাময়িক, কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের চাপের ফল। স্বাভাবিক অবস্থায় স্বতন্ত্র চেতনা ও ধারা প্রবহমান। তাই আজকে আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে অর্থবহ ও বলিষ্ঠ করতে হলে স্বকীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনাকে লালন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুতঃ উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে আমাদের স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বা, জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বলিষ্ঠভাবে লালন করতে হবে। আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও জাতীয় জীবনে এসব উপাদানগুলোর রূপায়ণ ঘটাতে হবে। এসবের সৃজনশীল বিকাশে যত্নবান হতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপাদানগুলোর পরিচর্যা ও বিকাশ ছাড়া সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতা সংরক্ষণ নিশ্চিতভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত এমনকি নস্যাৎ হতে বাধ্য।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতি হুমকি

আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বিভিন্ন দিক থেকে বাধা ও হুমকির সম্মুখীন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) শুধু ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রসার
(খ) ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার প্রচার ও প্রসার
(গ) দুবাংলার ভাষা ও সাহিত্যেকে এক ইউনিট বলে মনে করা ও তার প্রসার ঘটানো
(ঘ) সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রসার

আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে নিছক ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রসার। যদিও আমাদের জাতি সত্ত্বার অন্যতম উপাদান ভাষা পরিচয় কিন্তু অন্যান্য উপাদানকে পরিহার করে নিছক ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ আমাদের পূর্ণাঙ্গ জাতি পরিচয়ে বিভ্রান্তিরই জন্ম দেয়। এ ধরনের জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির। বিশেষ করে যারা ভাষা পরিচয়কে জাতীয়তার একক উপাদান মনে করেন, তারা বিষয়টিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করে থাকেন। তদুপরি এ জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ভৌগোলিক রাজনৈতিক অস্তিত্বের সাথে অসংগতিপূর্ণ। এ ধরনের জাতীয়তাবাদ এদেশের মুসলিম পরিচয়ের সাথেও সাংঘর্ষিক। তাই শুধু ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রসার আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। ভাষা ভিত্তিক পরিচয়ের সাথে ভৌগোলিক-রাজনৈতিক এবং আদর্শিক ধর্মীয় পরিচয়কে সম্পৃক্ত করলেই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার বিকাশ সম্ভব।

ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবধারার প্রচার ও প্রসার

আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার পথে অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) ভাবধারার প্রসার। আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মৌলভিত্তি হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার মানে আমাদের স্বাতন্ত্রের ভিত্তিকেই ধ্বসে দেয়া। আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয় অস্তিত্বকে নস্যাৎ করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মীয় সহনশীলতা ও অসাম্প্রদায়িকতা নয় (যেমন কেউ কেউ এমন ব্যাখ্যা করে থাকেন)। এ হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

সমাজ-সংস্কৃতি থেকে ধর্মের প্রভাবকে নস্যাৎ করার প্রয়াস। এ হচ্ছে ধর্ম-পরিচয়কে বিলোপ করার প্রচেষ্টা। বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিকও। সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্যে ধর্মনিরপেক্ষতা সন্দেহাতীতভাবে প্রচণ্ড হুমকি। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার হলে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে- এমন ধারণা কেউ পোষণ করলে তিনি ভুল করছেন। তাই যারা আমাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব ও স্বকীয়তায় বিশ্বাসী তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা প্রতিরোধ করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ ও বলিষ্ঠ করতে হলে- এর বিকাশকে নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই সেকুলার ভাবধারার অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

দু'বাংলার ভাষা ও সাহিত্যিকে এক ইউনিট মনে করা ও এ ভাবধারার প্রসার ঘটানো

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের-ভাষা মূলতঃ বাংলা হলেও উভয় অঞ্চলের সংস্কৃতি এক নয়-সংস্কৃতিবোধও এক নয়। এমনকি মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও উভয় অঞ্চলের ভাষার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। হুবহু এক নয়। ভাষার স্বাতন্ত্র্য খুব বিরাট না হলেও যতটুকু আছে তার মধ্যে স্বতন্ত্র পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে নিঃসন্দেহে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবধান তো আরো ব্যাপক। উভয় অঞ্চলের সাহিত্য স্ব-স্ব অঞ্চলের সমাজ চিত্রের রুপায়ণ। জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন। যেহেতু উভয় অঞ্চলের সমাজ, চিন্তা-চেতনা-মনন, আশা-আকাঙ্খা এক রূপ নয়, তাই উভয় অঞ্চলের সাহিত্যও এক রূপ হওয়ার কথা নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে উভয়ের মধ্যে কোন সাধারণ কিছু নেই বা কোন মিলই নেই। মিল অবশ্যই আছে। তবে এ ধরনের মিল শুধু পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের সাথে কেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের সাথেও কমবেশী রয়েছে। তাই পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্য দুটো ইউনিট, এক ইউনিট নয়। যারা এক ইউনিট বলে চালাতে চান তারা আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতি-সত্ত্বা, রাজনীতি, ভূগোল ইত্যাদিকে উপেক্ষা করছেন। আর এ ধরনের উপেক্ষা আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মারাত্মক। অতএব, দু'বাংলার ভাষা-সাহিত্যকে দুটো পৃথক ইউনিট ধরেই আমাদের এগুতে হবে। অবশ্য পরস্পর পরস্পর থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টাও চালাতে হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নয়নে উভয় অঞ্চলের অবদানকে স্বীকার করতে হবে। বৃটেন ও আমেরিকার ভাষা মূলতঃ ইংরেজী হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের ভাষারীতি ও সাহিত্য এক নয়। ব্যবধান আছে, পার্থক্য আছে। তেমনি ধরনের ব্যবধান বলতে কি তার চেয়েও বেশী ব্যবধান এখানে আছে এবং তা থাকতে হবে। কারণ বৃটেন ও আমেরিকার চেয়েও উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক-আদর্শিক পার্থক্য অধিকতর স্পষ্ট ও বেশী। অতএব, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে পরিহার করে উভয় বাংলার ভাষা-সাহিত্যের পূর্ণ ঐক্যের ধারণা অত্যন্ত মারাত্মক। আমাদেরকে এ ভাবধারা ও ধারণা প্রতিরোধ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার প্রতি সর্বাধিক বাস্তব হুমকি হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এ আগ্রাসন দুটো দিক থেকে আসছে। একটা ভারত থেকে অন্যটি পশ্চিমা জগত থেকে। আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের দেশে ভারতীয় পত্র-পত্রিকা-ছবি, শিল্পকলা-সংগীত ইত্যাদি প্রসারের মাধ্যমে। পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসারও আমাদের সংস্কৃতির জন্যে হুমকি স্বরূপ।

এসব 'বিজাতীয়'-বিদেশী সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে পত্র-পত্রিকা ছবি ভিডিও ইত্যাদি আমদানী ও চোরাচালানির মাধ্যমে। স্যাটেলাইট রেডিও-টেলিভিশনও আমাদের দেশের সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এসব আগ্রাসনে রূপ নিচ্ছে।

এ আগ্রাসন আমাদের ভাষা-সাহিত্য-শিল্পের বিকাশের পথে মারাত্মক বাধা। একদিকে দেশীয় স্বকীয় ভাষা-সাহিত্য-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হচ্ছে অন্যদিকে ঐসব উপায় উপকরণ আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির ভিতকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

যদি আমরা সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত ও বিকশিত করতে চাই তাহলে এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরও প্রয়োজন আছে।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা সংরক্ষণে করণীয়

আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা নির্ভর করে আমাদের উদ্যোগ, কর্মপ্রচেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও পরিকল্পিত প্রয়োগের উপর। এর জন্যে বহুমুখী কর্মসূচী ও কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা সংরক্ষণ ও বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১. পূর্ণাঙ্গ জাতি সত্ত্বার ধারণার প্রসার ঃ আমাদের জাতি সত্ত্বার পূর্ণাঙ্গ ধারণার প্রসার ছাড়া সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবেনা। তাই আমাদের জাতিসত্ত্বার সবকটি দিক অর্থাৎ বাংলাদেশী বাঙালী ও মুসলিম যুগপৎ এই তিন পরিচয়ের সমন্বিত জাতি-সত্ত্বার প্রসার প্রয়োজন। খন্ডিত জাতি সত্ত্বার প্রসার বিভ্রান্তি বিরোধ ও বিতর্কই সৃষ্টি করবে যা সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার প্রতিকূল। শুধু বাঙালী, শুধু বাংলাদেশী বা শুধু মুসলিম কোনটাই আমাদের জাতি সত্ত্বার পূর্ণ রূপ নয়। তাই পূর্ণরূপটাই তুলে ধরতে হবে, এর বিকাশ ও প্রসার ঘটাতে হবে। তাহলে কাঙ্খিত স্বকীয়তার বিকাশ সম্ভব।

২. স্বকীয় আদর্শ সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ঃ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা সংরক্ষণ ও বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে জনগণের মধ্যে স্বকীয় আদর্শ সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। জনগণ সচেতন না হলে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ দুরূহ ব্যাপার। জনগণ সচেতন থাকলে স্বকীয়তার

www.nagorikpathagar.org

উপর যে কোন হামলা আগ্রাসন প্রতিরোধ সম্ভব। তাই জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে সম্ভাব্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৩. সাহিত্য-শিল্পে আমাদের সমাজ চিত্র ও স্বকীয় মূল্যবোধ তুলে ধরা ঃ সাহিত্য-শিল্প সমাজ চিত্রের প্রতিফলন, জনগণের আশা-আকাঙ্খা, দুঃখ-বেদনার রূপায়ন। তাই জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-চেতনা যতবেশী সাহিত্যে শিল্পে প্রতিফলিত হবে ততবেশী সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা উজ্জীবিত হবে। এ সাহিত্য-শিল্পে যদি স্বকীয় ভাবধারার বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটে তাহলে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা দৃঢ়তা অর্জন করে, দ্রুত এর বিকাশ হয়। আর যদি নিজস্ব মূল্যবোধ চিন্তা-চেতনা সাহিত্য শিল্পে যথার্থভাবে বিধৃত না হয়, সঠিক প্রতিফলন না ঘটে তাহলে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। তাই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৪. পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির সঠিক উপস্থাপন ঃ পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মন-মগজে, চিন্তা-চেতনায় জাতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিকোণ দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া সম্ভব। বিশেষ করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরগুলোতে পাঠ্যপুস্তকের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শিশুর মানস গঠনে প্রাথমিক পাঠ্যবিষয় গভীর ছাপ ফেলে। তাই পাঠ্যপুস্তকে যদি জাতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এবং আমাদের স্বকীয়তা ফুটে উঠে তাহলে আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির ভাবধারার আলোকেই শিশুরা-তরুণরা গড়ে উঠবে। স্বকীয় ভাবধারায় তারা উদ্বুদ্ধ হবে, অনুপ্রাণিত হবে। আর যদি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে অসতর্কতার পরিচয় দেয়া হয় তাহলে এর ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তাই এ ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে।

৫. জাতীয় গণ-মাধ্যমসমূহের কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা ঃ বর্তমানে সংস্কৃতির বিকাশে রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত বেশী। আর আমাদের দেশে এসব গণমাধ্যমসমূহ প্রধানতঃ জনগণের অর্থে পরিচালিত। তাই জনগণের তথা জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে এসব গণমাধ্যম সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে টেলিভিশন-রেডিও নেটওয়ার্কের আওতায় প্রায় গোটাজাতি। তাই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উজ্জীবনে, স্বকীয়তা প্রসারে এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের জাতীয় গণমাধ্যমসমূহের ভূমিকা দুর্ভাগ্যজনক। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বিনষ্ট করার কাজেই এ সব প্রতিষ্ঠান লিপ্ত। সমাজকে সুস্থ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক নির্দেশনা দেয়ার পরিবর্তে বিপথে পরিচালিত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। তাই দেশের জনগণ ও যারা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তায় বিশ্বাসী তাদেরকে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে এবং জাতীয় গণমাধ্যমসমূহের ভূমিকা পরিবর্তনের জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারকেও এসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে শুধু শ্লোগান দিয়ে স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

৬. স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ বিরোধী ফিলম ভিডিওসহ বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ঃ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার নামে স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ বিরোধী বিভিন্ন উপকরণ তৈরি ও আমদানীর মাধ্যমে একশ্রেণীর অর্থলোভী মানুষ আমাদের সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা এবং জাতির চরিত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এসব গণবিরোধী ও স্বকীয় আদর্শ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এসব প্রতিরোধে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলাও প্রয়োজন।

৭. জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয় আদর্শ বিরোধী সাহিত্যের প্রসাররোধ ঃ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তাকে সংরক্ষণ করতে হলে জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয় আদর্শ বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রসার রোধ করতে হবে। প্রয়োজনে এসব নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। যে জাতির কোন ব্যক্তি তার ধর্ম ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে আক্রমণাত্মক ও নোংরা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায় তারা মূলতঃ বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের দেশীয় এজেন্ট। জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার দুশমন। এদের প্রতিরোধ করতে হবে।

৮. গ্রামীণ এতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিকাশ সাধন ঃ আমাদের স্বকীয়তা বিকাশের জন্যে পাশ্চাত্যের শহুরের সংস্কৃতির চেয়ে গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিকাশের প্রয়াস চালাতে হবে। অবশ্য গ্রামীণ সংস্কৃতির সবটাই কল্যাণকর এমন নয়। এখানেও বহু অশুভ ও ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে। তবে সেগুলোর পরিমার্জনা সহকারে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি বিকাশ আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৯. ধর্মীয় ভাবধারার প্রসার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে জোরদার করা ঃ ধর্ম যেহেতু আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার মূল ভিত্তি তাই ধর্মীয় মূল্যবোধের যত প্রসার ঘটবে ততই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বলিষ্ঠ হবে। এ জন্যে ধর্মীয় ভাবধারার প্রসার আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যত জোরদার হবে, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের যত প্রসার হবে ততই আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন মোকাবেলা সহজ হবে। অনেকে এমন আছেন যারা ধর্মের প্রসারকে সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতিকূল মনে করেন। অথচ ব্যাপারটি উল্টো ... ও প্রসার আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ... তাই এ বিষয়টির উপর য...

www.nagorikpathagar.org

১০. মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও গণ সম্পৃক্ত চেতনার প্রসার ও অনুপ্রবিষ্ট ভাবধারার প্রতিরোধ ঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গণসম্পৃক্ত চেতনা হচ্ছে অন্যায় অবিচার ও জুলুমের প্রতিরোধ, দেশজ সংস্কৃতি সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তি, গরীব, দুঃখী মানুষের অধিকার আদায়, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা, আত্ম-সম্মান ও যাবতীয় অধিকার নিয়ে বাঁচা, শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তি, দারিদ্র্যের অবসান, স্বকীয় মূল্যবোধ ও আদর্শের উজ্জীবন, হাজার বছরের ইতিহাসের বাস্তব রূপায়ণ। এসব ভাবধারাই জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করেছে। জনগণ এ জন্যেই রক্ত দিয়েছে। কিন্তু কতিপয় মহল মুক্তিযুদ্ধের নাজুক পরিস্থিতিতে ভারতীয় সাহায্যের সুবাদে ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। কিছু সুযোগ সন্ধানী গ্রুপ তন্ত্রমন্ত্র চাপানোর চেষ্টা চালিয়েছিলো। জনগণ ইতিমধ্যেই এসব বিজাতীয় ও বিদেশী স্বকীয় আদর্শ বিরোধী সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার অন্তরায় ভাবধারাসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে। অবশ্য অনুপ্রবিষ্ট ও চাপানো ভাবধারার ধারক বাহকরা এখনও সক্রিয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার প্রসার প্রয়োজন এবং অনুপ্রবিষ্ট ও চাপানো ভাবধারার প্রতিরোধ আবশ্যক।

১১. ইসলামের ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া ঃ ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের প্রসার ছাড়া জাতীয় ইসলামী আদর্শের সঠিক উপস্থাপনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার। সঠিক অনুবাদ সাহিত্য একটি জাতির জীবনে অনেক কল্যাণ ডেকে আনতে পারে। তা জাতির আন্তর্জাতিক সত্ত্বাকে বিকশিত করতে সহায়তা করে। আমাদের স্বকীয়তা ও সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক যোগসূত্র অনুবাদ সাহিত্য বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে পারে। ইসলামের মৌলিক ও ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থসমূহের অনুবাদ আমাদের সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক ও উম্মাহ কেন্দ্রিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে। কাজেই এ ব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া প্রয়োজন।

১২. দেশীয় সাংস্কৃতিক বাজার সংরক্ষণ ঃ আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বাজার দখল করে বিদেশী সংস্কৃতির প্রসারের ষড়যন্ত্র চলছে। ইতোমধ্যেই এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জোরদার হয়েছে। এর প্রতিরোধ প্রয়োজন। নিজেদের সাংস্কৃতিক বাজার যদি অন্যদের দখলে চলে যায় তাহলে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা নস্যাৎ হতে বাধ্য। তাই এ বিষয়ে আমাদের যত্নবান হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আগ্রাসনের কবলে আমাদের সংস্কৃতি

আমাদের সংস্কৃতি আজ আগ্রাসনের শিকার। এ আগ্রাসন ব্যাপক ও গভীর। এ আগ্রাসন প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে জাতীয় জীবনে বিপর্যয় অনিবার্য। তাই এ আগ্রাসনের রূপ প্রকৃতি ও গতিধারা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রয়োজন আগ্রাসন প্রতিরোধের কার্যকর পন্থা খুঁজে বের করা।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কি

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি ব্যাপক অর্থবোধক প্রত্যয়। কোন জাতি বা দেশের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে আগ্রাসন চালানো হয় তা-ই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এ হচ্ছে একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতিকে ও তার সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে নস্যাৎ করে অন্য জাতি বা দেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে চাপিয়ে দেয়া ও চালু করার প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র। একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে ঐ জাতির স্বকীয় সংস্কৃতি-চর্চাকে বেদখল করে আগ্রাসী জাতির সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয়ার সর্বমুখী তৎপরতাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে কোন জাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তি ও কার্যক্রমকে দুর্বল করা, দাবিয়ে দেয়া, এবং আগ্রাসী জাতির সংস্কৃতিকে ঐ জাতি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য করার ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টা। মোটকথা, কোন জাতির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে যাবতীয় তৎপরতাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অন্তর্ভূক্ত।

আগ্রাসনের বিভিন্ন রূপ

আগ্রাসী শক্তিসমূহ বিভিন্ন রূপ ও পন্থায় টার্গেট দেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রধান প্রধান রূপ ও পন্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

ক. সাংস্কৃতিক অনুপ্রেবেশ ঃ নিজেদের মতলব ও আসল রূপ গোপন রেখে টার্গেট জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আগ্রাসী শক্তির নির্দেশিত পন্থায় পরিকল্পিত অনুপ্রবেশ করাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ। সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের মূল উদ্দেশ্য থাকে টার্গেট দেশের সাংস্কতিক কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার, সে জাতির সংস্কৃতিকে বিকৃত করা, আগ্রাসী সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ইত্যাদি। এ অনুপ্রবেশ দুধরনের হতে পারে ঃ (১) আগ্রাসী দেশের ভাড়াটে ও অনুগামী লোকদের টার্গেট দেশের সংস্কৃতির অঙ্গনে বিশেষ করে গণমাধ্যমগুলোতে অনুপ্রবেশ করা। (২) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে কৌশলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কাজে ব্যবহার করা। বিভিন্ন অপসংস্কৃতির বিষয়গুলোকে টার্গেট দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণ করে ফেলা। যেমনঃ শিরক, বিদআত, কুসংস্কার, ভোগবাদীতা, অশ্লীলতা ও বস্তুবাদীতাকে আমাদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

খ. সাংস্কৃতিক বিকৃতি সাধন ঃ টার্গেট দেশের সাংস্কৃতিকবোধ ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে নানাভাবে বিকৃত করে দেয়া। ঐ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্যকে অন্যখাতে প্রবাহিত করা। উদাহরণস্বরূপ ঃ ঈদ আমাদের সংস্কৃতির একটি বড় অঙ্গ। একে অস্বীকার বা এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ঈদকে তার মূল ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক আনন্দ ও ভোগের অনুষ্ঠানে পরিণত করা যেতে পারে। এ ভাবে ঈদ সংস্কৃতিকে বিকৃত করা সম্ভব। আমাদের দেশে আগ্রাসীশক্তির অনুগামীরা ঐ কাজটি করার চেষ্টা করছে। তারা ঈদ সংস্কৃতিকে তার মূল আধ্যাত্মিক মানবিক ও সামাজিক ভাবধারা থেকে দূরে সরিয়ে বর্তমানে খৃস্টমাসডে বা হোলি অনুষ্ঠানের মতো নিছক ভোগ আর ফুর্তির অনুষ্ঠানে পরিণত করার যাবতীয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গ. সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা ঃ একটি জাতির সংস্কৃতির মূল গতিধারাকে পরিকল্পিতভাবে পাল্টে দেয়া, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা, বড় ধরনের বিকৃতি আনয়ন হচ্ছে সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাত। উদাহরণস্বরূপ ১৮০০ সালের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। এর মাধ্যমে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে মুসলিম ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'সংস্কৃত' মুখী করে তার গোটা রূপটাই পাল্টে দেয়া হয়। এ ছিলো একটি বড় ধরনের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা।

ঘ. সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস ঃ এ হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস হচ্ছে টার্গেট দেশে স্বকীয় সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টির ঘৃন্য প্রচেষ্টা। আমাদের দেশের গল্প-উপন্যাস-নাটক-সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রতীকী দিকগুলোকে বিশেষ করে দাড়ি, টুপি, পর্দা (হিজাব) ইত্যাদি বিষয়গুলোকে হেয় করে বিকৃত করে পেশ করার ঘৃণ্য প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। এসব সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস ছাড়া কিছু নয়। সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসীরা নানা প্রচার মাধ্যমে এমন ভীতিকর পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যাতে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি চর্চা ও অনুশীলন করতে নতুন প্রজন্ম আগ্রহী না হয়, সাহস না পায়। ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হওয়ার কারণে কোন লেখক-শিল্প, কবি-সাহিত্যিককে হেয় করা, অমূল্যায়ণ করা, অপাংক্তেয় করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বড় ধরনের সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস। এক সময় এদেশে কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে ঘৃণ্য সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস চালানো হয়েছিলো। আজ আগ্রাসী দেশের নির্দেশনায় এসব সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে এদেশের তরুণদেরকে ইসলাম ও মুসলিম ভাবধারাপুষ্ট সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করার জন্যে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে।

ঙ. সাংস্কৃতিক ডাম্পিং ঃ সাংস্কৃতিক ডাম্পিং হচ্ছে কোন জাতির সাংস্কৃতিক বাজার দখল করার জন্যে আগ্রাসী দেশ কর্তৃক আপাতত নিজেদের বৈষয়িক ক্ষতি

www.nagorikpathagar.org

স্বীকার করেও পদক্ষেপ নেয়া। যেমন, স্বল্পদামে বা নামমাত্র দামে বইপুস্তক, পত্র-পত্রিকা, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, ছবি ইত্যাদি সরবরাহ করা। সাংস্কৃতিক উপায়-উপকরণ ও বাহন সামগ্রী সস্তায় সরবরাহ করে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বাজারকে দখল করার চেষ্টা আজ অত্যন্ত প্রকট। সাংস্কৃতিক ডাম্পিং-এর মাধ্যমে টার্গেট দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশকে নস্যাৎ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। আগ্রাসী দেশের উপর টার্গেট দেশকে সাংস্কৃতিকভাবে স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল করে রাখার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

চ. সাংস্কৃতিক পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি ঃ টার্গেট দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সে দেশের অভ্যন্তরে একটি সাংস্কৃতিক পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি করা আগ্রাসনী কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরের (যেমনঃ লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী) কিছু লোককে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আগ্রাসনকে ত্বরান্বিত করার জন্যে আগ্রাসী দেশ কর্তৃক সংগ্রহ ও নিয়োগ করা হয়। এরা হচ্ছে সাংস্কৃতিক পঞ্চম বাহিনী। এরা দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আগ্রাসী দেশের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার জন্যে কাজ করে। এরা দেশ ও জাতির সংস্কৃতির দুশমন। এরা নিজদের সংকীর্ণ স্বার্থে নিজ দেশ ও জাতির আদর্শ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তৎপর। এরা বিশ্বাসঘাতক, সাংস্কৃতিক গুপ্তচর। এরা সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ, সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাত ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের মাধ্যম। এদের প্রতিরোধ অপরিহার্য।

ছ. সাংস্কৃতিক চাপ ঃ টার্গেট দেশে ব্যাপক প্রচারণা, অনুপ্রবেশ, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, সন্ত্রাস, ডাম্পিং ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সাহায্য-সহযোগিতার নামে সাংস্কৃতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। এসব চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে মূলত আগ্রাসী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে বা এর প্রতি নমনীয় ও সহনশীল হতে টার্গেট দেশকে বাধ্য করা হয়। স্বকীয়তা বোধ প্রচণ্ড না হলে এসব সাংস্কৃতিক চাপ মোকাবেলা করা অত্যন্ত কঠিন।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লক্ষ্যসমূহ

বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে তার সুনির্দিষ্ট কতকগুলো লক্ষ্য রয়েছে, যেগুলো প্রধানত নিম্নরূপ ঃ

১. জাতিসত্ত্বার মুসলিম ভাবধারাকে নস্যাৎ করা ঃ আমাদের জাতিসত্ত্বার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে মুসলিম পরিচয়। ভাষা পরিচয়, ভূগোল পরিচয় ও মুসলিম পরিচয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের জাতিসত্ত্বার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসী শক্তি আমাদের জাতিসত্ত্বার মুসলিম পরিচয়কে দুর্বল করতে চায়, নস্যাৎ করতে চায়। তারা নানাভাবে বিশেষ করে ভাষাগত পরিচয়কে মূল ধরে তাকে ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দিতে চায়। বাঙালী ও মুসলিম পরিচয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

করে বাঙালী পরিচয়কে জাতি পরিচয় আর মুসলিম পরিচয়কে নিছক সাম্প্রদায়িক পরিচয় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ লক্ষ্যে আগ্রাসী শক্তি ও তাদের এদেশীয় সাংস্কৃতিক পঞ্চম বাহিনীর লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসত্ত্বার প্রশ্নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারলেই আগ্রাসনের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জিত হবে। তাই তারা এ ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এ প্রশ্নে তারা অত্যন্ত সক্রিয়। আবার বাঙালী-বাংলাদেশী বিরোধ সৃষ্টি করে জাতিসত্ত্বার ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিকে তারা দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এমনকি ঐসব আগ্রাসী শক্তি দেশের মূল স্বাধীনতাকে সন্দিগ্ধ করে তোলার ষড়যন্ত্রমূলক অশুভ তৎপরতা ও চালিয়ে যাচ্ছে। মোটকথা আগ্রাসী শক্তির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের জাতিসত্ত্বাকে দুর্বল করা। এ সম্পর্কে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামের ধর্মনিরপেক্ষ তথা বিকৃত ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা ঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা যাতে গোটা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ইসলাম ও মুসলিম বোধের বিপরীতে দাঁড় করানো যায়। আগ্রাসী শক্তি দেশের সেক্যুলার শক্তিগুলোকে ব্যবহার করে এ কাজটি করে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। তারা মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামের মধ্যে সংঘাত আবিষ্কার করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত। তারা দল বা ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকাকে সাধারণীকরণ করে গোটা ইসলামের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াসী। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি থেকে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ও ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠন, ১৯০৬-এর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯১১-এর বঙ্গভঙ্গ রদের এদেশীয় তথা মুসলিম প্রতিক্রিয়া, ১৯১৬ সালের পৃথক নির্বাচন চুক্তি, ১৯২০-এর খেলাফত আন্দোলন, ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা কর্তৃক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক পাকিস্তান ইস্যুর প্রতি সমর্থন ঘোষণা, ১৯৪৭-এর পাকিস্তান অর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। তারা ভুলে যায় ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব ও ১৯৪৭-এর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরেই বাংলাদেশের জন্ম। মূল ১৯৪০ লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়নই স্বাধীন বাংলাদেশ। আর লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। আর পরবর্তীতে ১৯৪৬-এ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবক্রমেই লাহোর প্রস্তাবের খানিকটা সংশোধন করে ১৯৪৭-এ এক পাকিস্তান অর্জন করা হয়। এদেশের মানুষ প্রথমে চেয়েছিল এক পাকিস্তান কাঠামোতে লাহোর প্রস্তাবের ভাবধারার আলোকে তাদের অধিকার অর্জন। ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত (ভাষা আন্দোলন, ৬ দফার আন্দোলন, ১১ দফার আন্দোলন, ৭০-এর

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচন প্রতিক্ষেত্রেই) দেশের মানুষের সংগ্রাম ছিলো পাকিস্তান কাঠামোতে তাদের সমস্যার সমাধান ও অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর যখন দেখা গেলো যে এক পাকিস্তান কাঠামোতে এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় তখনই মূল লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। কাজেই স্বাধীনতা সংগ্রাম দ্বি-জাতিতত্ত্ব বা মুসলিম জাতিসত্ত্বার বিপরীতধর্মী কোন কিছু ছিলো না। অন্তত দেশের সাধারণ মানুষ কখনই এটা মনে করেনি বা এখনও মনে করে না। অথচ আগ্রাসী শক্তি ও তাদের এদেশীয় সহযোগিরা এ ঐতিহাসিক ও বাস্তব সত্যটিকে ঢেকে রাখার জন্যে এমনকি মুছে ফেলার জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা গোটা ইতিহাসটাকেই বিকৃত করে নতুন প্রজন্মের নিকট পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছে। একবার যদি তারা এ ভুল বিশ্লেষণ ও গণ-বিরোধী চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় তাহলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সহজ ক্ষেত্রে পরিণত হবে বাংলাদেশ। যেমন স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে তা পরিলক্ষিত হয়েছিল। অবশ্য দেশের সাধারণ মানুষ এ প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিল। মোটকথা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে তা বদ্ধমূল করা আগ্রাসনের অন্যতম লক্ষ্য।

৩. জাতীয় আদর্শের সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঃ বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ ইসলাম। দেশের ৯০ ভাগ মানুষের আশা-আকাঙ্খা জীবনবোধ, সংস্কৃতিবোধ, জাতিবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনা প্রধানত ইসলাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলোর সাথে ইসলামের সম্পৃক্তি অত্যন্ত গভীর। অথচ আগ্রাসী শক্তি গোটা জাতিকে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে জাতীয় আদর্শ ইসলাম থেকে দূরে সরাতে চায়। জাতীয় আদর্শকে তারা সাম্প্রদায়িকতা আখ্যায়িত করে দেশের বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে চায়। আগ্রাসী শক্তি জানে যে একবার দেশের মানুষকে ইসলাম ভিত্তিক জাতীয় চেতনা থেকে দূরে সরাতে পারলে সহজেই তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে সফল করতে সক্ষম হবে। কারণ ইসলামী চেতনাবোধ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পথে তীব্র বাধা। তাই ঐসব শক্তি ও তাদের এদেশীয় এজেন্টরা এ বাধাকে দূর করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

৪. ভাষা ও সাহিত্যের দেশজ ও আদর্শিক স্বকীয়তা বিনষ্ট করা ঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের যে আদর্শগত ও দেশজ ঐতিহ্যিক স্বকীয়তা রয়েছে তা নষ্ট করে দেয়া। তারা জানে যে একবার কোন সংস্কৃতির স্বকীয়তা বিনষ্ট করতে পারলে ঐ সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করা, দুর্বল করা এবং তার উপর অন্যকোন সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয়া অতীব সহজ। তাই তারা ভাষাও সাহিত্যের স্বকীয়তা বিনষ্টের অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ প্রসঙ্গে এটিও আমাদের স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, আমাদের স্বকীয়তার দুটো প্রধান দিক রয়েছে-

www.nagorikpathagar.org

একটি আদর্শিক ধর্মীয় স্বকীয়তা, আর অন্যটি দেশজ ঐতিহ্যিক স্বকীয়তা। আগ্রাসী তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে এ দুধরনের স্বকীয়তাই বিনষ্ট করা। তাদের প্রথম লক্ষ্যঃ আদর্শিক স্বকীয়তা বিনষ্ট করা, দ্বিতীয় লক্ষ্য ঃ দেশজ ঐতিহ্যক স্বকীয়তা নষ্ট করা। আর যখন তারা এ দুটো ক্ষেত্রেই স্বকীয়তা বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে তখন আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা উভয়টিকে দুর্বল করা ও নস্যাৎ করার ক্ষেত্র তৈরি হবে। তাই তারা প্রথমেই সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য যে এক ইউনিয়ট নয় বরং দুটো স্বতন্ত্র ইউনিট-এ সত্যটিকে ঢেকে রাখতে চায়। প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা দেশের সংস্কৃতিসেবীদের মনে এ ধারণা দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত যে উভয় অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি মূলত এক ও অভিন্ন। কাজেই উভয়ের ভাবধারাও এক। কিন্তু বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের চেতনাবোধ, ভাবধারা এক নয়, তারা এক সাংস্কৃতিক ইউনিট নয়, পৃথক সাংস্কৃতিক ইউনিট। এ সত্যটিকে নানাভাবে প্রচারণা চালিয়ে তারা আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায় যাতে এদেশের ভাষা সাহিত্যের স্বকীয়তা বিনষ্ট করা সম্ভব হয়।

৫. নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি ঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে দেশের নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি ও তাকে ত্বরান্বিত করা। দেশের তরুন সম্প্রদায়কে অশ্লীলতা, মাদকতা, পর্ণোগ্রাফী ইত্যাদিতে লিপ্ত করে দেশের নৈতিক মানকে ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া তাদের উদ্দেশ্য। পশ্চিমা ও ভারতীয় উভয় আগ্রাসী শক্তিই আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংসের পন্থা হিসেবে তারুণ্যের নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। এ লক্ষ্যে তারা নানাভাবে পর্ণোগ্রাফী বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে পাচার করছে। পর্ণোগ্রাফীকে তথাকথিত লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বস্তুত নৈতিক-অবক্ষয় সৃষ্টির গভীরতর ষড়যন্ত্র সাংস্কৃতিক অবক্ষয় সৃষ্টিরই অংশ। একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি করতে পারলে আরেকটি করা সহজ হয়ে পড়ে। তাই এ বিষয়টিকে তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অন্যতম বড় কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ জন্যেই আমরা দেখি বাংলাদেশে যারা স্বকীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ও আধিপত্যবাদী শক্তির সপক্ষে কর্মরত তারা প্রায় সবাই অবাধ যৌনতায় বিশ্বাসী, এমনকি তাদের কেউ কেউ জরায়ুর স্বাধীনতার শ্লোগান পর্যন্ত তুলেছে। মোটকথা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও পর্ণোসংস্কৃতি একই সূত্রে গাঁথা।

৬. মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল করা ঃ একটি মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম দেশের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে বিশ্ব মুসলিমের জন্যে এদেশের জনগণের একাত্মতা ও সহমর্মীতা তর্কাতীত। এই একাত্মতা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সাংস্কৃতিক অবয়বকে

www.nagorikpathagar.org

প্রসারতা ও বিশালতা দান করে, তার ইসলামী ভাবধারাকে জোরদার করে তুলে। কিন্তু আগ্রাসী শক্তির নিকট তা মোটেও পছন্দীয় নয়। তারা জানে যে বাংলাদেশের গোটা সংস্কৃতিকে দুর্বল করতে হলে তার উম্মাহমুখী চেতনাকে দুর্বল করতে হবে। তাই তারা নানাভাবে এ অপচেষ্টায় লিপ্ত।

৭. সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি ঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এদেশের সংস্কৃতিকে আগ্রাসী শক্তির সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল করে তোলা। এদেশের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ধ্বংস করা। জীবনবোধ, সমাজবোধ, সংস্কৃতি চিন্তা এবং সংস্কৃতির শৈল্পিক প্রকাশ, ভাষা সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই যাতে আগ্রাসী সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়, এদেশের সংস্কৃতিতে যাতে অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা সৃষ্টি হয় তার জন্যে এরা প্রচেষ্টারত। সাংস্কৃতিক-নির্ভরশীলতা শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতাকে পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলতে পারে। জাতির নিজস্ব অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হতে পারে। তাই আগ্রাসী শক্তি আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং এলক্ষ্যে তারা এদেশীয় একদল সাংস্কৃতিক পঞ্চম বাহিনীও সৃষ্টি করেছে। আমাদেরকে এসব প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

মোটকথা, আগ্রাসী শক্তিগুলো আমাদের সংস্কৃতিকে বিকৃত ও ধ্বংস করার জন্যে বহুমুখী লক্ষ্য ও কর্মসূচী নিয়ে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

আগ্রাসনের মাধ্যমসমূহ

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর জন্যে আগ্রাসী দেশ ও গোষ্ঠী বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।

১. বই পুস্তক ঃ আগ্রাসন চালানোর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে বই পুস্তক। গল্প-উপন্যাস, নাটক, কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে পাঠ্য পুস্তক পর্যন্ত একাজে ব্যবহৃত হয়। আগ্রাসী দেশ ও গোষ্ঠী এগুলোর মাধ্যমে আগ্রাসী তৎপরতা চালায়। আগ্রাসী শক্তি দুভাবে একাজটি করে থাকে। তারা আগ্রাসনের মনোভাব নিয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং সেগুলো টার্গেট দেশে চালান দেয়। আবার টার্গেট দেশে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এমন ধরনের বইপত্র রচনা ও প্রকাশনার ব্যবস্থাপনা করে। তাছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য-শিল্প, নাট্যসংস্থা গঠন ও তাদের অর্থযোগান দিয়ে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কাজটি অত্যন্ত জোরদার করা হয়।

২. গণমাধ্যমসমূহ ঃ নিজের দেশের গণমাধ্যম অন্যদেশ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কাজে ব্যবহার করা হয়। আবার অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টার্গেট দেশের গণমাধ্যমকে বিভিন্ন কায়দায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাত সৃষ্টির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সরাসরি আগ্রাসনের চেয়েও তা অত্যন্ত মারাত্মক। উলঙ্গ ছবি, জাতীয় আদর্শ বিরোধী কাহিনী সম্বলিত ছায়াছবি, বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

ধরনের উৎকট ও নৈতিকতা বিরোধী গানবাদ্য ইত্যাদি পরিবেশনার মাধ্যমে আগ্রাসনের কাজটি সুকৌশলে করা হয়। বস্তুত আগ্রাসী দেশের গণমাধ্যম সেটেলাইটের মাধ্যমে টার্গেট দেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায় আবার টার্গেট দেশের গণমাধ্যমকেও এ কাজে ব্যবহার করে থাকে।

৩. এনজিও ঃ বেসরকারী বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর কাজটি বর্তমানে আমাদের দেশে খুব ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এনজিওদের একাংশ সেবার নামে দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত। তারা দেশের অনেক কল্যাণকর বিশেষ করে ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধ্বসিয়ে দেয়ার গভীরতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এসব প্রতিষ্ঠান প্রায়ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগ্রাসী দেশের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এনজিওগুলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কাজকে ত্বরান্বিত করে থাকে। সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ, অন্তর্ঘাত ও সন্ত্রাস ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪. রাজনৈতিক দল ঃ রাজনৈতিক দলও কোন কোন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমরূপে কাজ করে। আগ্রাসী দেশের মদদপুষ্ট হয়ে টার্গেট দেশের রাজনৈতিক দল স্বকীয় সাংস্কৃতিক ভিত্তি ধ্বংস করার কাজ করতে পারে। তারা আগ্রাসী দেশের ইশারায় বা পরামর্শে টার্গেট দেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে সহায়ক হবে এমন কর্মসূচীও গ্রহণ করে থাকে। সেজাতীয় দল ক্ষমতা দখল করতে পারলে তো কথাই নেই। তা না পারলেও তাদের তৎপরতা আগ্রাসনের ক্ষেত্র তৈরী করছে। বস্তুত সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে আমাদের দেশের বামদলগুলো বর্তমানে আগ্রাসী দেশের আগ্রাসন চরিতার্থ করার মাধ্যম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৫. ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী ঃ আগ্রাসী দেশ টার্গেট দেশের বুদ্ধিজীবী-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংবাদিক, আইনজীবী ইত্যাদি শ্রেণীর একাংশকে ভাড়া করে আগ্রাসনের কাজে বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালানোর জন্যে ব্যবহার করে থাকে। কখনও কখনও তা অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে করা হয়। অনেক সময় হয়তো সংশ্লিষ্ট ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীও জানেন না যে তিনি একজন এজেন্ট বা ভাড়াটে ছাড়া কিছু নন। তিনি যে নিজের দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুদ্ধে লিপ্ত সেকথাও তার অনেক সময় জানা থাকে না। নিজ দেশের জন্য ক্ষতিকর অথচ আগ্রাসীদেশের জন্যে ফলদায়ক এমন তত্ত্ব তৈরি করে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবিদের মাধ্যমে নিজ দেশে প্রচার করা হয়। মোটকথা ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

www.nagorikpathagar.org

৬. সরকারী প্রশাসন ও নীতি নির্ধারনী অংশে অনুপ্রবেশ ঃ আগ্রাসী দেশ অনেক সময় টার্গেট দেশের প্রশাসন ও সরকারী নীতিনির্ধারণী অংশে স্বীয় অনুগামীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বা অনুগামী সৃষ্টি করে সে দেশে পরিকল্পিতভাবে আইনানুগ পন্থায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যায়।

মোটকথা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে কার্যকর ও ত্বরান্বিত করার জন্যে আগ্রাসী দেশ ও শক্তিসমূহ নানা মাধ্যম ও পন্থা এবং উপকরণ ব্যবহার করে থাকে।

আগ্রাসনের শিকার আমাদের সংস্কৃতি

আমাদের সংস্কৃতি আজ ব্যাপক আগ্রাসনের শিকার। এ আগ্রাসন প্রধানতঃ দুদিক থেকে চলছে। একটি হচ্ছে পশ্চিমাজগত, অন্যটি হচ্ছে ভারত।

পশ্চিমাজগত সাধারণভাবে বাংলাদেশসহ সমস্ত মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম চেতনাবোধকে দুর্বল করার লক্ষ্যে উলঙ্গতা, যৌনতা, চরিত্রহীনতা, ধর্মহীনতা বস্তুবাদিতা, ভোগবাদিতা, পশ্চিমাকরণ ইত্যাদি প্রসারের জন্যে ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের সুবাদে বিভিন্ন এনজিও লালন ও তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে, ইসলামী চেতনাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা জগতের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতারই অংশ হচ্ছে এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। পশ্চিমা জগতের এ ধরনের কার্যক্রমকে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

অন্যদিকে ভারতের রয়েছে এদেশের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্য। এসব লক্ষ্য সামনে রেখেই ভারত সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পত্র-পত্রিকা ছবি ভিডিও ইত্যাদির আমদানি ও চোরাচালানীর মাধ্যমে এসব কার্যক্রমের প্রসার ঘটছে। ভারতীয় রেডিও টেলিভিশন আমাদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এ আগ্রাসন আমাদের ভাষা সাহিত্য-বিকাশের পথে মারাত্মক বাধা।

কোন দেশ থেকে বই, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, ছবি ভিডিও আসাটাই আপত্তি কর ব্যাপারটা এমন নয়। কিন্তু যখন কোন দেশের বা অঞ্চলের ভাবধারা ঐসব মাধ্যমগুলোর সূত্রে অন্যদেশে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস চলে, যখন অন্যদেশের সাংস্কৃতিক বাজার দখল করার প্রয়াস থাকে, সে দেশের সংস্কৃতির দুর্বল করার, বিভ্রান্ত করার চেষ্টা থাকে; যখন অন্যদেশের সংস্কৃতিকে পরনির্ভরশীল করে রাখার ষড়যন্ত্র করা হয় তখন তা অবশ্যই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পরিণত হয়। আমরা কার্যত এ ধরনেরই আগ্রাসনের শিকার। আমাদের দেশীয় কোন কোন মহলও এ আগ্রাসনকে ত্বরান্বিত ও জোরদার করার কাজে লিপ্ত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের জাতীয় গণমাধ্যগুলো আগ্রাসনের শিকার। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মহল এবং

www.nagorikpathagar.org

সংবাদপত্র নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থে এসব সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বাহন হিসেবে কাজ করছে।

মোটকথা, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে আগ্রাসনে শিকার। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ আগ্রাসনের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আগ্রাসন প্রতিরোধে করণীয়

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করতে হলে আমাদের বহুমুখী কর্মসূচী ও কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ঃ

১. পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তার ধারণার প্রসার ঃ আমাদের জাতিসত্তার যুগপৎ বাঙালী, বাংলাদেশী ও মুসলিম এ তিনটি দিকের সমন্বিত রূপের ব্যাপক প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। তাহলে কাংক্ষিত স্বকীয়তার বিকাশ সম্ভব।

২. স্বকীয় আদর্শ, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ঃ জনগণকে এসব বিষয়ে সচেতন না করা হলে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও আগ্রাসনের প্রতিরোধ অত্যন্ত দুরূপ ব্যাপার। জনগণ সচেতন থাকলে স্বকীয়তার উপর যে কোন হামলা ও আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩. সাহিত্যে-শিল্পে আমাদের সমাজ ও স্বকীয় মূল্যবোধকে তুলে ধরা ঃ সাহিত্যে শিল্পে যদি স্বকীয় ভাবধারার বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটে তাহলে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা দৃঢ়তা অর্জন করে ও দ্রুত এর বিকাশ ঘটে। আর আগ্রাসনের প্রতিরোধ করা সহজতর হয়।

৪. পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির সঠিক উপস্থাপনা ঃ পাঠ্য পুস্তকে যদি জাতীয় সংস্কৃতি ও স্বকীয়তার প্রতিফলন ঘটে তাহলে আমাদের তারুণ্য স্বকীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হবে। এ ব্যাপারে সামান্যতম অসর্তকতা অত্যন্ত মারাত্মক।

৫. জাতীয় গণমাধ্যম সমুহের কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা ঃ বর্তমানে রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলো সংস্কৃতি বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের জাতীয় টেলিভিশনের ভূমিকা তেমন ইতিবাচক নয়, বরং অনেকাংশেই নেতিবাচক। এ অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। এ ব্যাপারে দেশের জনগণ ও স্বকীয়তায় বিশ্বাসী সবাইকে সচেতন হতে হবে। সরকারের উপর প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি করে জাতীয় গণমাধ্যমগুলোকে স্বকীয় ভাবধারার প্রসার ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনরোধে ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে হবে।

৬. প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ঃ স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ বিরোধী ফিল্ম-ভিডিওসহ বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যমের উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৭. জাতীয় আদর্শ বিরোধীতা রোধ ঃ জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয় আদর্শবিরোধী সাহিত্যের প্রসারকে রোধ করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে আজ আগ্রাসী শক্তির মদদপুষ্ট ভাড়াটে লেখকরা জনগণের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কঠোর হাতে বন্ধ করতে হবে।

৮. ধর্মীয় ভাবধারার প্রসার ঃ ধর্মীয় ভাবধারার প্রচার ও প্রসারের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। ধর্মের যথার্থ উপস্থাপনা ও প্রসার আমাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনরোধের একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার।

৯. মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও গণ সম্পৃক্ত চেতনার প্রসার ও অনুপ্রবিষ্ট ভাবধারার প্রতিরোধ ঃ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে কোন কোন মহল আজ আমাদের দেশকে সেকুলার ও ধর্মবিবর্জিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ইসলামী মূল্যবোধের প্রসারের অনুকূল, ইসলামের সঙ্গে প্রকৃত চেতনার কোন বিরোধ নেই বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সেক্যুলার ব্যাখ্যা একটি অনুপ্রবিষ্ট চেতনা, আরোপিত চেতনা, যার সঙ্গে প্রকৃত চেতনার কোন মিল নেই। এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে জনগণের নিকট তুলে ধরতে হবে।

১০. অনুবাদ ঃ ইসলামের ধ্রুপদী সাহিত্য ও গ্রন্থ সমূহের ব্যাপক বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন। এতে ইসলামী জ্ঞান ও চেতনা শক্তিশালী হবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ সহজতর হবে।

১১. দেশীয় সাংস্কৃতিক বাজার সংরক্ষণ ঃ আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বাজারকে দখল করে বিদেশী সংস্কৃতি প্রসারের ব্যাপক চেষ্টা চলছে। এর প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

১২. দেশীয় প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়ন ঃ দেশীয় প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। বিদেশী প্রকাশনার চাপে যদি দেশীয় প্রকাশনা শিল্প বাধ্যগ্রস্ত হয় তাহবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপ্রয়োজন।

১৩. জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ঃ বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ও শিল্পকলা একাডেমীসহ সমস্ত জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশে ও আগ্রাসন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

১৪. সমন্বিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে জোরদার করা। একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছাড়া সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ সম্ভব নয়। তাই এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যত্নবান হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

১৫. সাংস্কৃতিক পঞ্চম বাহিনীর প্রতিরোধ ঃ দেশের সাংস্কৃতিক পঞ্চম বাহিনীর লোকদেরকে চিহ্নিত করা এবং জাতির সামনে তাদেরকে উন্মোচিত করা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঘাপটি মেরে থাকা এসব জাতীয় সংস্কৃতির দুশমনদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। তাদের উপর জনগণের চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে করে তারা নির্বিবাদে জাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে না পারে।

উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে আমাদের দেশ এক গভীর ও ব্যাপক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিটি রূপ ও পদ্ধতিই এখানে সক্রিয় হয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনে আগ্রাসী শক্তি কর্মতৎপর। এমতাবস্থায় আমাদের সম্ভাব্য সমস্ত পন্থায়ই এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসা কর্তব্য। যদি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে মুকাবিলা করার জন্যে আমাদের দেশের সাধারণ জনগণকে সচেতন করে সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে একে ছড়িয়ে দেয়া হয় তাহলেই এসব আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব। আজকের দেশপ্রেমিক প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী ও ধর্মীয় নেতৃত্বকে এ সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে। সরকারকে এ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। অন্যথায় জাতীয় জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে যদি ব্যাপক স্বকীয় সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি করা যায় তাহলে যাবতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ব্যর্থ হতে বাধ্য। এক কথায় আগ্রাসন যেমন ব্যাপক ও বহুমুখী ঠিক তেমনি প্রতিরোধ ও ব্যাপক, বহুমুখী ও সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই পরিস্থিতি মুকাবিলা সম্ভব হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

স্বা নতা অর্জনের পর তিন দশক পার হচ্ছে। এ দীর্ঘ সময়েও আমাদের অনেক মৌলিক প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। তন্মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে কোন কোন মহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। একশ্রেণীর ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা ও দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা বুঝেন। তারা জাতি-পরিচয়ে মুসলিম ও ইসলামের সম্পৃক্ততাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করেন। তাদের মতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তখনই সমুন্নত হবে যখন দেশটি পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। যখন জাতি-পরিচয় থেকে মুসলিম ও ইসলামের সংযোগ ছিন্ন হবে তখনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী হবে। যেখানে ইসলাম ও মুসলিম চেতনা প্রবল হবে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। তাই তাদের মতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনিবার্য দাবী হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাদর্শের ভিত্তিতে দেশ ও সরকার পরিচালনা করা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে পূনর্গঠন করা। তারা ইসলামী ভাবধারা ও মুক্তিযুদ্ধের ভাবধারাকে পরস্পর অসঙ্গতিশীল ও বিপরীত বলে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পান। বিগত ৩০ বছর ধরেই এ ধরনের প্রয়াস-প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে প্রকৃতই কি বুঝায়? একশ্রেণীর লোক যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে ধর্মনিরপেক্ষতা, ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের সাথে সম্পর্কহীনতা বুঝেন এটাই কি প্রকৃত সত্য? দেশের আপামর জনগণ কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে তাই বুঝে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অগনিত মানুষ কি আত্মাহুতি দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্যে, জাতির ইসলাম ও মুসলিম পরিচয় মুছে ফেলার জন্যে? পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে এদেশবাসী কি যুদ্ধ করেছিলো পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র ছিল বলে?

মুক্তিযুদ্ধ কি মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলো? ৪৭-৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ও নির্বাচন, ৬৯-এর ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন এসব কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ল ক্ষ্য হয়েছিল? ৭০-এর নির্বাচনে জনগণ কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্য নিরঙ্কু রায় দিয়েছিলো? ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণায় কি ধর্মনিরপেক্ষতার ক বলা হয়েছিলো? ৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার সংযুক্তি কি গণরায় নিয়ে করা হয়েছিলো? ১৯৭২-২০০১ পর্যন্ত এদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতাই সত্য বলে কি কোন যুক্তিগ্রাহ্য ঘটনায় বা রায়ে প্রমাণিত হয়েছে? এসব প্রশ্নের সঠিক জবাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকৃত ব্যাখ্যা, সঠিক বিশ্লেষণ।

www.nagorikpathagar.org

যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাকেই বলা যাবে, যে চেতনার সঙ্গে দেশের তাবৎ জনগণ সংশ্লিষ্ট। যে প্রেরণা ও স্বপ্ন নিয়ে দেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। যেসব মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে মুক্তিযুদ্ধ করা হয়েছিলো সেসব উদ্দেশ্যাবলীই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মর্মমূলে। যে গণচেতনা, যে গণআবেগ, যে গণআকাঙ্ক্ষার সাথে সমষ্টিগতভাবে দেশের জনগণ সংশ্লিষ্ট, মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশের বৃহত্তর জনগণের চিন্তা-চেতনায় যে মনোভাব লালিত তাই হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নির্ধারক। কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিশেষ কোন 'মটিভ' নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জাড়ত হতে পারে। কিন্তু তাই বলে ঐ বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তির নিজস্ব উদ্দেশ্যটাই গোটা জাতির চেতনা হতে পারে না। কারো পক্ষ থেকে কোনকিছু জনগণের ওপর আরোপ করা হলেই তা গণসমর্থিত, গণগ্রাহ্য হয়ে যায় না। বরং তা হবে আরোপিত ও চাপিয়ে দেয়া চেতনা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গণনির্ভর, গণসম্পৃক্ত চেতনা তথা প্রকৃত চেতনা অনুধাবনের জন্যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতা-উত্তর জন-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ১৭৫৭ সাল থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথ ধরে অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট। ১৭৫৭ সালে মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদসহ কতিপয় ব্যক্তির ক্ষমতালিপ্সা, ধনলিপ্সা ও ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি বাংলার শাসনক্ষমতা হস্তগত করে নেয়। ক্রমান্বয়ে তারা গোটা উপমহাদেশের শাসনক্ষমতা দখলের প্রয়াস পেতে থাকে। এক পর্যায়ে তা-ও সম্ভব হয়। বৃটিশ এদেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় বিদ্রোহ, আন্দোলন, প্রতিরোধ যুদ্ধ। বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান মীর কাসেম, মহিশুরের হায়দার আলী, টিপু সুলতান প্রমুখ। ফকির বিদ্রোহ, শাহ আবদুল আজিজ কর্তৃক ভারতকে 'দারুল হরব' (যুদ্ধের দেশ) বলে ফতওয়া দান (১৮০৩), সৈয়দ আহমদ বেরেলবীর মুজাহিদ আন্দোলন (১৮১৮-১৮৩২), তিতুমীরের সংগ্রাম ও বাঁশের কেল্লার যুদ্ধ (১৮২৭), হাজী শরিয়তুল্লাহ ও দুদুমিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থান-সবই ছিলো বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এক একটি বিস্ফোরণ, মুক্তিপিয়াসী মানুষের জাগরণ।

১৯০৫ সালে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ গঠিত হয়। ঢাকা হয় তার রাজধানী। ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। ১৯১১ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। বাংলার মুসলমানদের আশা ভঙ্গ হয়।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হয়ে উঠে। ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেয়। মুসলিম স্বকীয়তা রক্ষায় একধাপ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। ১৯২০ সালে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন। সারা ভারতে বৃটিশবিরোধী মনোভাব ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টিতে এ আন্দোলন প্রভূত অবদান রাখে। পরবর্তী দু'দশকে উপমহাদেশের মুসলমানদের সামনে এটি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে তাদের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষায় পৃথক মুসলিম আবাসভূমি প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করলো। তারই চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সে প্রস্তাবে উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানানো হয়। সে প্রস্তাব অনুসারে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে একটি ও পশ্চিমাঞ্চলে আরেকটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। পরবর্তীতে লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান প্রস্তাব বলে খ্যাত হয়। উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের সামনে একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। সে নির্বাচনে 'পাকিস্তান ইস্যুই' ছিলো মুসলিম লীগের মূল ইস্যু। নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিটি মুসলিম আসন মুসলিম লীগ লাভ করে। প্রাদেশিক মুসলিম আসনসমূহের অধিকাংশ মুসলিম লীগই লাভ করে। পূর্ববাংলায় প্রাদেশিকভাবেও পাকিস্তানের সাপক্ষে জনগণের রায় ঘোষিত হয়। "পাকিস্তান" উপমহাদেশের মুসলিম জনতার দাবীতে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনোত্তর মুসলিম লীগের এক বৈঠকে বাংলার অন্যতম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবক্রমে মূল লাহোর প্রস্তাবের "একাধিক রাষ্ট্র গঠনের" ধারণাটি সংশোধন করে এক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই রাষ্টভাষার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তদানীন্তন ইসলামী আদর্শবাদী সংগঠন তমদ্দুন মজলিশ ও অধ্যাপক (পরবর্তীতে অধ্যক্ষ) আবুল কাসেমসহ কয়েকজন তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করে লেখালেখি ও সক্রিয় প্রচেষ্টা শুরু করেন। ফলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ভাষা আন্দোলন কোনক্রমেই সেক্যুলার কোন আন্দোলন ছিলো না। এটি ছিলো তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবীতে একটি ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিলো প্রাথমিকভাবে ইসলামী ভাবধারা থেকে উৎসারিত।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম লীগের কুশাসন ও কোটারীর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগেরই একদল নেতা ও কর্মী রুখে দাঁড়ান। তাদের প্রচেষ্টা ছিলো কোটারী মুসলিম লীগের মোকাবেলায় একটি গণভিত্তিক মুসলিম লীগ গড়ে তোলা। সে প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন এককালের আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগই ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগে পরিণত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে প্রস্তাবিত প্রথম মেনিফেস্টো হিসেবে জনাব শামসুল হক (যিনি আওয়ামী লীগের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন) 'মূল দাবী' শীর্ষক একটি পুস্তিকা পাঠ করেন। এতে সুস্পষ্ট করে বলা হয় ঃ

"পাকিস্তান খেলাফত অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিকস বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হবে!....." ".....রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতিভু হিসেবে জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকবে। "গঠনতন্ত্র হবে নীতিতে ইসলামী, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।" (দ্রষ্টব্য, বদরুদ্দীন ওমর, ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃঃ ২৪১)। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ঘোষণা ও গঠনতন্ত্রের ১নং ধারায় দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শক্তিশালী করার কথা বলা হয়। গঠনতন্ত্রেরই ১০নং ধারায় বলা হয় To dessiminate true knowledge of Islam and its high morals and religious principles among the people." অর্থাৎ জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান, তার উচ্চ নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় নীতিমালার বিস্তার করা।

কাজেই আওয়ামী লীগ জন্মের সময় ধর্মনিরপেক্ষতা নয় বরং ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুর বিজয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীর মূলনীতি হিসেবে সর্বাগ্রে ঘোষণা করা হয় ঃ "কোরআন-সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।" (দ্রষ্টব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ)। ২১ দফার প্রথম দফাই ছিলো লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। (দ্রষ্টব্য ঃ ঐ, পৃঃ ৩৭৩)।

১৯৫৫ সালের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পক্ষ হতে যে সাংগঠনিক প্রচারপত্র বের হয় তাতে ১৭ ও ১৮ নং দাবী ছিলো ঃ

www.nagorikpathagar.org

"১৭। মদ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।

১৮। মুসলমানগণ যাহাতে নামাজ-রোজা-হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি শরিয়ত সম্মত কাজে অবহেলা না করেন এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকগণের চরিত্র গঠনের জন্যে প্রচার (তবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর জন্যে ও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।" (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ৪১৮-৪২০)।

১৯৬৬ সালে তদানীন্তন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হতে ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করা হয়। উক্ত ছয় দফা স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পিছনে মৌল নির্দেশনা হিসেবে কাজ করেছে। কি ছিলো সেই ছয় দফা। ছয় দফা ছিলো কতিপয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও দাবী। এতে কোন "ধর্মনিরপেক্ষতার" কথা বলা হয়নি। বরং ছয় দফার ১ম দফাটি ছিলো লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের দাবী।

১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-গণআন্দোলনে ছাত্র সমাজের ১১ দফা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত ১১ দফায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও "ধর্মনিরপেক্ষতার" কথা কোথাও বলা হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা দেয়া হয় যে, "কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস করা হবে না।" নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পর তাদের সংবিধান কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় তদানীন্তন "পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার" কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিলো। (দ্রষ্টব্য ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ২য় খন্ড, সংযোজন ১, পৃঃ ৭৯৩)। সেই খসড়া সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছিল ঃ

"(১) কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস করা হবে না, (২) কোরআন ও ইসলামিয়াত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, (৩) মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতা উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।" (দ্রষ্টব্য ঃ ঐ ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৯৪)। কাজেই একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগের জন্ম থেকে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জনগণের সামনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কোন প্রস্তাব বা কর্মসূচী পেশ করা হয়নি। বরং বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভাষায় জনগণকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কুশাসন ও আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন ইসলামের বিপক্ষে কিছু নয় এবং তারা ক্ষমতায় গেলে কোনআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস করা হবে না। তারা কোনআন-সুন্নাহর আলোকে জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকেও গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেবেন। জনগণ ৫৪

www.nagorikpathagar.org

সালে যুক্তফ্রন্টকে, ৭০ সালে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির আশায়, আঞ্চলিক বৈষম্য দুরীকরণের প্রত্যাশায়। জনগণ কোন ক্রমেই ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যে ভোট দেয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে ভোট চাওয়াও হয়নি বরং বিপরীত কথাই বলা হয়েছে। কাজেই আমরা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ছিলো ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়াস (২১ দফা, ৬ দফায় তা-ই বিধৃত হয়েছে)। কোন ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের কথা ছিলো না। এসব পরবর্তীতে সংযোজনের ও আরোপের ফল মাত্র।

এবার আসা যাক, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও পরবর্তী প্রসঙ্গে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের পটভূমি সর্বজনবিদিত। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পর পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠী ও পিপলস পার্টির নেতাদের পক্ষ থেকে এদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে ৭১-এর ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান যে এক ঐতিহাসিক ভাষন দেন এতে আন্দোলন ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর একটি নির্দেশনা পাওয়া গেলেও কোন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সেখানে ছিলো না।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে এক পর্যায়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এদেশের জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। এরপর এক পাকিস্তান কাঠামোতে কোন সমাধান সম্ভব বা বাস্তব ছিলো না। তাই ঘোষিত হয় স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবেরই আক্ষরিক অর্থে বাস্তবায়নের সরাসরি পদক্ষেপ। ২৬ মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বলিত কথিত নির্দেশনা অথবা ২৭ মার্চে জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা কোন কিছুতে ধর্মনিরপেক্ষতা বা এ জাতীয় কিছু ছিলো না বরং উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামী মুল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করা হয়। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায়ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে, In order to ensure for the peoples of Bangladesh equality, human dignitiy and social justice. (দ্রষ্টব্য ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, ৩য় খন্ড, স্বাধীনতা ঘোষণার লক্ষ্য) কোন ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশেষ কোন তন্ত্র-মন্ত্র কায়েম নয়। ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ জনগণের উদ্দ্যেশে যে বেতার ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্যে রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী যেখানে

www.nagorikpathagar.org

মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। গড়ে উঠুক নতুন গণশক্তি কেন্দ্রীক সমাজ ব্যবস্থা, গণ-মানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক জয়বাংলা, জয় স্বাধীন বাংলাদেশ।" (দ্রষ্টব্য ঃ ঐ, পৃঃ ৮)। প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণেও সাম্য, ন্যায় বিচার শোষন মুক্তিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের গোড়ার দিকে কি কথা বলে, কোন চেতনাকে উজ্জীবিত করে দেশের সাধারণ জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিলো তার উৎকৃষ্ট নজির মিলে ১৯৭১-এর ১৪ এপ্রিল অথাৎ আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র চারদিন পর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি যে নির্দেশাবলী প্রদান করা হয় তার মধ্যে। নির্দেশনাবলীপত্রের শীর্ষেই "আল্লাহু আকবর" লিখা হয়। তারপর স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে বলা হয় "বাঙ্গালীর অপরাধ তারা অবিচারের অবসান চেয়েছে, বাঙ্গালীর অপরাধ তারা তাদের মা-বাপ, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততিদের জন্যে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসার দাবী জানিয়েছে, বাঙ্গালীর অপরাধ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট পৃথিবীতে, আল্লাহর নির্দেশমত সম্মানের সাথে শান্তিতে সুখে বাস করতে চেয়েছে। বাঙ্গালীর অপরাধ মহান স্রষ্টার নির্দেশমত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে এক সুন্দর ও সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সংকল্প ঘোষণা করেছে।.....আমাদের সহায় পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য। মনে রাখবেন আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার দুশমন বাঙ্গালী মুসলমান নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা কাউকে হত্যা করতে, বাড়ীঘর লুট করতে, আগুন জ্বালিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। মসজিদে-মিনারে আজান প্রদানকারী মুয়াজ্জেন, মসজিদ গৃহে নামাজরত মুসল্লি, দরগাহ-মাজারে আশ্রয়প্রার্থী হানাদারদের গুলী থেকে বাঁচেনি।...এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অটল থাকুন। স্মরণ করুন ঃ আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "অতীতের চাইতে ভবিষ্যত নিশ্চয়ই সুখকর।" বিশ্বাস রাখুন "আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।" (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ১৯-২২)।

উপরোক্ত নির্দেশাবলীটি ছিলো সাধারণ জনগণের উদ্দেশে। এটি ছিলো প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম নির্দেশনামা। এটি শুরু হয়েছে "আল্লাহু আকবার" দিয়ে। শেষ হয়েছে পবিত্র কোনআনের দুটি আয়াত দিয়ে। এতে রয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথা, এতে রয়েছে "আল্লাহর নির্দেশমত" সম্মানের সাথে সুখে-শান্তিতে, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন, মুক্ত সুন্দর সমাজে বাস করার অঙ্গীকার। এ নির্দেশনামা বিশ্লেষণ করলে ধর্মনিরপেক্ষতা নয় বরং ধর্মের প্রতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসের বিষয়টিই স্বাধীনতার

www.nagorikpathagar.org

মুল্যবোধ ও চেতনা বলে স্বীকৃত হয়। মনে রাখা দরকার, এ নির্দেশটি কোন সরকারী গোপন দলিল ছিলো না। এটি পররাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত কোন কুটনৈতিক সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তি ছিলো না- এটি ছিলো দেশের জনগণের উদ্দ্যেশে। জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে উপযুক্ত পথ নির্দেশনা দেয়ার উদ্দেশে। এটা করা হয়েছে দেশের সাধারণ জনগণের মনোভাব ও ধ্যান-ধারণাকে সামনে রেখে। এতেই ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের গণমুখী গণগ্রাহ্য ও গণসম্পৃক্ত চেতনা। এ চেতনা নিয়েই জনগণ মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছিলো। 'আল্লাহু আকবর', আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা ও কোরআনের বাণী এই ছিলো সেদিনকার মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মর্মকথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শিক চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও ভাবাদর্শ।জনগণকে একথাই বলা হয়েছিলো, জনগণ একথার ভিত্তিতেই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ্য যে,৭৫ পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান কর্তৃক 'ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে "আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস" সংযোজন ১৯৭১ এর ১৪ এপ্রিলের নির্দেশাবলীরই অনুসরণ ও প্রতিফলন মাত্র, ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত যা থেকে জাতিকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো। প্রশ্ন উঠতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বা শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা না থাকলেও আমাদের রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কিভাবে সংযোজিত হলো? মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রবাসী সরকার ঘোষিত হওয়ার পর বাস্তব কারণেই ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করার বিষয়টি ছিলো অতীব প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্যে চিঠি দেয়া হয়। (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ৭৬৯), ঐ চিঠিতে স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার গঠন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখিত হলেও কোন রাষ্ট্রীয় মুলনীতির কথা ছিলো না। ভারত সরকার এ আবেদনে কোন সাড়া দেয়নি। ভারত সরকার যখন স্বীকৃতির ব্যাপারটা নিয়ে বিলম্ব ও গড়িমসি করছিলো তখন ১৫ অক্টোবর ১৯৭১ বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আবার স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে ভারত সরকারের নিকট চিঠি দেয়া হয় এবং সে চিঠিতে বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক বিশেষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়) উপর জুলুম নির্যাতনের বিষয়টি যুক্তি হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে পেশ করা হয়। (দ্রষ্টব্যঃ ঐ, পৃঃ ৮৬৯)। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত সরকার দ্বিতীয় চিঠির প্রতিও কোন সাড়া বা এর কোন জবাব দেয়নি। এদিকে নভেম্বর ৭১-এর মাঝামাঝি চলে যাচ্ছে অথচ ভারত সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত বিচলিত ও হতাশ হয়ে পড়ে। তখন বাংলাদেশ সরকার পরিস্থিতি ও ভারতের প্রকৃত মনোভাব আঁচ করতে পেরে ২৩ নভেম্বর ৭১ তারিখে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় মুলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট

www.nagorikpathagar.org

ঘোষণা দিয়ে ভারত সরকারের স্বীকৃতি লাভের জন্যে বিশেষ অবেদন জানানো হয়। আবেদন জানিয়ে যে চিঠি দেয়া হয় তাতে ভারত সরকারকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, ভারত সরকারের নীতি ও বাংলাদেশ সরকারের নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। তাই ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি না দেয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। ২৩ নভেম্বর প্রদত্ত চিঠিতে ভারতের উদ্দেশ্যে বলা হয় ঃ "You have shown unflinching support to the principles of democracy, secularism, socialism and a nonaligned foreign policy...we should like to reiterate here that what we have already proclaimed as the basic principles of our state policy, i,e democracy, socialism, secularism and the establishment of an egalitarian society....Against this back ground of this community of ideals and principles we are unable to understand why the Government of India have not yet responded to our plea for recognition. (দ্রষ্টব্যঃ ঐ, পৃঃ ৮৯২)। অর্থাৎ "আপনারা (ভারত সরকার) গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রতি অবিচল সমর্থন প্রদর্শন করেছেন। আমরা এখানে একথা পূণঃব্যক্ত করতে চাই যে, আমরা ইতিমধ্যেই গণতন্ত্র. সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেছি। আদর্শ ও নীতিমালার এ পটভূমিতে আমরা বুঝতে অক্ষম যে, স্বীকৃতিদানের নিমিত্তে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধের প্রতি ভারত সরকার এখনও কেন সাড়া দিচ্ছেন না।" উপরোক্ত চিঠির বক্তব্য থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, ভারত সরকারের চাপে এবং ভারত সরকারকে খুশী করার জন্যেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তৎকালীন প্রবাসী সরকারের সঙ্গে বিশেষ করে বিদেশ বিষয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদও তাই বলেছেন। দেখুন, (Maudud Ahmad, Constitutional quest, Era of Sheikh Mujib. P. 96).

বস্তুতঃ মুক্তিযুদ্ধের শুরু বা মধ্যবর্তী স্তরেও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিলো না। ভারত সরকারের চাপে ও এদেশীয় কিছু কিছু গোষ্ঠীর চাপেই মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। দেশের আপামর জনগণ বা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিলো না। হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পররাষ্ট্র দফতরের বা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের কোন কোন তারিখ বিহীন কাগজ পত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সেগুলো কুটনৈতিক বা বিশেষ কোন আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন, জনগণের নয়। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা জনগণের সামনে উপস্থাপিত বিষয়ের পরিপন্থী কোন গোপন বা গোষ্ঠী কার্যক্রম বা কুটনৈতিক প্রয়োজনে

www.nagorikpathagar.org

পেশকৃত কোন বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে কোন মুল্যই বহন করে না। অতএব, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' পুরো বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল না, তা মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক কোন ফসলও নয় এতে জনগণের মনোভাবেরও প্রতিফলন ঘটেনি। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা নিছক বাইর থেকে আরোপিত বিষয়। বৃহত্তম জনগণের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন কোন দল বিশেষ করে 'মস্কোপন্থী' বাম গোষ্ঠীসমূহ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েমের লক্ষ্যেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। কিন্তু বিশেষ কোন গোষ্ঠী বিশেষ কোন মতলবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেই গোটা মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য ও চেতনা মতলববাজ গোষ্ঠীর ইচ্ছে ও ধারণা মতো হয়ে যাবে এমনটা ভাবা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ আমাদের একদল তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে গোটা জাতির ধ্যান-ধারণা বলে চালিয়ে দিতে চান। মনে রাখা দরকার একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলও যদি স্পষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা না বলে বরং অন্য কথা বলে জনগণের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয় সেক্ষেত্রেও সে দলের নিজস্ব দলীয় ধর্মনিরপেক্ষ নীতি-আদর্শ গোটা জাতির নীতি-আদর্শ বলে গৃহীত হতে পারে না, দলীয় উদ্দেশ্যকে গোটা জাতির উদ্দেশ্য বলে চালানো যেতে পারে না। জনগণের সামনে বিঘোষিত নীতি কর্মসূচী ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে জনগণ সম্পৃক্ত ধ্যান-ধারণা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মুল নেতৃত্ব যারা দিয়েছিলেন তারা একথা বলে জনগণের সমর্থন আদায় করেননি, জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে সর্ম্পৃক্ত করেননি যে তারা দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। তারা একথা বলেননি যে, মুসলিম পরিচয়ের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আদর্শ তারা গ্রহণ করবেন। জনগণও স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে ইসলাম ও মুসলিম চেতনাবিরোধী বলে মনে করেনি। তদানীন্তন মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্ব বা প্রবাসী সরকারে পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে জনগণ যাতে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর প্রচারণার কারণে মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের পরিপন্থী বলে মনে না করে। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও জনগণের প্রতি নির্দেশাবলীতে তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। তদুপরি 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' থেকে কোরআন ও হাদিসভিত্তিক আলোচনায় ও কথিকায়ও তার প্রতিফলন ঘটতো। কাজেই যা বলে, যা বুঝিয়ে জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, যার জন্যে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করেছেন তাই হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-অন্য কিছু নয়। বস্তুতঃ পুরো মুক্তিযুদ্ধটাই সংঘটিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ-বঞ্চনা ও আধিপত্যের হাত থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে। একদা এদেশের জনগণ অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে '৪৬ সালে নির্বাচনে বিপুল ভোট প্রদান

www.nagorikpathagar.org

করে ৪৭ মাসে যে পাকিস্তান অর্জন করেছিলো প্রথমে তারা চেয়েছিলো সেই পাকিস্তান কাঠামোর ভিতরেই তাদের সার্বিক সমস্যার সমাধান। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তান কাঠামোর ভিতরে এবং লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যাবতীয় বিশ্বাসঘাতকতা, জুলুম-নির্যাতন-শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে প্রয়াস চলেছে। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যখন দেখা গেলো তা সম্ভব নয় তখনই স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। তদুপরি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যখন জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবীর বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তখন ঐ নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে গণযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তা সুস্পষ্টভাবে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়। এ যুদ্ধ ছিলো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই। এ ছিলো বাঁচার সংগ্রাম, অস্তিত্বের লড়াই। এ ছিলো বৈষম্য, শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তির সংগ্রাম। এ ছিলো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াই। এ ছিলো ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব যথার্থ অর্থে বাস্তবায়নের প্রয়াস। এ ছিলো তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। কাজেই এ যুদ্ধের পটভূমি, এ যুদ্ধের প্রকৃতি ও লক্ষ্যই বলে দিচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তি, ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অবসান, জনগণের সমর্থিত সরকার প্রতিষ্ঠা। এ জন্যই জনগণ যুদ্ধ করেছিলো। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এদেশবাসী ১৯০৫, ১৯৪০, ৪৬, ৫২, ৫৪, ৬৯, ৭০ এবং ৭১ সালে যে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলো তা ছিলো ধারাবাহিক ও বিবর্তনধর্মী একটি চেতনা। ১৯০৫ সালের ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার চূড়ান্ত রাজনৈতিক পরিণতিই আজকের বাংলাদেশ। ৬৬ বছরের ধারাবাহিক সংগ্রাম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই ৭১-এ তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। কাজেই 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' কথা বলে এদেশবাসীকে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয় থেকে, ইসলামের অনুশীলন থেকে দূরে সরানোর প্রয়াস একটি আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। এ ষড়যন্ত্র জনগণ প্রতিরোধ করেছে এবং ভবিষ্যতে ও করবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, যারা আজো 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বলতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বুঝেন, জনগণের আশা-আকঙ্খার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা জনচেতনা বিচ্ছিন্ন। জেনে হোক না জেনে হোক তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদের ক্রীড়নক। তারা দেশ ও জাতির আদর্শ, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনার বিপক্ষ শক্তি।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে জনগণের চেতনাবিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো ৭৫-এর পর স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক জিয়াউর রহমান ১৪ এপ্রিল ৭১-এর 'সরকারী নির্দেশনাবলীর আদর্শিক প্রেরণার প্রতিফলন ঘটিয়ে

www.nagorikpathagar.org

সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নীতির পরিবর্তে "আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের নীতি," প্রতিস্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে সমুন্নত করেন। শুধু ৭৫-এর পরবর্তী সময়েই নয় বরং ৭২-৭৫ পর্যন্ত শেখ মুজিব আমলেও তা উপেক্ষা করা একদম সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ ভারতীয় চাপে ও আভ্যন্তরীণ কিছু গণবিরোধী লবির চাপে ৭২-এর রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভূক্ত হলেও স্বয়ং মুজিব সরকার জনগণের মনোভাব ও সেন্টিমেন্ট বুঝতে পেরে জনমত শান্ত ও নিজেদের শাসনকে জনগণের কাছেগ্রহণীয় করার জন্যে এবং সংবিধানের ঐ 'ধর্মনিরপেক্ষতার' প্রশ্নে জনগণের বিরূপ মনোভাব প্রশমিত করার লক্ষ্যে মুজিব সরকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক ইসলামীবিরোধী কট্টর লবির বিরোধিতা এবং চাপ সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আনুকুল্যে মাদ্রাসা ব্যবস্থা চালু রাখেন। স্বয়ং শেখ মুজিব ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন, মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেন। বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানে মিলাদের আয়োজন করেন। সরকারী মন্ত্রীরা বিভিন্ন ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকেন এবং জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তারা ধর্মের পক্ষেই আছেন, তারা ধর্মহীন নন। বস্তুতঃ শেখ মুজিব সরকার ধর্মের বিপক্ষে নয় বরং ধর্মের পক্ষেই-এটা প্রমাণের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো হয়। এমনকি ৯২-তে এসে শেখ মুজিবের কন্যা, আওয়ামী সভানেত্রী স্বয়ং শেখ হাসিনা 'মুজিব আমলের পদক্ষেপসমূহ ইসলামী আদর্শভিত্তিক ছিলো'-এ দাবী পর্যন্ত করেছেন। ঈদুর ফেতর উপলক্ষে এক বাণীতে শেখ হাসিনা বলেন ঃ ইসলামের সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও সাম্যের বাণী সামনে রেখেই বঙ্গবন্ধু শোষণহীন সমাজ কায়েমের পদক্ষেপ নেন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ; ৯২) তার পরেও যদি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বলতে কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাকে বুঝেন, ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীনতাকে বুঝেন, তাহলে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ ছাড়া কিছু করার নেই। মুলতঃ যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামকে পরস্পর বিপরীত বলে দাবী করতে চান তাদের এ দাবী অযৌক্তিক, প্রমাণহীন, গণচেতনা ও আসল সত্য বিরোধী। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ হচ্ছে আরোপিত বিষয়, আধিপত্যবাদের চাপানো ফল। আজো একদল রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী এ চাপিয়ে দেয়া আরোপিত 'চেতনা'কে বহন করে চলছেন। উপেক্ষা করে চলছেন প্রকৃত চেতনাকে। বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছেন নতুন প্রজন্মকে। তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হলে দেশ ও জাতির কল্যাণ হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা আধিপত্যবাদী স্বার্থের সেবাই হবে। জাতি এসব বিভ্রান্তির অবসান চায়। বিভ্রান্তির আবর্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে সমুদ্ভাসিত দেখতে চায়।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের স্বাধীনতার গ্যারান্টি

আমাদের স্বাধীনতা অনেক সংগ্রামের ফসল। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু যারা আমাদের ভালো চায় না, যাদের রয়েছে আগ্রাসী মনোভাব, তারা আমাদের স্বাধীনতাকে করছে নিত্য হুমকির সম্মুখীন। যাবতীয় হুমকির মুকাবিলা করে আমাদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে, অর্থবহ করতে হলে প্রয়োজন সে লক্ষ্যে সমন্বিত জাতীয় প্রয়াস। আর সে প্রয়াস তখনই জোরদার হবে যখন এ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতা গড়ে উঠবে। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও সচেতনতার জন্যে, একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক জাতির সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা একটি ব্যাপক ও গতিশীল প্রত্যয়। যুগের পরিবর্তনে, সময়ের ব্যবধানে স্বাধীনতার ধারণায় এসেছে বিবর্তন। এসেছে সুনির্দিষ্টতা, গড়ে উঠেছে ব্যাপকতা। আজ স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি অতীতে বা মধ্য যুগে হুবহু তা ছিলো না। জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠার আগে স্বাধীনতাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হতো, আজ ঠিক তা করা হয় না। গোত্র বা নগর রাষ্ট্রের যুগে স্বাধীনতা যে অর্থে ছিলো আজকের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বাধীনতা সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ক্ষেত্র বিচারেও স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ রয়েছে- যেমন, ব্যক্তির স্বাধীনতা, গোষ্ঠীর স্বাধীনতা, কোন দেশ বা অঞ্চলের স্বাধীনতা বা কোন জাতির স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পুরো বিষয়টি যুগে যুগে আপেক্ষিক রূপ ধারণ করেছে। মূল্য বিচার স্বাধীনতার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। মূল্য বিচারের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে জাতীয়তাবোধ-জাতিসত্তার উপলব্ধি। আবার এ বোধ নিশ্চল কোন বিষয় নয়। সময়ের আবর্তনে, কালের ব্যবধানে, পরিস্থিতির বিবর্তনে, আদর্শিক পরিবর্তনে জাতীয় চেতনা ও একাত্মতাবোধে পরিবর্তন আসতে পারে। সময়ের এক স্তরে যে অবস্থান স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে বা অনুভূত হবে অন্য স্তরে সে অবস্থানকেই পরাধীনতা বলেও বিবেচনা করা হতে পারে। মোটকথা, যুগ, পরিস্থিতি, আদর্শিক দৃষ্টিকোণ, মূল্যমান, জাতিবোধ ইত্যাদি পরিবর্তনে স্বাধীনতার ক্ষেত্র ও প্রয়োগও বিভিন্ন হতে পারে। তাই বিশেষ কোন সময়ের ধারণা বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী অন্য সময়ের অবস্থানকে মূল্যায়ণ করা সমীচীন নয়। এতে ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও ভুল মূল্যায়নের

www.nagorikpathagar.org

সম্ভাবনা বেশি। বর্তমান স্বাধীনতা প্রত্যয়টি যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে ভৌগোলিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা এমনকি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ধারণাও নিহিত রয়েছে। এক কথায়, একটি সুনির্দিষ্ট জাতি (বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে) যদি তার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্য জাতির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকে এবং সে জাতি তার ভৌগোলিক পরিসীমানায় নিজস্ব কর্তৃত্ব আইনানুগভাবে ও কার্যত প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় তখনই তাকে বলি আমরা স্বাধীনতা।

বাহ্যত ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বাধীনতার প্রাথমিক রূপ হলেও প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সে জাতির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও লাভ করতে হবে। স্বাধীনতার পূর্ণতা আসবে তখনই যখন একটি জাতি যেমন ভূগোল বিচারে এবং রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক বিচারে এবং অর্থনৈতিকভাবেও স্বাধীন হবে।

জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি

স্বাধীনতার তিনটি মূল ভিত্তি রয়েছে ঃ

ক. জাতীয়তাবোধ ও একাত্মতাবোধ ঃ একটি জাতি যখন নিজেকে একটি নির্দিষ্ট জাতিরূপে ভাবতে শুরু করে, স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে তখন থেকেই স্বাধীনতার অনুভূতির উণ্মেষ ঘটে এবং তা যত প্রবল হবে ততই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জোরদার হবে।

খ. দেশাত্মবোধ বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রতি একাত্মতা ঃ অর্থাৎ কোন দেশ বা ভৌগোলিক এলাকাকে যখন কোন জাতি নিজের দেশ বা আবাসভূমি বলে বিবেচনা করে এবং এ বোধ তীব্র হয়ে উঠে তখনই স্বাধীনতার প্রশ্নটি প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

গ. নির্দিষ্ট দেশের উপর নির্দিষ্ট জাতির কর্তৃত্ব প্রয়োগের আইনানুগ অধিকার স্থাপন ও কার্যত তা প্রয়োগে সমর্থ ঃ একটি জাতি যখন তার মালিকানাধীন দেশের ভূ-খন্ডে তার কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের আইনানুগ অধিকার ও বাস্তব ক্ষমতা লাভ করে এবং কার্যতঃ তা প্রয়োগে সমর্থ হয় তখনই আমরা সে জাতিকে স্বাধীন বলি। কর্তৃত্ব- ক্ষমতা ছাড়া স্বাধীনতা হয় না। কাজেই একটি জাতির স্বাধীনতা তখনই অর্জিত হয় যখন সে জাতি নিজেকে পরিচালনা করার অধিকার ও বাস্তব কর্তৃত্ব অর্জন করে।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুত নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর পরস্পর একাত্মতাবোধ, নির্দিষ্ট কোন আবাসভূমির অধিকার এবং সে আবাসভূমিতে সে জাতির আইনানুগ ও বাস্তব কর্তৃত্ব লাভের নামই হচ্ছে স্বাধীনতা। এক কথায় স্বাধীনতার মৌল ভিত্তিরূপে কাজ করে জাতি, দেশ ও সার্বভৌমত্ব (রাজনৈতিক অর্থে)।

স্বাধীনতার মৌল উপাদান

আমাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখার ভিত্তিরূপে কতকগুলো মৌল উপাদান রয়েছে, যেগুলো ছাড়া এদেশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা যাবে না। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১. প্রকৃত জাতীয় চেতনাবোধ ঃ একটি জাতি যে ভিত্তিতে গড়ে উঠে সে ভিত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্টতা ও এসব ভিত্তির প্রতি একাত্মতা জাতির টিকে থাকার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। আমাদের জাতি গঠনের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রধানত তিনটি ঃ (ক) ধর্ম (খ) ভূগোল (গ) ভাষা। অর্থাৎ আমাদের রয়েছে পরস্পরযুক্ত তিনটি পরিচয়- মুসলিম, বাংলাদেশী ও বাঙালী পরিচয়। এ তিনের সমন্বয়েই আমাদের জাতি-সত্তা আমাদের জাতি পরিচয়। এ তিন পরিচয়ের যে কোন একটিকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করলেই আমাদের জাতি পরিচয় খন্ডিত হয়ে পড়বে। সৃষ্টি হবে বিভ্রান্তি। তাই আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্যেই এ ত্রি-মাত্রিক জাতীয় চেতনাবোধ অপরিহার্য। আমাদের জাতির ভিত্তিই হচ্ছে যুগপৎ এ তিনটি বিষয়। বস্তুত আমাদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে এ তিনটি বিষয়কেও যুগপৎ লালন করতে হবে।

২. জাতীয় আদর্শ ঃ একটি জাতির গঠন, বিবর্তন, বিকাশ, পরিচয় স্বাতন্ত্র্য ও গতি প্রধানত নির্ভর করবে জাতীয় আদর্শের উপর। জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ করে জাতির গতিপথ। জাতির চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণও করে দেয় জাতীয় আদর্শ। জাতীয় আদর্শ জাতিকে সঞ্জিবিত করে, সচল রাখে, সমৃদ্ধি দেয়। কাজেই জাতীয় আদর্শ ছাড়া জাতি দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে পারে না।

আমাদের জাতীয় আদর্শ কি? আমাদের জাতি পরিচয়েই জাতীয় আদর্শের প্রশ্নটি নিহিত। বিগত হাজার বছরে আমাদের জাতি যেভাবে বিকশিত হয়েছে তাতে ইসলামই যে মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ইসলামের আগমনের পর এদেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলামকে গ্রহণ করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে-তাদের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যমরূপে। পুরানো পরিচয়কে ভুলে গিয়ে তারা ইসলামের মধ্যেই খুঁজেছে

www.nagorikpathagar.org

তাদের মুক্তি। আদর্শরূপে তারা বরণ করে নিয়েছে ইসলামকেই। এদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, ভাষার বিবর্তন, এমনকি ভৌগোলিক বিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে মুসলিম বোধ। সংস্কৃতের মুকাবিলায় বাংলা ভাষাকে এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীই লালন করেছিল। মুসলিম পরিচয়ের ভিত্তিতেই তদানীন্তন পূর্ব বাংলা গড়ে উঠেছিল। মুসলিম পরিচয়কে সামনে রেখেই বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। আর সে বিবর্তনের পথ বেয়েই আজকের বাংলাদেশ। কাজেই ইসলাম এখানকার রাজনৈতিক চেতনাবোধের নিয়ামক শক্তি। তদুপরি এদেশের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য চেতনা, সংস্কৃতিবোধ, জীবনাচরণ সর্বক্ষেত্রে ইসলাম মুখ্য শক্তি। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাও ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই এদেশের জাতীয় আদর্শ যে ইসলাম তাতে অস্পষ্টতার কিছু নেই।

৩. অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা ঃ একটি দেশের স্বাধীনতার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা। দেশটি যদি অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে তার স্বাধীন অস্তিত্ব দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে। জাতীয় জীবনে বলিষ্ঠতা আনয়নে ও দৃঢ়তা সৃষ্টিতে সর্বোপরি স্বাধীনভাবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে অর্থনৈতিক শক্তি ও আত্মনির্ভরশীলতা অপরিহার্য।

আমরা এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারিনি। তাই আমাদের জাতি, দেশের জনগণ স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগে আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী তাদের নানা চক্রান্ত। এই জন্য আমাদেরকে একটি স্বাধীন সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে হলে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

৪. ঐক্য ও সংহতি ঃ জাতীয় স্বাধীনতা নির্ভর করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উপর। ঐক্য ছাড়া কোন জাতি টিকতে পারে না। ঐক্য ও সংহতিই জাতীয় জীবনে এনে দেয় শক্তি, দৃঢ়তা ও গতি।

এদেশের মানুষের ঐক্য ও সংহতির জন্যে ইসলামকেই প্রধান ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম ছাড়া এমন কোন মুখ্য উপাদান নেই যার মাধ্যমে জাতির মধ্যে প্রচণ্ড ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা সম্ভব। তাই ইসলামের ভিত্তিতে এদেশে এক ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারে, যা আমাদের স্বাধীনতার জন্যে অপরিহার্য শর্ত।

www.nagorikpathagar.org

৫. দেশ প্রেম ও জাতীয় আদর্শের প্রতি অনুগত সরকার ঃ সরকার হচ্ছে একটি জাতির প্রতিনিধি। তাই সরকার যদি দেশপ্রেমিক না হয় তাহলে জাতির স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে পারে না। সরকারের ভূমিকার উপর স্বাধীনতা স্বকীয়তা অনেকাংশে নির্ভরশীল। একটি দেশপ্রেমিক ও জাতীয় আদর্শের প্রতি অনুগত সরকার ছাড়া দেশকে স্বাধীন রাখা, সমুন্নত করা সম্ভব নয়। যে সরকার জাতির প্রতি, জাতীয় আদর্শের প্রতি অনুগত নয়, যে সরকার জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী, দেশের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করে সে ধরনের সরকারের অধীনে একটি জাতির বিকাশ ও স্বাধীনতা অর্থবহ ও সমুন্নত হতে পারে না। তাই সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও জাতীয় আদর্শের প্রতি অনুগত সরকার দেশের জন্যে একান্ত অপরিহার্য।

৬. আত্মবিশ্বাস ও মনোবল ঃ স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে, যে কোন আগ্রাসনের মুকাবিলায় স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে হলে প্রয়োজন হচ্ছে জনগণের প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস ও মনোবল। আত্ম প্রত্যয় ছাড়া কোন জাতি স্বাধীন থাকতে পারে না। আর আত্মপ্রত্যয়ী অনড় মনোবলের অধিকারী কোন জাতিকে দমিয়ে দেয়া যায় না। আত্মপ্রত্যয় থেকেই আসে আত্মোৎস্বর্গী মনোভাব এবং কার্যত সৃষ্টি হয় যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা। জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে এসব হচ্ছে অতীব জরুরী। তাই একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি করতে হবে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস ও আত্মোৎস্বর্গী মনোভাব। আর ইসলাম ও ঈমানের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হতে পারে এ জাতির সত্যিকার আত্মবিশ্বাস ও প্রচণ্ড মনোবল।

স্বাধীনতার প্রতি হুমকি

আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নানাভাবে ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্যে, স্বাধীনতার সুফল থেকে জাতিকে বঞ্চিত করার জন্যে নানামুখী অশুভ তৎপরতা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এসব তৎপরতা মুকাবিলা করে দেশের স্বাধীনতাকে সমুন্নত করার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে স্বাধীনতার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী ঐসব তৎপরতা, অপশক্তি ও ষড়যন্ত্রকে চিহ্নিত করা। যে সমস্ত অপতৎপরতা ও অপশক্তি আমাদের স্বাধীনতার প্রতি নিত্য হুমকি সৃষ্টি করছে সেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্তগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

১. আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র ঃ আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক ও গভীর হুমকি হচ্ছে আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র। আমাদের স্বাধীনতাকে স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করার জন্যে

www.nagorikpathagar.org

আধিপত্যবাদী শক্তি দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের তৎপরতা দুভাগে বিভক্ত করা যায়- এক, সরাসরি চাপ ও আগ্রাসী তৎপরতা, দুই, পরোক্ষ ষড়যন্ত্র। আধিপত্যবাদী শক্তি আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও আঞ্চলিক অখন্ডত্বের বিরুদ্ধে নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষিণ তালপট্টি, বিভিন্ন ছিটমল ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তারা আমাদের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডত্বের উপর হুমকি সৃষ্টি করছে। ফারাক্কাসহ অভিন্ন প্রায় ৫৪টি নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার পায়তারা করছে। দেশের সম্পদ ও পরিবেশকে আমাদের অর্থনীতির প্রতিকূলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের জনগণ ও পরিবেশের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। তাছাড়াও অন্যান্য নানা পন্থায় আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে দেয়ার অপপ্রয়াস চলছে। এক কথায় আধিপত্যবাদী শক্তি তাদের হীন আধিপত্য আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা করছে।

২. সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ঃ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরাও আমাদের ভালো চায় না, চাইতে পারে না। দ্বিতীয় বৃহত্তম একটি মুসলিম দেশ বাংলাদেশের ব্যাপারে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের শ্যেন দৃষ্টি। এদেশ যাতে স্বকীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি স্বাধীন অর্থনীতি ও রাজনীতি গড়ে তুলতে না পারে তার জন্যে তাদের ষড়যন্ত্রের অন্ত নেই। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা চায় না আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত ফল ভোগ করি। আত্মনির্ভরশীল মুসলিম জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে উঁচু করে দাঁড়াই। আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই তারা নানাভাবে হস্তক্ষেপ ও চাপ সৃষ্টি করছে।

৩. অর্থনৈতিক আগ্রাসন ঃ একটি দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে সে জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া। তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে না দেয়া। এমনিতেই আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। এই দরিদ্র দেশটি যাতে অর্থনৈতিক দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠতে না পারে তার জন্যে আধিপত্যবাদী শক্তি নানাভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ফারাক্কা বাধ নির্মাণ এ গভীর ষড়যন্ত্রেরই প্রমাণ। অর্থনীতির উপর ফারাক্কার ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে। পশ্চিমা শক্তিগুলো আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগে আমাদের স্বার্থবিরোধী নীতি-পলিসী ও সিদ্ধান্ত আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আমরা যাতে অর্থনৈতিকভাবে একটি স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল জাতিরূপে গড়ে উঠতে না পারি তার জন্যে তারা

www.nagorikpathagar.org

চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের দেশকে তাদের পণ্যের বাজার বানাতে চায়। তারা চায় আমরা যেন সব সময় পরনির্ভরশীল হয়ে থাকি।

৪. বিদেশী সাহায্য-নির্ভর অর্থনীতি ঃ আমাদের অর্থনীতি বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর। এখন আমাদের উন্নয়ন বাজেটের বেশীর ভাগ বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় একটি জাতি প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পেতে পারে না। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থেকে স্বাধীন জাতির স্বাধীন বিকাশ অসম্ভব ও অবাস্তব। বিদেশ-নির্ভরতা আমাদের স্বাধীন মূল্যবোধ, স্বাধীন চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবেই। এক কথায় বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থেকে কোন দেশের স্বাধীনতা অর্থবহ নিশ্চিত ও শক্তিশালী হতে পারে না।

৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা ঃ আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও পুষ্টির জন্যে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অব্যাহতভাবে বিরাজমান থাকা দরকার। আমাদের দেশে কার্যতঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। দেশে উল্লেখযোগ্য কোন সাম্প্রদায়িক দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধীরা বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সপ্রীতিকে নস্যাৎ করে দেশে এক ভীতিকর পরিস্থিত সৃষ্টির পায়তারা করছে। আমাদের উন্নয়ন ও অস্তিত্বের জন্যে, আমাদের স্বাধীনতাকে সংহত করার জন্যে দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে অব্যাহত রাখা ও জোরদার করা প্রয়োজন।

৬. বিদেশের সেবাদাসদের অপতৎপরতা ঃ একটি দেশের স্বাধীনতার প্রতি মারাত্মক হুমকি হচ্ছে সে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের অনুগত এজেন্ট সৃষ্টি এবং তাদের অশুভ তৎপরতা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এমন শক্তি রয়েছে যারা দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ও স্বার্থের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত নয়। তারা বিদেশী স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের জন্যে তারা নিজ দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিতেও প্রস্তুত। আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের এসব সেবাদাসদের অপতৎপরতা প্রতিরোধ ছাড়া দেশের স্বাধীনতা অর্থবহ করা সম্ভব হবে না।

৭. দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র ঃ আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও বিকাশ, ভৌগোলিক সীমানা ও অখন্ডত্ব, আমাদের স্বাতন্ত্র্য সব কিছুরই মুখ্য ভিত্তি হচ্ছে আমাদের মুসলিম পরিচয়, ইসলামের প্রতি আমাদের ব্যষ্টিক ও

www.nagorikpathagar.org

সমষ্টিক আনুগত্য। আমাদের ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অস্তিত্বের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে আমাদের ইসলামী চেতনাবোধ। তাই ইসলামকে এ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ইসলাম বিবর্জিত রাষ্ট্রীয় ভাবধারা তথা সেকুলারিজম এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিকাশের পথে তীব্র বাধা। তাই ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা বা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সাবভৌমত্ব নিরাপদ নয়। যারা দেশের ৯০ ভাগ জনগণের আদর্শের প্রতি, ধর্মের প্রতি অনুগত নয়, যারা জনগণের আদর্শ বোধের প্রতি আন্তরিক নয় তারা কার্যত আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম উপাদানকে ধ্বসিয়ে দেয়ার কাজ করছেন। তাদের তৎপরতা আমাদের স্বাধীনতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। আধিপত্যবাদী শক্তির হাতকে শক্তিশালী করছে। দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বানিয়ে রাখার তৎপরতা মূলত দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতি সৃষ্টি করছে নিত্য হুমকি।

৮. **নিছক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রসার ঃ** আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে ভূগোল, ধর্ম ও ভাষা তিনটিই ওৎপ্রোতোভাবে জড়িত। তিনটি উপাদান নিয়েই আমাদের জাতীয় পরিচয়। এই তিনটি উপাদানের সমন্বিত রূপ ছাড়া আমাদের জাতি পরিচয় পূর্ণ হয় না, আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিশ্চিত হয় না। এখন যদি কেউ জাতি-গঠনের তিনটি ভিত্তির মধ্য থেকে শুধু ভাষাকেই গ্রহণ করেন এবং এর ভিত্তিতেই জাতি-সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করেন তাহলে আমাদের জাতিসত্তা হয়ে পড়বে খন্ডিত, অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। এতে আমাদের জাতিসত্তা হবে এক প্রচণ্ড বিভ্রান্তির শিকার। শুধু বাঙালী বললে আমাদের বর্তমান ভূগোলের সঙ্গে এর সংঘর্ষ অনিবার্য। শুধু বাঙালীত্ব-বাঙালী জাতীয়তাবাদ আমাদের সীমানার নিরাপত্তা দেয় না বরং অন্য সীমানায় মিশে যাওয়ার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেয়। শুধু বাঙালীত্ব আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস এবং বিবর্তনের ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে না। যে বিবর্তনের ধারায় আমরা আজ স্বাধীন সেখানে আমাদের ভাষা পরিচয়ের সাথে একাত্ম হয়ে আছে আমাদের আদর্শিক ও ভূগোল পরিচয়। আবার আমাদের ভূগোলের সাথে আমাদের ধর্ম ও আদর্শ সরাসরি সম্পৃক্ত। এক কথায় আমাদের ভূগোল ও ধর্মকে বাদ দিয়ে আমাদের স্বতন্ত্র পরিচয় অবান্তর। তাই শুধু বাঙালী জাতীয়তাবাদ আমাদের স্বাধীনতার অনুকূল পরিচয় নয়।

৯. **এনজিওদের অপ তৎপরতা ঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশী তহবিল নিয়ে প্রায় বারোশ দেশী বিদেশী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য বাহ্যত

www.nagorikpathagar.org

সেবা ও উন্নয়ন হলেও এদের একাংশের আসল মতলব অন্যরূপ। এরা আমাদের আদর্শ-ধর্ম সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত। এরা সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি। এরা দেশের উপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তারা দেশের প্রশাসন, রাজনীতি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করছে। সরকারের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে, তারা তাদের নীতি-পলিসী আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এরা আমাদেরকে একটি স্বাধীন জাতিরূপে টিকে থাকতে দিচ্ছে না। এনজিওরা অনেক ক্ষেত্রেই একটি সমান্তরাল উন্নয়ন প্রশাসন গড়ে তুলে সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণে ব্যস্ত। এনজিওরা দেশের রাজনীতির উপরও নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। মোটকথা, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে একশ্রেণীর এনজিও তৎপরতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তৎপরতার সাথে সাদৃশ্যাত্মক। একদা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এসেছিলো ব্যবসার নামে। গ্রাস করেছিল আমাদের স্বাধীনতা। এনজিওরা এসেছে সেবার নামে। একই কায়দায় একই কৌশলে এরা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের হাতে আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা নিরাপদ নয়। এদের অপতৎপরতা আমাদের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার প্রতিকূল। এরা আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বের ভিত্তিমূলকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। তাই এরা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি।

১০. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ আমাদের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার প্রতি বড় ধরনের হুমকি হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এ আগ্রাসন দুদিক থেকে আসছে। একটি ভারত থেকে অন্যটি পশ্চিমা জগত থেকে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসী শক্তি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমাদের স্বকীয়তাকে নস্যাৎ করার প্রয়াস পাচ্ছে। তারা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে দুর্বল ও কোনঠাসা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এরা আমাদের সাংস্কৃতিক বাজার দখল করতে চায়। এরা আমাদের স্বকীয় চেতনা থেকে জাতিকে বিচ্যুত করতে চায়। আর এভাবেই তারা আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তিমূল দুর্বল করে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মূলত তারা জাতির মূল ধারাকেই নস্যাৎ করে দিতে চায়। একবার যদি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সফল হয় তাহলে পরিণামে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যই নড়বড়ে হয়ে যায় যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই একটি জাতির স্বাধীনতার প্রতি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সব সময় বড় ধরনের হুমকি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশও এমনি এক প্রচন্ড সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখোমুখি। এর কার্যকর প্রতিরোধ ও মুকাবিলা না হলে স্বাধীনতার জন্যেই বিপদ ডেনে আনতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

হুমকি মুকাবিলায় করণীয়

দেশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে, যাবতীয় হুমকির মুকাবিলায় জাতীয় স্বাধীনতার বিকাশ দান করতে হলে, দেশ ও জাতির জন্যে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দিকে আমাদের গুরুত্বারোপ করা একান্ত প্রয়োজন ঃ

১. প্রকৃত জাতিসত্ত্বার বিকাশঃ আমাদের ত্রিমাত্রিক উপাদান বিশিষ্ট জাতি সত্তার বিকাশ ও প্রসার প্রয়োজন। আমাদের ভূগোল, ধর্ম ও ভাষা কেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যে জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে তার বিকাশ ছাড়া আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে না। তাই সমন্বিত জাতি সত্তার বিকাশ ও প্রসার প্রয়োজন।

২. জাতীয় আদর্শের অনুশীলন ও বিকাশ ঃ ইসলাম আমাদের জাতীয় আদর্শ। ইসলামের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে এ জাতির বিকাশ সম্ভব। এ জাতির স্বাধীনতাও নিশ্চিত হবে ইসলামের মাধ্যমেই। ইসলামকে বাদ দিলে এ জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। তাই এ জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজনে অনিবার্যভাবেই ইসলামের অনুশীলন ও বিকাশ প্রয়োজন। ইসলামের প্রতি আনুগত্য আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে মজবুত করবে, জাতীয় জীবনে গতি সঞ্চার করবে, জাতিকে সুনির্দিষ্ট অবয়ব দান করবে।

৩. অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি ঃ আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে, স্বাধীনভাবে মাথা উচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা কখনই অর্থবহ হবে না। আমাদের পক্ষে একটি মর্যাদাবান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বেঁচে থাকাটাও কঠিন হয়ে পড়বে। তাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যে আমাদেরকে সম্ভাব্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ব্যবস্থা ঃ আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার অন্যতম ষড়যন্ত্র হচ্ছে দেশের বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী যে কোন তৎপরতা রোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে যারা ঘোলা পানিতে আমাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করতে চায়এসব অপশক্তিকে কঠোরভাবে

www.nagorikpathagar.org

রোধ করতে হবে। যারা ইসলামের প্রতি আনুগত্যকে সাম্প্রদায়িকতা বলে প্রচার করছে তারাই মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী শক্তি। এসব শক্তিকে রুখতে হবে। এক কথায় দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং সংখ্যালঘুদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করতে হবে।

৫. এনজিওদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রন ঃ এনজিওদের যেসব তৎপরতা ও কার্যক্রম দেশ ও জাতির জন্যে অশুভ ও ক্ষতিকর তা অবশ্যই রোধ করতে হবে। এনজিওদের তৎপরতা যাতে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে যেতে না পারে বা এনজিওরা যাতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সহযোগী হতে না পারে তার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এক কথায়, এনজিওদের নিয়ন্ত্রণ ও সেবা কর্মের মধ্যে তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। সেবার নামে যাতে কোন এনজিওই দেশ-ধর্ম-জাতিবিরোধী তৎপরতা চালাতে না পারে তার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করা ঃ আমাদের জাতি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর অঙ্গ। তাই উম্মাহর অংশ হিসেবে মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে হবে ঘনিষ্ঠ ও জোরদার। দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি চায় না যে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হোক। অথচ মুসলিম বিশ্বের সাথে গভীর সম্পৃক্তি আমাদের স্বকীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক যত গভীর হবে ততই আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন অস্তিত্ব আরো জোরদার হবে। বিশেষ করে আধিপত্যবাদী শক্তির মুকাবিলায় মুসলিম উম্মাহ চেতনা আমাদেরকে আত্ম শক্তিতে বলিয়ান করবে। আমাদের জাতীয়তাবোধে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার করবে।

৭. আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ঃ যাবতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের মুকাবিলায় আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিশ্চিত করতে হলে আগ্রাসী ও আধিপত্যবাদী শক্তি ও তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে। এ সবের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আর তার জন্যে আধিপত্যবাদের ষড়যন্ত্রের জাল তাদের সামনে উন্মোচন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৮. বিদেশের সেবাদাসদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের তৎপরতা রোধ করা ঃ যারা এদেশে বসে বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষা করছে, যারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালাচ্ছে তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন, এদের আসল রূপ জনগণের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। তাহলেই এদের অশুভ তৎপরতাকে রোধ করা যেতে পারে। আর যদি এসব অপশক্তিকে চিহ্নিত না করা হয় তাহলে জনগণের অলক্ষ্যে বিনা বাধায় তারা তাদের দেশ-ধর্ম-জাতি তথা স্বাধীনতা বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। তাই যেসব গোষ্ঠী বা শক্তি এদেশে আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যেবাদের এজেন্ট তাদের স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এদের প্রতিরোধ করতে হবে।

৯. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ আন্দোলন ঃ আমাদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুকাবিলায় আমাদেরকে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এক সার্বিক সাংস্কৃতিক উজ্জীবন ঘটাতে হবে। এক ব্যাপকভিত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। স্বকীয়তা সংরক্ষণ ও বিকাশদানের লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক প্রয়াস। যাবতীয় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে তীব্র ও কার্যকর প্রতিরোধ। নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন বোধের বিকাশ ঘটাতে হবে সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গনে। তাহলেই সম্ভব সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করে আমাদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা।

১০. স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ ঃ স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে আমাদের সাধ্যমতো সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ প্রস্তুতি হবে বহুমুখী। এ হবে ভাবাদর্শগত, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক সব ধরনের। সার্বিক প্রস্তুতি ছাড়া কোন দেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্যেও জনগণকে প্রস্তুত করতে হবে। জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও মনোবল। জনগণের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে দুর্ভেদ্য ঐক্য ও সংহতি। ঐক্য ও সংহতি ছাড়া স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অবাস্তব। মোটকথা, স্বাধীনতা রক্ষা ও অর্থবহ করার জন্যে দেশের আপামর জনগণকে প্রস্তুত করতে হবে।

১১. মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা লালন ঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের অন্যতম নিয়ামক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে কোন কোন

www.nagorikpathagar.org

মহলে বিভ্রান্তি রয়েছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে সেক্যুলার ভাবধারা বুঝাতে চায়। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন কোন সেক্যুলার ভাবধারা নয়। কোন ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়। বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তি হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। যে কোন আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এ চেতনাই আজ লালন করতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে।

ইসলামই স্বাধীনতার গ্যারান্টি

উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হলো যে আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তিমূলে যেমন রয়েছে ইসলামী চেতনাবোধ তেমনি আমাদের স্বাধীনতার রক্ষা কবচেরও মূখ্য উপাদান হচ্ছে ইসলাম। আমাদের জাতীয় পরিচয় তথা জাতিসত্ত্বার মূখ্য নিয়ামক হচ্ছে মুসলিম পরিচয় বোধ। ইসলামকে বাদ দিলে বা পাশ কাটালে আমাদের জাতিসত্তা অনির্দিষ্ট ও অবাস্তব হয়ে পড়ে। আমাদের ভৌগোলিক পরিচয়ের সাথেও ইসলামের সম্পর্ক সরাসরি। ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ববাংলা মূলত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা। ১৯৪৭ সালে বাংলার বিভক্তির মূলেও রয়েছে মুসলিম পরিচয়বোধ। মুসলিম পরিচয় বোধের ভিত্তিতেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয় আর পূর্ব পাকিস্তানেরই বর্তমান রূপ বাংলাদেশ। অতএব আমাদের ভূ-খন্ডগত বিবর্তন ও পরিচয়ের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মুসলিম পরিচয়বোধ। তাই ইসলামকে উপেক্ষা করলে বা বাদ দিলে আমাদের ভূ-খন্ডগত অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। আমাদের ভূগোল হয়ে পড়ে অবাঞ্চিত ও ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা। একমাত্র ইসলামই আমাদের বর্তমান ভূ-খন্ডগত অবস্থানকে যৌক্তিকরূপ দিতে পারে। বিবর্তনের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করতে পারে, অব্যাহত রাখতে পারে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনভাবেই আমাদের ভূ-খন্ডগত অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। যে কোন ধরনের সেক্যুলার ব্যাখ্যা এখানে অচল ও অযৌক্তিক।

জনগণের ঐক্য ও সংহতি আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। আর এ ঐক্য ও সংহতিরও মুখ্য উপাদান ইসলাম। ইসলাম ছাড়া দেশের জনগণের মধ্যে যথার্থ ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা দুষ্কর। ইসলামই যাবতীয় আধিপত্যবাদ ও

www.nagorikpathagar.org

আগ্রাসনের মুকাবিলায় দূর্ভেদ্য ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। ইসলামই এ জাতির মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে এক প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাস ও মনোবল। ইসলাম বাদ দিলে জাতির আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল দুর্বল হতে বাধ্য। ইসলামই যোগান দিতে পারে জাতির জীবনে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান ও শক্তি। তাই ঐক্য সংহতি ও সামষ্টিক আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম।

অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতার জন্যেও ইসলামী মুল্যবোধকে আকড়ে ধরতে হবে। সীমিত সম্পদ নিয়ে একটি জাতিকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে হলে, অপচয় রোধ করতে হলে, সামাজিক বৈষম্য দূর করে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে যে সব অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন ইসলামের প্রতি আমাদের যথার্থ অঙ্গিকার ও এর সঠিক রূপায়নই এর যোগান দিতে পারে।

একটি দেশ প্রেমিক সরকার গঠনের জন্যেও ইসলামী মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলাম থেকে দূরে থেকে কোন সত্যিকার দেশপ্রেমিক সরকার আমাদের প্রেক্ষিতে গঠন সম্ভব কিনা তা অবশ্যই প্রশ্ন সাপেক্ষ। এখানে ইসলাম ও দেশ প্রেম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইসলামের অনুগত প্রত্যেকেই অনিবার্যভাবে দেশ প্রেমিক হওয়ার কথা। কাজেই দেশপ্রেম সৃষ্টির জন্যেও ইসলামের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মোটকথা, যে কোন দিকই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন ইসলামই আমাদের স্বাধীনতার মূল নিয়ামক। ইসলামই আমাদের স্বাধীনতার প্রধান গ্যারান্টি। ইসলাম ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে না, হবে না জনগণের জন্যে অর্থবহ। তাই যদি আমরা যাবতীয় আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসনের মুকাবিলায় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে চাই, সমুন্নত জাতি হিসেবে দাঁড়াতে চাই তাহলে ইসলামকেই ভিত্তি করে আমাদের জাতিগঠন ও জাতীয় জীবন নির্মাণে প্রয়াসী হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ১৪ শতকে বাঙ্গালী জাতির বিকাশের ধারা

যেকোন জাতির জন্যে একটি শতাব্দীর বিদায় এবং নতুন শতাব্দীর আগমন তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ, বাঙ্গালী জাতি ও এদেশের মুসলমানদের জাতিসত্তা, ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম-সংস্কৃতি এবং স্বাধীন রাষ্ট্রসত্ত্বা বিকাশের সার্বিক ধারাটি উপলব্ধির জন্যে চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। তেমনি সার্বিক ধারায় আমাদের জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে নতুন শতাব্দীর অন্তর্নিহিত প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার-বিশ্লেষণও অতীব গুরুত্বের দাবীদার।

বাংলা ১৪ শতক এদেশের জনগণের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শতক। এদেশের জনগণের তথা মুসলমানদের সচেতনতা, আত্মোপলব্ধি ও জাগৃতির সময় বাংলা চতুর্দশ শতাব্দী। এদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী তাদের স্বকীয় পরিচয়ে, স্ব-মহিমায়, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সত্তা নিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছে এ ১৪ শতকেই। যে হতাশা ১১৬৪ সালে (১৭৫৭ খৃঃ) সুবে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার কারণে বাংলার জনগণের তথা মুসলমানদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিলো, যে বিপর্যয় ১২ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৩ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুসলমান জনগোষ্ঠীর জীবন ও সমাজকে গ্রাস করেছিলো, তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছিলো, এসবের মোকাবিলা ১৪ শতকেই এদেশবাসী তার স্বকীয় জাতিত্ব, স্বকীয় রাষ্ট্র, স্বকীয় সমাজ-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সর্বোপরি স্বকীয় স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বকীয় সত্তা নিয়ে আজ অস্তিত্বশীল। তাই ১৪ শতক বাঙ্গালী জাতির জীবনে, বাঙ্গালী মুসলমান জাতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গোড়ার দিকের সঙ্কট

তেরো শতকের শেষ দুদশক অর্থাৎ চৌদ্দ শতকের প্রাক্কালটি ছিলো বাংলার মুসলমানদের জন্যে ক্রান্তিকাল। এ সময়ে প্রধান সঙ্কট ও সমস্যা হিসেবে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায় ঃ

১. সশস্ত্র জিহাদের ব্যর্থতা জনিত হতাশা।

২. সংস্কারবাদী ও গতানুগতিকতাবাদীদের দ্বন্দ্ব।

৩. জাতি পরিচয়ের সঙ্কট।

৪. সাধারণ জনগণ ও শহুরে এলিটদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা।

৫. আধুনিক শিক্ষার প্রশ্নে বিতর্ক।

www.nagorikpathagar.org

৬. হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মুসলিম ও ইসলামবিরোধী তীব্র সাংস্কৃতিক আক্রমন।

৭. খ্রীস্টান মিশনারীদের ইসলামবিরোধী তৎপরতা।

৮. বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা।

বারো শতকের শেষার্ধ থেকে তেরো শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত উপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের দেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম তথা জিহাদ সংঘটিত হয় তা আশু লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের উপর নেমে আসে নানা অত্যাচার, জেল-জুলুম-ফাঁসী। সশস্ত্র সংগ্রামের উপযোগিতা কমে আসে। মুসলমানেরা তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে অস্পষ্টতার শিকারে পরিণত হয়। তবে সশস্ত্র জিহাদ ও আন্দোলন সফল না হলেও আন্দোলনকারীদের সংস্কারের ঢেউ গোটা মুসলিম সমাজকে বিশেষ করে বাংলার মুসলিম সমাজকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে এবং এসব আন্দোলনের সুদুরপ্রসারী প্রভাব আজো অনুভূত হচ্ছে।

এ ক্রান্তিকালে সংস্কারবাদী আন্দোলন ও ধর্মীয় গতানুগতিকতাবাদীদের মধ্যকার সংঘাত জোরদার হয়ে ওঠে। শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকদের পক্ষ থেকেই প্রথম সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে একশ্রেণীর ধর্মীয় মহলকে লেলিয়ে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে এসে এ ধারা অত্যন্ত জোরদার হয়। উভয়পক্ষ সাধারণ জনগণকে নিজেদের দলে টানার প্রয়াস চালায়, শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে বাহাস বা ধর্মীয় বিতর্ক। এসব বিতর্কের অবশ্য একটি ইতিবাচক ফলও দেখা দেয়। এসব বিতর্ক অনুষ্ঠান বা বাহাসের ফলে জনগণ ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতুহলী ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে সচেতনতা। এসময়ে শহরের এলিটদের সঙ্গে বাংলার সাধারণ জনগণের সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে ওঠে। ফারায়েজী, মোহাম্মদী ও তিতুমীরের আন্দোলনের ফলে জনগণের মধ্যে সাম্যের ভাবধারা সৃষ্টি হয়। তারা সংগ্রামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। অন্যদিকে শহুরে এলিটশ্রেণী বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষের পথ ধরে। তাছাড়া শিক্ষিতদের মধ্যে অভিজাত মনোভাবও ছিলো প্রবল। তার ফলে জনগণের সাথে ঐ শহুরে এলিট শ্রেণীর দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

আধুনিক শিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার প্রশ্নে প্রচন্ড বিতর্কও এ সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সময়ের মুসলিম সমাজে একদল ছিলো মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

অগ্রগতির প্রয়োজনে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতি। অপরদল ছিলো ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা ও নিজ ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের যুক্তিতে ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের পক্ষপাতি।

মুলমানদেরকে এ সময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়। বর্ণহিন্দু শ্রেণী বিশেষ করে লেখক শ্রেণীর পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবল সাংস্কৃতিক আক্রমণ শুরু হয়। ইতিপূর্বেই ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের পর থেকে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতমুখী করে বাংলার মুসলিম সমাজকে বাংলা ভাষার চর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা হয়। বাংলা ভাষাকে মুসলিম সমাজের জন্যে দুর্বোধ্য করে ফেলা হয়। মুসলমান সমাজকে আরো কোনঠাসা ও হেয় করার মানসে মুসলিম ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে কালিমালিপ্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের তৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সংঘবদ্ধভাবে আর্য বর্ণহিন্দু গোষ্ঠী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবল সাংস্কৃতিক যুদ্ধ শুরু করে। এ সাংস্কৃতিক যুদ্ধে মুসলমানেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। একদিকে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-অত্যাচার অন্যদিকে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশীয় হিন্দুদের আক্রমণ। উভয় ফ্রন্টে লড়াই করা মুসলমানদের জন্যে ছিলো অত্যন্ত কঠিন।

হিন্দুদের পাশাপাশি খৃস্টান মিশনারীদের ইসলামবিরোধী প্রচারণাও ছিলো আরেকটি প্রধান সমস্যা। খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করারও প্রবল চেষ্টা চলে।

ক্রান্তিকালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের মোকাবেলা বাংলার মুসলমানদের করতে হয়। তা হচ্ছে জাতিসত্তা, জাতি-পরিচিতি ও জাতীয়তা সঙ্কট। হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আক্রমণ, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতমুখীকরণ ও মুসলমানদের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তথাকথিত অভিজাত মনোভাবের ফলে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালী পরিচয়ের প্রশ্নে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালী অনেকটা হিন্দুত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু লেখকগণ সুকৌশলে এ মনোভাবকে জোরদার করে। ইংরেজী প্রভাবিত একশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও এ ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এ মনোভাবটি জনগণের মধ্যে ততটা ছিলো না। বরং জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই এ মনোভাবটি বেশী পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাবে একশ্রেণীর ধর্মীয় মহলের মধ্যেও বাঙ্গালীত্ব ও মুসলমানিত্বকে বিরোধমূলক বলে মনে করা হতে থাকে। অধিকন্তু হিন্দুদের "যা কিছু বাঙ্গালী তাই হিন্দুদের ঐতিহ্য" এ ধরনের প্রচারণার কারণেও মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

হয়। জাতি-পরিচয়ের এ জটিলতা, দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি বাংলার মুসলমানদের জন্যে সাময়িকভাবে হলেও তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট।

চৌদ্দ শতকের প্রাক্কালে এসে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দেয়। ইতোমধ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জটিলতা আরো বাড়ে। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তার শ্লোগান মুসলমানদেরকে সংকটে ফেলে দেয়। মুসলমানদের সার্বিক রাজনৈতিক পথ কি হবে এ ব্যাপারে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে।

বস্তুত ঃ ১৪ শতকের প্রাক্কালে বাংলার মুসলমানদের জন্যে ছিলো এক বিষম সঙ্কটকাল। তাদেরকে এক জটিল ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে হয়। এসব সঙ্কট আর জটিলতার আবর্তে থাকা অবস্থায়ই ১৪ শতকের যাত্রা শুরু হয়।

বিকাশের বিভিন্ন স্তর

১৪ শতকে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী মুসলমানদের যে অগ্রগতি সাধিত হয়, বিভিন্নমুখী যে রূপান্তর ঘটে, যে ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী মুসলমান জনগোষ্ঠী আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে সে ইতিহাসকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায় ঃ প্রথম তিন দশক

এ সময়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ

১. মুসলিম চেতনা ও স্বাতন্ত্রবোধের স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ ঃ ১৪ শতকের প্রথম পর্যায়ে এদেশীয় মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা, মুসলিম স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রবোধ অত্যন্ত প্রবল ও জোরদার হয়ে ওঠে, বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক শিক্ষামূলক সংস্থাসমূহের (আঞ্জুমান) ব্যাপক কার্যক্রমের ফলে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের উজ্জীবন ঘটে। এ সময়কালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-লেখক এবং সংবাদপত্রের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। সবারই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী মুসলমানদের জাগরণ ঘটতে থাকে। তাদের স্বাতন্ত্রবোধ ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা স্পষ্ট হতে থাকে।

২. বাঙ্গালী ও মুসলিম পরিচয়ের মধ্যে আপাত বিরোধ ও বিভ্রান্তি হ্রাস পেয়ে সমন্বয় সাধিত হয় ঃ বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে জাতিসত্তার প্রশ্নে ১৩ শতকের শেষের দিকে নানা কারণে যে বিরোধ ও বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় তা ক্রমে হ্রাস পেয়ে সমন্বয়ের রূপ ধারণ করে। এদেশের মুসলমানদের যুগপৎ বাঙ্গালী ও মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

পরিচয়বোধ স্পষ্ট হতে থাকে। এদেশের গুটিকয়েক তথাকথিত 'অভিজাত শ্রেণী' ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের বাঙ্গালী পরিচয়ের তেমন একটা দ্বিধা ছিলো না, যা ছিলো তাও ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে যায়। এদেশবাসী একই সঙ্গে বাঙ্গালী ও মুসলমান এটিই বাস্তব সত্য বলে স্বীকৃত হয়। কাজেই জাতিসত্তা ও জাতীয়তার জটিল সঙ্কট এ সময়েই ক্রমে কেটে ওঠে।

৩. সংস্কারপন্থী ও ঐতিহ্যপন্থীদের মধ্যে সমন্বয়সাধন ঃ ধর্মীয় সংস্কারপন্থী ও ঐতিহ্যপন্থীদের মধ্যে যে প্রবল দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চলে আসছিল তা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে যখন তাদের শত্রু ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় তখন স্বাভাবিকভাবেই অভ্যন্তরীণ বিরোধের মাত্রা কমে আসে। সংস্কারপন্থী ও ঐতিহ্যপন্থী উভয় শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের উন্নতি, স্বকীয় স্বাতন্ত্র ও অস্তিত্ব নিয়ে ও সাধারণ দুশমনদের মোকাবিলায় টিকে থাকার প্রশ্নে ঐক্যমত স্থাপিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অঘোষিত সমঝোতা গড়ে ওঠে।

৪. মুসলিম আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারা জোরদার হয় ঃ ১৩ শতকের শেষের দিকে জামালউদ্দিন আফগানীর প্যান ইসলামী আন্দোলন ও উপমহাদেশে তাঁর সফর দেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে জনগণের মধ্যেও মুসলিম আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারা দানা বেঁধে ওঠে। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তা আরো তীব্র হয়। ১ম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে উসমানী খিলাফত রক্ষাকল্পে পরিচালিত খিলাফত আন্দোলন সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আন্তর্জাতিক ভাবধারার জোয়ার সৃষ্টি করে।

৫. আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে ঃ আধুনিক শিক্ষার প্রশ্নে তেরো শতকে প্রবল বিতর্ক ও বিরোধ থাকলেও ১৪ শতকে এসে কম-বেশী সবাই আধুনিক শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ফলে বিভিন্ন স্থানে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আলেমশ্রেণীরও একটি অংশ এগিয়ে আসেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে আরো অগ্রগতি সাধিত হয়।

৬. জনগণ ও শহুরে অভিজাত এলিটদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ঃ ইতোপূর্বে শহুরে অভিজাত এলিটদের সাথে গ্রামীণ মুসলমানদের তেমন কোন সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিলো না। উভয়ের আশা-আকাঙ্খা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও ছিলো অনেক

www.nagorikpathagar.org

পার্থক্য। কিন্তু ১৪ শতকে এসে এ অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়। সাধারণ মুসলমানদের সাথে অভিজাত শ্রেণীর যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অবশ্য এ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ ধর্মপ্রচারক শ্রেণীই বেশী ভূমিকা রেখেছে। ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর সরাসরি প্রভাব জনগণের উপর তেমন একটা ছিলো না। জনগণের উপর প্রভাব ছিলো ধর্মীয় শ্রেণীর। আধুনিক শ্রেণী প্রধানত ধর্মীয় শ্রেণীকে আশ্রয় করেই জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সম্পর্ক স্থাপন করে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক সামাজিক অগ্রগতির জন্যে এ ছিলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭. বাংলাভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম জাগরণঃ দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিশেষ করে ১৮০০ খৃঃ থেকে মুসলমানগণ ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বাংলা ভাষার গতিকে পরিকল্পিতভাবে সংস্কৃতমুখী করা হয়। সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমান ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস চলে। মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার হীন ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ১৪ শতকে এসে এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনে মুসলমানদের মধ্যে উদ্যোগ ও প্রয়াস শুরু হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম ভাবধারা সৃষ্টির প্রয়াস শুরু হয়। কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন এক ধারার সূচনা হয়। এর অনুসরণে মুসলিম লেখকগণ এগিয়ে আসেন। ফলে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একটি সুস্পষ্ট মুসলিম ধারা সৃষ্টি হয়। 'সংস্কৃতঘেঁষা বাংলার' মোকাবিলায় বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাষা সাহিত্যে আরবী ফার্সী বিপুলভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। হিন্দু-ঐতিহ্যের মোকাবিলায় মুসলিম ঐতিহ্যসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বাংলাসাহিত্য। মোটকথা, ভাষা ও সাহিত্যে এক নতুন জোয়ার আসে। এক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠে। মুসলিম স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বাংলাভাষা ও সাহিত্য।

৮. মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঃ এ সময়েই মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষ ঘটে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে মুসলমানদেরকে ভিড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে কংগ্রেস কোন কোন ক্ষেত্রে সফলও হয়। কিন্তু ১৪ শতকের দুদশকের ভিতরই এ অবস্থার মৌল পরিবর্তন ঘটে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯১৬ সালে পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি, ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলনসহ বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও পদক্ষেপসমূহ এদেশের

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তার দ্বার খুলে দেয়। এদেশের মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বকীয়তাবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। তারা উপনিবেশিক শক্তির অবসান ও নিজেদের অধিকার ও স্বকীয়তা রক্ষার প্রশ্নে আন্দোলনমুখী ও সচেতন হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ চতুর্থ দশক

এ পর্যায়ে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রবল জাগরণ ঘটে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাঙ্গালী মুসলমানরা একচেটিয়াভাবে পাকিস্তান ইস্যুর সপক্ষে রায় ঘোষণা করে। বলতে গেলে বাঙ্গালী মুসলমানদের সমর্থন ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়েই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় মুসলমানদের অনিচ্ছা ও আপত্তি সত্ত্বেও হিন্দুদের চাপের কারণে বাংলা বিভক্ত হয়। আসামের সিলেট ও বাংলার পূর্বাঞ্চল পূর্ব বাংলা নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান কাঠামোতে বাঙ্গালী মুসলমানরা তাদের স্বকীয়তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। বাঙ্গালী মুসলমানরা যে পাকিস্তানের সোনালী স্বপ্ন দেখেছিল, তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক ও অসামরিক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক শাসন তা নস্যাৎ করে দেয়। প্রায় ৫৬% ভাগ জনগোষ্ঠীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালী মুলমানদের ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তাদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার নস্যাৎ করার চেষ্টা চলে। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন ও প্রতিবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯-এর এগারো দফা, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন সবই ছিলো পাকিস্তান কাঠামোর ভিতরে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কিন্তু পাকিস্তানী গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠীর উপর্যুপরি ষড়যন্ত্রের কারণে তা সম্ভব হলো না। তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তান কাঠামোর বাইরে এসেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হলো এদেশবাসীকে।

চতুর্থ পর্যায় ঃ

পাকিস্তান কাঠামোর ভিতরে বাঙ্গালী মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার অর্জনের আর কোন সুযোগ যখন অবশিষ্ট রইলো না, তখন মূল লাহোর প্রস্তাব পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথা স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করতে হলো। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম পর্যায় ঃ

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে সাথে বাঙালী মুসলমানদের জন্যে এক নতুন ক্রান্তিকাল দেখা দেয়। বাঙালী মুসলমান ও বাংলাদেশের পিছনের গোটা ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে এদেশবাসীর মুসলিম পরিচয়কে নস্যাৎ করে দেয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৩ শতকের শেষ পর্যায়ে যেমন বাঙালী মুসলমানদের "বাঙালী" পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনিভাবে নতুন আঙ্গিকে বাঙালী মুসলমানদের "মুসলমান" পরিচয় নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ও সংকট সৃষ্টি হয়। এদেশের জাতিসত্ত্বা থেকে মুসলিম পরিচয়টি মুছে ফেলার চেষ্টা হয়। এদেশবাসীর মুসলিম পরিচয়বোধকে গৌণ করে তোলার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কিন্তু এদেশবাসী সফলভাবে আমাদের জাতিসত্ত্বাবিরোধী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করে।

ষষ্ঠ পর্যায় ঃ

এ পর্যায়ে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুসলিম পরিচয়বোধ আবার তার অবস্থান করে নেয়। বর্তমানে মুসলিম পরিচয়ের সাথে ভৌগোলিক ও ভাষাগত পরিচয়ের সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। যদিও কিছু কিছু বিভ্রান্তির এখনও অবসান ঘটেনি, কিন্তু প্রক্রিয়াটি ইতিবাচক ধারায় এগুচ্ছে বলে মনে হয়। এ পর্যায়টিই হচ্ছে আমাদের জাতির বর্তমান ঐতিহাসিক অবস্থান। এ স্তরে বাঙালী বাংলাদেশী ও মুসলিম সত্তার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক বিভ্রান্তি কেটে উঠলেও তার পরোপুরি অবসান হয়েছে বলা চলে না। তবে তা ক্রমহ্রাসমান। অবশ্য এসবের পাশাপাশি এক গভীর ষড়যন্ত্রমূলক প্রয়াসও অব্যাহত রয়েছে, যা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। নতুন শতাব্দীতে আমাদের উপলব্ধি যদি শাণিত হয় এবং অঙ্গীকার যদি সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় হয় তা হলে আমাদের সঠিক পথে বিকাশের ধারা বেগবান হবে, পূর্ণতা লাভ করবে।

আমাদের অঙ্গীকার

আসন্ন ১৫ শতকে আমাদের সাধনা হোক, অঙ্গীকার হোক একটি আদর্শবাদী স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো, এর জন্যে প্রয়োজন ঃ

১. আমাদের জাতিসত্তায় বাঙ্গালী, বাংলাদেশী ও মুসলিম এই ত্রিমাত্রিক রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা, বিকশিত করা। এ সমন্বিত জাতিসত্তার অবয়বকে পূর্ণতা দান, এর সমৃদ্ধি সাধন, একে সৃজনশীল ও বেগবান করা। এর পূর্ণ বিকাশ সাধন।

www.nagorikpathagar.org

মনে রাখা দরকার, আমাদের জাতিসত্তায় বাঙ্গালী ও মুসলিম বোধের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির একটি ষড়যন্ত্র বাংলা ১২ শতকের শেষ নাগাদ থেকে চলে আসছে। এ ষড়যন্ত্রকে রুখতে হবে। মুসলমানিত্ব ও বাঙ্গালীত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নেই তাই স্পষ্ট করে তুলতে হবে। ইসলামের বিশাল কাঠামোর আওতায় আমাদের বাঙ্গালীত্বকে পুষ্টিদান করতে হবে।

২. বাঙ্গালী জাতি পরিচয় ও বাঙ্গালী সত্ত্বার যে বাংলাদেশীরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী আমাদের শিল্প সাহিত্য, আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করে তুলতে হবে। মনে রাখা দরকার, আমাদের বাঙ্গালীত্ব হাজার বছরের পরিশীলিত ও পরিস্রুত বাঙ্গালীত্ব। বাঙ্গালী জাতি সর্বশেষ যে আদর্শিক ধর্মীয় ভাবধারা পরিগ্রহ করে তার ভিত্তিতেই আমাদের বাঙ্গালীত্ব লালিত হবে। তার সঙ্গে অবশ্যই এদেশের প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবোধ তাকেও ধারণ করতে হবে, এসবকে পুষ্টিদান রাখতে হবে। এক কথায়, আমাদের প্রকৃত পরিস্রুত বাঙ্গালীত্বকে বিকাশ দানে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সাধনা ও ভূমিকা হওয়া প্রয়োজন, যাতে বাঙ্গালী বলতেই বাংলাদেশীদের বিশেষ করে মুসলমানদের বুঝানো হয়। এদেশে বাঙ্গালীত্ব ও মুসলমানত্ব প্রায় সমার্থক হয়ে যাওয়া দরকার। কোন বিশেষণ বিযুক্ত বাঙ্গালী বলতে মুসলমানদেরই বুঝানো উচিত। ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে যতক্ষণ পর্যন্ত 'বাঙ্গালী' ও 'মুসলিম' এ দুটো পরিচয় একাত্ম না হবে, ততদিন আমাদের বাঙ্গালীত্বের ভিত্তিটি দুর্বল থেকে যাবে। কাজেই পঞ্চদশ শতকের সাধনা হওয়া প্রয়োজন, আমাদের বাঙ্গালী পরিচয় ও মুসলমান পরিচয়ের মধ্যে গভীর একাত্মতা সৃষ্টি করা, মুসলমানিত্বের বাইরে বাঙ্গালী পরিচয়ের প্রবণতাকে যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা।

৩. বাংলা ভাষাকে একটি শক্তিশালী ইসলামী ভাষায় পরিণত করা। বাংলা ভাষা যেহেতু প্রধানতঃ এদেশের মুসলমানদের ভাষা, তাই তাকে একটি শক্তিশালী ইসলামী ভাষায় রূপান্তরের জন্যে প্রয়াস চালাতে হবে, আমাদের ভাষায় ইসলামী ভাবাদর্শের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে বাংলা। আমাদের আদর্শবোধ, ঐতিহ্যবোধ ফুটে উঠতে হবে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে। বাংলাদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা-মনন রূপায়িত হবে আমাদের সাহিত্যে। তাদের মুখের কথা মুখের ভাষা পরিশীলতিরূপে বিধৃত হবে আমাদের

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্যে। মুসলিম জনজীবনের বহুল ব্যবহৃত শব্দমালা যাতে সাহিত্যকর্মে জীবন্ত থাকে তার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। অহেতুক বা চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। অবশ্য ভাষা বিকাশের স্বাভাবিক ধারায় যে কোন ভাষার শব্দই বাংলা ভাষায় গৃহীত হতে পারে, তবে দেশের গণচেতনা ও গণ-মনস্তত্ব বিরোধী শুধু 'সংস্কৃত' শব্দ ব্যবহারের ভারতীয় বঙ্গের তথা "রাঢ়ীয় করণ" প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। ইসলামী ভাবাদর্শ ও দেশের অধিকাংশ গণমানুষের চেতনার সঙ্গে অসঙ্গতিশীল ভাষারীতি ও শব্দচয়ন পরিহার করতে হবে। পরিভাষা তৈরীর নামে রাঢ়ীয় ভারতীয় বঙ্গের পরিভাষা ব্যবহারের অবাঞ্ছিত প্রবণতাও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এক কথায়, আমাদের ভাষাগত লক্ষ্য হতে হবে ফার্সী ও উর্দু কুরআনের ভাষা না হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে শক্তিশালী ইসলামী ভাষায় পরিণত হয়েছে বাংলাকে সেরূপ শক্তিশালী ইসলামী ভাষায় পরিণত করা। মনে রাখা দরকার, বাংলা ভাষাভাষি মুসলমানের সংখ্যা ফার্সী-উর্দু ভাষী মুসলমানদের চেয়ে কম নয়-বরং বেশী। তদুপরি ইসলামী মনোভাব সেন্টিমেন্ট ও অনুশীলনও এখানে অনেক মুসলিম দেশের চেয়ে বেশী। তাছাড়া বাংলার উন্মেষ ও বিকাশে মুসলমানদের অবদানই প্রধান। আর সর্বশেষে এদেশের মুসলমানরাই বাংলাকে তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে মর্যাদা দিয়েছে। তাই বাংলাই হবে ইসলামের অন্যতম শক্তিশালী ভাষা, এ লক্ষ্যে আমাদের সমন্বিত প্রয়াস জোরদার করতে হবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, কৃত্রিমভাবে তা করতে হবে। না, তা নয়। বরং শিল্প সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতিকে যথার্থ উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাভাবিক বিকাশের ধারায়ই সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য ভাষা বিকৃতির রাঢ়ীয়-পশ্চিম বঙ্গীয় প্রয়াস প্রতিরোধ করতে হবে। নিজস্ব স্বতন্ত্র জাতীয় ভাষারূপে বাংলাকে পুষ্ট করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলা, জাতীয় আদর্শ ইসলাম। তাই এ দু'য়ের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে গভীর একাত্মতা ও সম্পর্ক। তাহলেই আমাদের ভাষা কাঙ্খিত মানে রূপ নেবে।

৫. আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের পরিপন্থী মুসলিম গণচেতনা বিরোধী সাংস্কৃতিক ধারার প্রাধান্যের পরিবর্তে ইসলামী চেতনাকে বলিষ্ঠ রূপ দিতে হবে। সেক্যুলার ধর্ম নিরপেক্ষ ধারা যাতে প্রাধান্য অর্জন করতে না পারে তার দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। আমাদের এ সত্যটাকে স্পষ্ট বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান মূলতঃ আমাদের স্বতন্ত্র

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় ও ভাষাগত অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা বিলুপ্তির বা দুর্বল করার প্রয়াস। এ প্রয়াসে বাইরের ষড়যন্ত্র আছে। এ প্রয়াসে আমাদের জাতীয় জীবনের বাইরের ইন্ধন আছে। এ প্রয়াস এদেশের গণমানুষের আদর্শিক ভাবধারা বিরোধী। আমাদের স্বাধীনতার যারা দুশমন, যারা আমাদের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে তারাই আমাদের মধ্যে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগানকে জোরদার করতে চায়। তারা আর্য সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্যেই মূলতঃ সেক্যুলারিজমের শ্লোগান তুলছে। তারা তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতার জুজুর ভয় দেখিয়ে সাহিত্য-শিল্পে 'নব্য সাম্প্রদায়িকতা' 'আর্য সাম্প্রদায়িকতা' সৃষ্টির-প্রয়াস চালাচ্ছে। এই আর্য-বর্ণবাদী নব্য সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যাদের দেশের প্রতি, এদেশের জনগণের প্রতি, দেশের আদর্শের প্রতি আনুগত্য নেই, তাদের হীন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করে আমাদের জাতীয় ভাষাগত আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক স্বকীয় ধারাটিকে জোরদার করতে হবে, বেগবান করতে হবে। উপরোক্ত অঙ্গীকার নিয়েই যাত্রা শুরু হোক বাংলা চৌদ্দ শতক পূর্তিসালের এবং আসন্ন বাংলা পনের শতকের। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, বাঙ্গালী-বাংলাদেশী সংস্কৃতির এক সোনালী দিগন্ত উন্মোচিত হোক। ইসলামী ভাবধারা কেন্দ্রিক হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাঙালী জাতির নিজস্ব দেশ, ভাষা, ধর্ম-আদর্শ-সংস্কৃতি পূর্ণতা লাভ করুক-বিশ্বের দরবারে বলিষ্ঠ স্থান করে নিক, এ হোক আমাদের প্রত্যাশা। এ হোক আমাদের সৃজনশীল স্বপ্ন। আর সেই প্রত্যাশা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়েই আসন্ন বর্ষে যাত্রা শুরু হোক নতুন এক শতাব্দীর।

www.nagorikpathagar.org

নতুন শতাব্দীর প্রত্যাশা

বাংলা ১৪শ শতাব্দীর শেষ। ১৫শ শতাব্দীর শুরু। বিদায়ী শতাব্দীর প্রাপ্তি অনেক। নতুন শতাব্দীর প্রত্যাশাও বহু। আজকের প্রত্যাশার ভিত্তি বিগত দিনের অর্জন। ১৪ শতকের অর্জনের উপর দাঁড়িয়ে আছে ১৫ শতকের প্রত্যাশা। তাই নতুন শতাব্দীর প্রত্যাশা বিশ্লেষণে বিদায়ী শতাব্দীর প্রাপ্তির খতিয়ান প্রয়োজন।

১৪শ শতাব্দীর অর্জন

১৪শ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাপ্তি অনেক। তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলো সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঃ

১. সনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বা নিজস্ব দেশ

২. জাতি সত্ত্বা ও জাতি-পরিচয়

৩. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা

৪. স্বাধীনতা লাভ

সুনির্দিষ্ট ভূখন্ড

প্রাক মুসলিম যুগে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল ছিলো নানা জনপদে বিভক্ত-এর মধ্যে প্রধান ছিলো বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, হরিকেল ও বরেন্দ্র। মোগল আমলে সমস্ত বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় সুবে বাংলা। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে মুসলিম ভিত্তিক পূর্ব বাংলা গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে আবার হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে বাংলা বিভক্ত হয়। গঠিত হয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান। সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। মুসলিম ভিত্তিক বাংলাদেশের ভূখণ্ড আজ সুনির্দিষ্ট সুনির্ধারিত। বিভিন্ন সময়ে ভূ-খণ্ডগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে আমরা লাভ করেছি ৫৪ হাজার বর্গমাইলের একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড যা অতীতের মূল বঙ্গেরই প্রসারিত রূপ। এ ভূগোল আমরা অর্জন করেছি বাংলা ১৪শ শতাব্দীতে। অতীতে আমাদের অবস্থান ছিলো অনেকটা নিজদেশে পরবাসীর মতো। কিন্তু নির্দিষ্ট এবং নিজস্ব ভূ-খণ্ড লাভের মধ্যে দিয়ে আমাদের এ অবস্থার অবসান ঘটেছে। হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজস্ব আবাসভূমিটি সুনির্দিষ্ট হয়েছে। এ ভূগোল আমরা অর্জন করেছি বাংলা ১৪শ শতাব্দীতে। তাই এ হচ্ছে এ শতাব্দীর অন্যতম অর্জন।

জাতিসত্ত্বা ও জাতি-পরিচয়

আমাদের সুনির্দিষ্ট জাতি পরিচয়ও এ শতকেই সুনির্দিষ্ট হয়েছে। এ

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দীতেই গড়ে উঠেছে বাঙালী মুসলমানদের নিজস্ব জাতিসত্তা। শতশত বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানদের নিজস্ব জাতিত্ব এ শতাব্দীতেই অবয়ব লাভ করেছে। এ শতাব্দীতেই আমাদের ভাষা-ভূগোল ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সংগতি বিধান হয়েছে। তাই এ শতাব্দী জাতিত্ব অর্জনের শতাব্দী।

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা

হিন্দু সেন আমলে এদেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। এদেশের জনগণের ভাষা বাংলাকে তখন বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্র করা হয়। মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রভাষা ছিলো ফার্সী, তবে মুসলিম শাসকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বৃটিশ উপনিবেশিক আমলে রাষ্ট্রভাষা ছিলো ইংরেজি। আর পাকিস্তান আমলে এদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এখানে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে বাংলা একক রাষ্ট্র ভাষা। এ শতাব্দীতেই বাংলা ভাষার এ মর্যাদাটি অর্জিত হয়েছে। তাই ১৪ শতকের অন্যতম অর্জন হচ্ছে আমাদের বাংলাভাষা স্বাধীন একটি দেশের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হওয়া। হাজার বছরের সংগ্রাম সাধনার মধ্য দিয়ে ১৪শ শতকেই তা সম্ভব হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জন

এদেশের মানুষ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ শতাব্দীতেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পরাধীনতার গ্লানি থেকে এদেশবাসী মুক্তি লাভ করেছে এ শতাব্দীতেই। তাই এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা।

১৪শ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমান তথা মূল বাঙালী জাতি লাভ করেছে নিজস্ব ভূখণ্ড, জাতি পরিচয়, রাষ্ট্রভাষা আর স্বাধীনতা। এ শতাব্দীর প্রাপ্তি তাই বিশাল বিপুল। আমাদের ইতিহাসে এ শতক রেখেছে স্থায়ী অবদান।

নতুন শতাব্দীর প্রত্যাশা

একটি শতাব্দী পেরিয়ে নতুন একটি শতাব্দীর যাত্রা শুরু। নতুন শতাব্দী আমাদের জাতীয় জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৪শ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভিত নির্মিত হয়েছে। ১৫শ শতাব্দীতে এ ইতিহাস বিকশিত হবে-পূর্ণতা লাভ করবে। আমাদের বিগত ইতিহাসের ধারা, আজকের বাস্তবতা ও জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি সামনে রাখলে পনের

www.nagorikpathagar.org

শতকে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সব অর্জন প্রত্যাশিত, যা সম্ভবনাময় তা অনুমান করা যেতে পারে। যে সব ঐতিহাসিক সম্ভাবনা নিয়ে পনের শতক যাত্রা শুরু করেছে, আগামী শত বছরে যার রূপায়ণ আমাদের অতি প্রত্যাশিত তার মধ্যে ছয়টি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. মুসলিম ভাবধারাভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ।

২. ঢাকা হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র তথা রাজধানী।

৩. বাংলা ভাষা একটি অন্যতম সমৃদ্ধ ইসলামী ভাষায় পরিণত হবে।

৪. বাংলাদেশ হবে দক্ষিণপূর্ব এশীয় অঞ্চলের ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র।

৫. দারিদ্র মুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

৬. একটি জনকল্যাণমূলক যথার্থ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভ।

জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ

আমাদের জাতিসত্তা ত্রিমাত্রিক। বাঙালী বাংলাদেশী ও মুসলিম। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের বর্তমান বিকশিত বাঙালী সত্তা মুসলিম ভাবধারা পুষ্ট। আমাদের ভৌগলিক সত্তার ভিত্তি সরাসরি ইসলাম। আর আদর্শগত বিচারে ইসলামই এদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। আমাদের জাতিকাঠামো, জাতীয় অবয়ব, এর উন্মেষ ও বিকাশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিমবোধ সক্রিয়। মুসলিম সত্ত্বাকে বাদ দিলে আমাদের জাতি পরিচয় অনির্দিষ্টও অস্পষ্ট হয়ে গড়বে। মুসলিম পরিচয় ছাড়া আমাদের ভাষাগত পরিচয়ও পূর্ণতা লাভ করবে না। আর মুসলিম পরিচয় বাদ দিলে তো আমাদের ভূ-খণ্ডগত অবস্থানের ভিত্তিটিই বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজেই ভাষাগত পরিচয় হোক আর দেশগত পরিচয় হোক উভয় ক্ষেত্রেই মুসলিমবোধ এক অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন কোন মহল আমাদের জাতিসত্তার প্রশ্নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তাদের কেউ বাঙালী পরিচয়কে সেক্যুলাররূপ দিয়ে একেই আমাদের জাতি পরিচয়ের মূল উপাদান বলে প্রচার করছে। তারা বাঙালীত্বের নিছক সেক্যুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ ধারণায় বিশ্বাসী। আমাদের বাঙালীত্বের সঙ্গে যে মুসলিমবোধের যোগ রয়েছে তা তারা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তারা বাঙালীত্বের নামে ইসলামকে পাশ কাটাতে চান, গৌণ করে দেখাতে চান। তাদের চরমপন্থীরা মুসলিমবোধকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গোটা জাতিকে সেক্যুলার বোধে তথা ধর্মনিরপেক্ষবাদে উদ্বুদ্ধ করতে চান। উপনিবেশিক যুগে বাঙালীত্ব ও হিন্দুত্বকে এক করে দেয়া হয়েছিল। বাঙালীত্ব ও মুসলিমবোধের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল দুস্তর ব্যবধান। উভয়কে বিপরীতমুখী করা হয়েছিল। বিদায়ী শতকের শেষার্ধে এ প্রবণতা কাটতে শুরু করে। কিন্তু সাথে সাথে আবার বাঙালীত্বের ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস চলে। এ জাতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়বোধ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তথাকথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তোলা হয়। এ শ্লোগানের যে পটভূমিই থাকনা কেন, ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষীরা একে জাতির মুসলিমবোধের বিপরীতে দাড় করাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু ঐতিহাসিক ও বাস্তব বিবেচনায় তাদের এ প্রয়াস কার্যকর হবার ছিল না। অবাঙালী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-শোষনের মুকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রসারিত হলেও সাধারণ জনগণ বাঙালীবোধকে কখনই মুসলিমবোধের বিপরীত মনে করেনি। তারা একই সঙ্গে দুটোই লালন করেছে। যার ফলে স্বাধীনতার পরে বাঙালীত্বের নামে মুসলিম পরিচয়কে মুছে ফেলার যে ষড়যন্ত্র করা হয় জনগণের মধ্যে এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মোটকথা, ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। জনগণ মুসলিমবোধ ও বাঙালীবোধকে পরস্পরবিরোধী বিবেচনা করে না, বরং দুটোকে লালন করে। অন্যদিকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের মুকাবিলায় দেশ পরিচয় ভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তোলা হয়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভাষার পরিবর্তে ভূ-খণ্ডকে ভিত্তি করা হয়েছে। কিন্তু যে ভূ-খণ্ডের ভিত্তি ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়বোধ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে সে পরিচয়বোধকে গৌণভাবে দেখা হয়েছে। ফলে কার্যত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদও এক ধরনের সেক্যুলার ধর্ম-নিরপেক্ষ চিন্তায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার মাত্রা বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে কম। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে মুসলিম পরিচয়কে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হতে পারবেনা। কারণ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হচ্ছে বাংলাদেশের ভূগোল আর এ ভূগোলের ভিত্তি হচ্ছে মুসলিমবোধ তাই মুসলিম বোধ ও বাংলাদেশীবোধের মধ্যে ব্যবধান ও বৈপরীত্ব সৃষ্টি করলে-বাংলাদেশীবোধ অস্পষ্ট ও দুর্বল হতে বাধ্য।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে ধারায় আমাদের ইতিহাস অগ্রসর হচ্ছে সে ধারায় ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালীবোধ হ্রাস পাচ্ছে। কেননা, যারা বাঙালী পরিচয়কে প্রাধান্য দিচ্ছেন তারা ভাষাগত পরিচয়ের মধ্যে রাজনৈতিক উপাদান সম্পৃক্ত

www.nagorikpathagar.org

করছেন। তাদের দৃষ্টিতে বাঙালীবোধ সরল ভাষা পরিচয়মাত্র নয়, এটি আমাদের রাজনৈতিক পরিচয়ও। তাই যদি হয় তাহলে ভারতীয় বঙ্গের-পশ্চিম বঙ্গের লোকদের বাঙালী পরিচয়ের সাথে আমাদের বাঙালী পরিচয়ের মৌল ব্যবধান রয়েছে। ভারতীয় বঙ্গের বাঙালী পরিচয় নিছক সরল ভাষাগত পরিচয়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অধীনে একটি গৌণ পরিচয়। এ পরিচয় আক্ষরিক অর্থেই আঞ্চলিক-ভাষাগত, সাংস্কৃতিক। কিন্তু আমাদের বাঙালী পরিচয় যুগপৎ ভাষাগত ও রাজনৈতিক। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক বাঙালীত্ব সন্দেহাতীতভাবে আমাদের দেশ ও ধর্মের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অবশ্য যারা বাঙালীবোধের নামে ৪৭ এর বাংলা বিভক্তিকে অস্বীকার করতে চাইছেন বা যারা পশ্চিম বঙ্গের সাথে এমনকি ভারতের সাথে আমাদের রাজনৈতিক জাতিবোধের পার্থক্য বুঝতে অপারগ তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা দেশ-জাতির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। বাংলাদেশ ও ইসলাম আমাদের রাজনৈতিক বাঙালী পরিচয়ের অন্যতম উপাদান। রাজনৈতিক অর্থে বাঙালী জাতি মানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক একটি জাতি। ভারতের বাঙালীরা আমাদের বাঙালী জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের স্বতন্ত্র বাঙালীত্বের ভিত্তি আমাদের ভূগোল ও ধর্ম। অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক বাঙালীত্ব আমাদের ভূগোল ও ধর্ম দ্বারা সীমায়িত, সুনির্দিষ্ট। অতএব, সেক্যুলার বাঙলীবোধের চেয়ে এখানে দেশজ-ধর্মজ, বাঙালীবোধ প্রাধান্য পাবে। এবং পনের শতকে এ বোধ পূর্ণবিকশিত হবে বলে সংগতভাবেই অনুমান করা যায়।

বাংলাদেশী বোধের ক্ষেত্রেও একই কথা। আমাদের ধর্ম বাদ দিয়ে আমাদের বর্তমান ভূগোলকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। অতএব, আমাদের বাংলাদেশী পরিচয়ের ভিত্তিই মুসলিম পরিচয়। দিন যতই যাবে এ বোধ শক্তিশালী হবে। বাংলা পনের শতকে এ বোধ পূর্ণ বিকশিত হবে এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

বস্তুত নতুন শতকে আমাদের জাতিসত্তার ত্রৈমাত্রিক সমন্বিত ধারণাটি জোরদার হয়ে উঠবে, এখানে বাংলাদেশীবোধ ও বাঙালীবোধকে সমন্বিত করে মুসলিমবোধ শক্তিশালী ও জোরদার হয়ে উঠবে। আমাদের মুসলিম জাতিসত্তা বিকশিত হওয়ার কতগুলো অনুকূল উপাদান রয়েছে এখানে। যেমন, আমাদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান আমাদের মুসলিম পরিচয়কে শাণিত করবেই। ভারতের অব্যাহত চাপ ও আগ্রাসন অনিবার্যভাবেই আমাদের মধ্যে তীব্র মুসলিম সেন্টিমেন্ট তৈরি করবে। এ থেকে সেক্যুলার দেশ প্রেমিকরাও মুক্ত হতে পারবেন না।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ, এ বোধ আমাদের মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশে প্রভূত শক্তি যোগান দিচ্ছে। আমরা মুসলিম উম্মাহর অংশ এ বোধ আমাদেরকে বিশ্ব মুসলিমের সাথে একাত্ম করে দিচ্ছে এবং এ একাত্মতাবোধ দিন দিন বৃদ্ধিই পাবে। অব্যাহত আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চাপ ও আগ্রাসন আমাদের মুসলিম বোধকে তীব্র করে তুলবেই। কেননা, আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির ভাবাদর্শগত উপাদান যে ইসলাম তা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোন বড় ধরনের ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা না ঘটলে এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। উপরোক্ত বিশ্লেষন থেকে আমরা এ যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে পনের শতকে মুসলিমবোধ ভিত্তিক আমাদের সমন্বিত জাতিসত্তার পূর্ণবিকাশ ঘটবে। বাঙালী, বাংলাদেশী ও মুসলিম-এ সমন্বিত জাতিবোধ তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। গড়ে উঠবে এক দ্বিধা ও অস্পষ্টতা মুক্ত এক বলিষ্ঠ জাতি, ভাষা-ভূগোল ও ধর্মকে সমন্বিত করে গতিশীল জাতীয়তাবোধ।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রাজধানী হবে ঢাকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে বৌদ্ধ পাল আমলে। হিন্দু সেন আমলে ভাষার বিকাশ সম্ভব হয়নি। কারণ সেন শাসকরা বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। বাংলার বিকাশকে রুদ্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছে। মুসলমান শাসকরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে। এর বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। মধ্যযুগের বড় বড় খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক যেমন, চণ্ডীদাস, শাহ ছগীর বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, জয়নুদ্দীন, বিজয়গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কবি শেখর প্রমুখ গৌড়ের স্বাধীন মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। গৌড়ই ছিল তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মূল কেন্দ্র। সতের শতকে ছিল আরাকান চট্টগ্রাম যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার কেন্দ্র। দৌলত কাজী ও আলাওলের মতো খ্যাতনামা কবিরা তখন আরাকানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আঠার শতকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠে আরবী-ফার্সী-উদু প্রভাবিত 'মুসলমানী বাংলা' -দুভাষী বাংলা। রচিত হয় বিপুল পরিমাণে পুঁথি সাহিত্য। শুধু মুসলমান কবি-সাহিত্যিকরাই নয় বরং ভারতচন্দ্রসহ হিন্দু কবিরাও 'দুভাষী বাংলায়' কাব্য রচনা করেন। ইতিমধ্যেই ইংরেজরা এদেশে আধিপত্য স্থাপন করে। তারা কোলকাতা নগরী গড়ে তোলে। ১৮০০ সালে

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নতুন কেন্দ্ররূপে কোলকাতার আবির্ভাব ঘটে। শেষ হয় মধ্যযুগ।

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য ফসল হচ্ছে লোক-সাহিত্য। এ লোক সাহিত্য পূর্ববঙ্গের নিজস্ব সম্পদ। মধ্যযুগে রচিত বাংলা কাব্যের অন্যতম বড় শাখা মঙ্গল কাব্য। এ মঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিরা যেমন কানা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ পর্ব বঙ্গেরই লোক। মধ্যযুগে যে সমস্ত কবি-সাহিত্যিকগণ ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে সাহিত্য রচনা করেন তাদের বেশির ভাগই আজকের বাংলাদেশের অধিবাসী। যেমন, দৌলত কাজী, বাহরাম খান, মুহাম্মদ কবির, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, সাবিরিদ খান, দৌলত কাজী ও আলাওল সবাই ছিলেন চট্টগ্রামের লোক, কবি শেখ চাঁদ ছিলেন ত্রিপুরার (কুমিল্লার) অধিবাসী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল ইসলামী ঐতিহ্যবাদী কবি কাজী হেয়াত মাহমুদ ছিলেন রংপুরের অধিবাসী। মোটকথা, মধ্যযুগে তদানীন্তন পূর্ববাংলা ও উত্তর বাংলা তথা আজকের বাংলাদেশ ছিলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের প্রধান কেন্দ্র।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগে কোলকাতা কালক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুগণ গড়ে তোলে 'সংস্কৃতমুখী-হিন্দু, ঐতিহ্যমুখী' সাহিত্য। ঔপনিবেশিক যুগে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোলকাতার প্রাধান্য বজায় থাকে। ৪৭ এ দেশ বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা তথা আজকের বাংলাদেশ বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার নতুন যুগ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়ে এ দেশের মানুষ ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর 'বাংলা' তাদের রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হয়। অন্যদিকে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলাভাষা ও সাহিত্য হিন্দীর চাপে কোণঠাসা হতে শুরু করে। বাংলা ভারতে সংখ্যালঘু বাঙালীর আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হয়। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র ও রাজধানীর প্রশ্ন নিয়ে বাংলা ১৪ শতকের শেষার্ধের দ্বিধাদ্বন্দ্ব-টানা হেচড়া ও স্নায়ুযুদ্ধ থাকলেও এখন দ্রুত কেটে যাচ্ছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র ও রাজধানী কোলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের (ঔপনিবেশিক আমলের) কেন্দ্র কোলকাতা থাকলেও পরিণত যুগের কেন্দ্র ইতিহাসিক ও বাস্তব কারণে ঢাকা হতে বাধ্য।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা হবে একটি শক্তিশালী ইসলামী ভাষা

ইসলামী ভাষা ও অ-ইসলামী ভাষা বলে প্রকৃত অর্থে কিছু নেই, সব ভাষাই আল্লাহ্‌র দান ও নিদর্শন। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ভাষা যখন ইসলামী শিক্ষা, চিন্তা চেতনা ও ভাবধারার প্রকাশ ও প্রসারের বলিষ্ঠ মাধ্যমে পরিণত হয় তখন তাকে একটি ইসলামী ভাষা বলে বিবেচনা করা হয়। যখন কোন ভাষায় ইসলামী মূল্যবোধ, সভ্যতা সংস্কৃতির বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটে; ভাষারীতি প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তু যখন ইসলামী ঐতিহ্যমণ্ডিত হয় তখন সে ভাষাকে ইসলামী ভাষা বলে আখ্যায়িত করা হয়। মূল কুরআন-হাদীসের ভাষা হিসেবে আরবী হচ্ছে মূল ইসলামী ভাষা। এছাড়া ইসলামী শিক্ষা ভাবধারা ও ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ ধারক-বাহক ও প্রকাশক হিসেবে ফার্সী ও উর্দু ভাষাকেই অন্যতম ইসলামী ভাষা বলে বিবেচনা করা হয়। মূলে এসব ভাষা বিশেষ করে ফারসী ভাষা ইসলাম ও মুসলমানদের ভাষা ছিলো না। ফারসী ছিলো অগ্নিপূজকদের ভাষা। কিন্তু চর্চা ও ব্যবহারের মাধ্যমেই তা আজ শক্তিশালী ইসলামী ভাষায় পরিণত হয়েছে। তেমনি চর্চার মাধ্যমে অন্যকোন ভাষাকেও বলিষ্ট ইসলামী ভাষায় পরিণত করা সম্ভব। আমাদের বিবেচনায় বাংলাভাষাকেও চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি অন্যতম শক্তিশালী ভাষায় পরিণত করা যেতে পারে। যেসব কারণে বাংলা ভাষা একটি উল্লেখযোগ্য ইসলামী ভাষায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তা প্রধানত নিম্নোরূপ ঃ

১. অনুকূল ঐতিহাসিক ধারা ঃ বাংলাভাষার উদ্ভব বৌদ্ধ আমলে। হিন্দু সেন আমলে বাংলার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। মুসলমান শাসকরা বাংলা ভাষাকে আবার পুনর্জীবিত করে। এর চর্চায় পৃষ্টপোষকতা দানকরে। বস্তুত মুসলিম আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত উন্মষ ও বিকাশ ঘটে। তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক পর্বের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছিল হিন্দু ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সংস্কৃত প্রভাবিত। কেননা, প্রথমতঃ তদানিন্তন বাংলাদেশে তখন পর্যন্ত মুসলমান জনসংখ্যার হার ছিলো কম। যদিও ইসলামের দ্রুত প্রসার হচিছলো কিন্তু মুসলমানরা তখনও সংখ্যাগুরু অংশে পরিণত হয়নি। কাজেই সংখ্যাগুরু অংশের চিন্তা-চেতনা-ধ্যানধারণা ও রীতি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম শাসকদের আনুকল্যে প্রাথমিকভাবে সংস্কৃত গ্রন্থাবলী যেমন রামায়ণ, মহাভারত, ভগবৎগীতা বাংলায় অনুবাদ শুরু হয়। এতে স্বাভাবিকভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্য হিন্দুভাবধারা পুষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ তখন ইসলামী শিক্ষার মাধ্যম ছিলো ফার্সী-আরবী, বাংলা নয়। কাজেই বাংলা ভাষায়

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী ভাবধারা প্রসারের প্রাতিষ্ঠানিক কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য কালক্রমে বাংলাভাষায় ফার্সী থেকে অনুবাদের মাধ্যমে ইসলাম ঐতিহ্য ও ভাবধারা প্রসারিত হতে থাকে। ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর কাব্য রচিত হতে থাকে। রাষ্ট্রভাষা ফারসীর প্রভাবে আরবী-ফারসী শব্দাবলী বাংলায় অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। তবুও ১৭ শতক পর্যন্ত বাংলাভাষা ও সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রাধান্য অব্যাহত ছিলো। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যের ভাষা আর্য-সংস্কৃত প্রভাবিত হলেও সাধারণ জনগণের ভাষা ছিলো অনার্য বাংলা। ১৮ শতকে এসে মোগল যুগের প্রভাবে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ মিশ্রিত দোভাষী বা 'মুসলমানী' বাংলা'র বিকাশ ঘটে। রচিত হয় বিপুল পরিমাণ ইসলামী ঐতিহ্যমন্ডিত পুঁথি সাহিত্য। 'মুসলমানী বাংলা' শুধু মুসলমান লেখকগণই ব্যবহার করতেন না, হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণও সে ভাষা ব্যবহার করতেন। কিন্তু এ মুসলমানী বাংলার প্রকৃত বিকাশ সাধনের পূর্বেই এদেশ ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে চলে যায়। ফলে বিকাশমান বাংলাভাষার সম্ভাবনাময় নতুন ধারাটি রুদ্ধ হয়ে গেলো।ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের ভাষায় ঃ "যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এ পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ ১৯৬৭, পৃ ২৭১)।

১৯ শতকে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুগণের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা সাহিত্য আবার সংস্কৃতমুখী ও হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়ে পড়লো। ২০ শতকে এসে কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর অনুগামীদের প্রচেষ্টায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম দুটো পৃথক ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়।একটি হিন্দু ও সংস্কৃত ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারা আর অপরটি আরবী-ফার্সী সমৃদ্ধ মুসলিম ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারা ও মুসলিম ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারার পাশাপাশি প্রধানত বাম লেখকদের প্রচেষ্টায় একটি সেক্যুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ ধারাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গভীরতর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ধারাটি প্রধানত হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারার সহগামী মাত্র। এখন বাংলাভাষা ও সাহিত্যে দুটো প্রধান ধারা লক্ষণীয় ১. হিন্দু ও প্রাক মুসলিম ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারা, ২. মুসলিম চেতনা সমৃদ্ধ ধারা। কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং এদেশের তাদের সমর্থক ও অনুগামী সাহিত্যকর্ম প্রথম ধারার বাহক। আর বাংলাদেশের তাবৎ সাধারণ জনগণের ভাষা ও এদেশের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী কবি সাহিত্যিকদের রচনাসমূহ দ্বিতীয় ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। উল্লিখিত দ্বিতীয় ধারাটিই দিন দিন বলিষ্ঠ হবে এবং কালক্রমে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মূলধারায় রূপান্তরিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

২. জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় ভাষা ঃ আমাদের জাতীয় আদর্শ ইসলাম, জাতীয় ভাষা বাংলা। জাতীয় আদর্শ অবশ্যই জাতীয় ভাষায় প্রতিফলিত হবে। দিন যতই যাবে ততই আমাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা দ্বারা সমৃদ্ধ হবে আমাদের ভাষা। স্বকীয় আদর্শ ও স্বকীয় ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইসলামের চর্চা যত বাড়বে, ইসলামী ভাবাদর্শের যত প্রসার ঘটবে আমাদের ভাষায় ততই এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। ভাষার অবয়ব নির্মাণে, ভাষার বিষয়বস্তু নির্ধারণে, ভাষার গতিপথ রচনায় জাতীয় আদর্শের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কাজেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে ইসলাম একটি বলিষ্ঠ উপাদানরূপে কাজ করবে যুগ যুগ ধরে। আর এভাবেই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে, এর ইসলামী রূপটি পুষ্টি লাভ করবে।

৩. জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ভাষাকে স্বতন্ত্ররূপ দেবে ঃ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। এ দেশের মানুষ একটি স্বতন্ত্র জাতি। পশ্চিবঙ্গ বা ভারতীয় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে বাংলাদেশের মানুষ একটি জাতি গঠন করেছে। এ পৃথক জাতিসত্তার একটি ভিত্তি যেমন বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড তেমনি আরেকটি ভিত্তি মুসলিম পরিচয়বোধ। প্রকৃতপক্ষে এ দেশের ভূগোল ও মুসলিম পরিচয় ঐতিহাসিকভাবে একাত্ম। কাজেই মুসলিমবোধই এ জাতির স্বাতন্ত্র্যের মর্মমূলে। এমতাবস্থায় আমাদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যও গড়ে উঠবে মুসলিম পরিচয়ের ভিত্তিতে। ফলে এদেশের ভাষায় মুসলিমবোধ পরিচয় প্রখর হবে, বলিষ্ঠ হবে। কালক্রমে ভাষা ও ইসলামী ভাবাদর্শ একাত্ম হয়ে যাবে। আর এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বাংলাভাষা একটি শক্তিশালী ইসলামী ভাষায় পরিণত হবে।

৪. ইসলামী শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমরূপে বাংলা ঃ এদেশে কোন কালেই ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা ছিল না। ফলে বাংলা ভাষা ইসলামী ভাব প্রকাশের দিক থেকে দুর্বল রয়ে গেছে। বাংলা ভাষা ইসলামী ভাবধারার পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হতে পারেনি। কোন ভাষা যদি ইসলামী শিক্ষার বাহন হয়, কোন ভাষার মাধ্যমে যদি ইসলামের চর্চা ব্যাপক হয় তাহলে ভাষাটি ইসলামী ভাবধারায় অবশ্যই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, তার মধ্যে ইসলামী চিন্তা চেতনার ধারণক্ষমতা বাড়বে। এমনকি ইসলামী ভাব প্রকাশক বিপুল পরিমাণ শব্দও সে ভাষায় প্রবেশ করবে, ফলে ভাষাটি সমৃদ্ধ হবে। আর এ সমৃদ্ধি ভাষার ইসলামী রূপটিকেই শক্তিশালী করবে। বর্তমানে বাংলাভাষায় ইসলাম চর্চা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। মাদ্রাসাগুলোতে বাংলাভাষা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া আরো জোরদার হবে। বাংলা ভাষায় ইসলামের মূল গ্রন্থাদিরও ব্যাপক অনুবাদ শুরু হয়েছে। বাংলায় ইসলামী জ্ঞান গবেষণা ও বই পুস্তক রচনার কাজ বিস্তার লাভ করছে। এতে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও ইসলামী ভাবধারার সমন্বয়

www.nagorikpathagar.org

ঘটবে। এ ধরনের ব্যাপক চর্চার কারণে বাংলা ভাষার ইসলামী রূপটি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে। বস্তুত বাংলা ভাষায় ইসলামী শিক্ষার চর্চা যত বাড়বে এদেশের ভাষা তত ইসলামী ভাবধারা যুক্ত হবে।

৫ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধের ফলশ্রুতি ঃ আমাদের সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্য ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার। এ আগ্রাসন রোধের অন্যতম উপায় হচ্ছে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শিক স্বাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, আমাদের নিজস্ব রীতি ও জীবনবোধ দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা। এ প্রক্রিয়া যত জোরদার হবে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য ততই ইসলামী হয়ে উঠবে।

৬ দেশে ইসলামী জাগরণের প্রভাব ঃ দেশে ক্রমবর্ধমান ইসলামী জাগরণ হচ্ছে। দেশের মানুষের মধ্যে যদি ইসলামী চিন্তা চেতনা বৃদ্ধি পায়, মানুষের মধ্যে যদি ইসলামী জাগরণ ঘটে, আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে যদি ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য এর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনা। বরং জাতীয় জীবনে ইসলামের জাগরণের সাথে সাথে ভাষা-সাহিত্যেও জাগরণ ঘটবে।

৭ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বকীয়তার উজ্জীবন ঃ আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বকীয়তার উজ্জীবনের জন্যে কোলকাতা মুখী ভাষা ও সাহিত্য থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন। কোলকাতার সাহিত্যের ভাব ও ভাষা আমাদের স্বকীয়তার প্রতিনিধিত্ব করেনা। প্রয়োজন আমাদের স্বকীয়তার উজ্জীবন। আর এ উজ্জীবন আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ করবে। পশ্চিমবঙ্গীয় দেবদেবী কেন্দ্রিক পৌত্তলিক সাহিত্যের পরিবর্তে তওহীদবাদী সাহিত্য গড়ে উঠবে। মানবীয় সাহিত্যকর্মেও থাকবে ইসলামের মহান ভাবধারা ও শিক্ষার প্রভাব। এভাবেই আমাদের ভাষা ও সাহিত্য কালক্রমে একটি শক্তিশালী ইসলাম ভাষা ও সাহিত্যে রূপ নেবে। পনের শতকে এ প্রক্রিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ হবে ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ঃ বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশের ৯০% ভাগ মানুষ মুসলমান এবং এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ দেশের মানুষ পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশের চেয়ে অধিকতর ধর্মপ্রাণ ও মুসলিম চেতনা সম্পন্ন। উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই ইসলাম সর্বাধিক প্রত্যন্ত গভীরে প্রবিষ্ঠ হয়েছে। এদেশের সাধারণ মানুষ সর্বাধিক হারে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এদেশে সুফী দরবেশ শ্রেণী ও সাধারণ আরব ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। এদেশ ইসলামের সূচনাকাল থেকেই সূফী দরবেশগণের অনুকূল চারণ ভূমি। হাজার বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে এদেশে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী সংস্কৃতির ভিতটি দৃঢ়ভাবে নির্মিত হয়েছে। এদেশের সোনার গাঁও, সীতাকুণ্ডসহ বিভিন্ন এলাকায় ছিল একদা বড় বড় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। বর্তমানে এদেশে রয়েছে প্রায় দুলক্ষ মসজিদ যার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। ঢাকা শহরে যত মসজিদ রয়েছে পৃথিবীর কোন দেশে রাজধানীতে পাওয়া যাবে না। এদেশে রয়েছে হাজার হাজার আলেম-উলামী-পীর মাশায়েখ-ওয়ায়েজ। তবলীগ জামাতের সবচেয়ে বেশী তৎপরতা বাংলাদেশেই। তবলীগের বার্ষিক বিশ্ব এজতেমাও এখানে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার লোকসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে অংশ নেয়। এদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার ওয়াজ মাহফিল সীরাত মাহফিল, মীলাদ মাহফিল, অনুষ্ঠিত হয়। এসব এদেশের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও সংস্কৃতির বিশালতারই প্রমাণ। এদেশে ইসলামী আন্দোলনও অত্যন্ত মজবুত। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রসর।

এদেশে ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশনা ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা এখনও অপ্রতুল, তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে। গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। পনের শতকে আশা করা যায় এদেশ হবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। এখানে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশের সম্ভাবনা। বাংলা ভাষায় ইসলামের ব্যাপক চর্চা বেড়ে গেলেই এদেশে ইসলামের ব্যাপক জাগরণ ঘটবে। সৃষ্টি হবে বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ, কবি সাহিত্যিক, রচিত হবে ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট সাহিত্য। অতএব গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে এ প্রত্যাশা সহজভাবেই করা যায়।

দারিদ্র বিমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ছিল একদা সমৃদ্ধশালী দেশ। বাংলাদেশের সম্পদ ও পণ্যের লোভে ইউরোপীয়রা এসেছিল এদেশে। তারা এদেশে ক্ষমতা দখল করে দুশো বছরে চালিয়েছে ভয়াবহ শোষণ-লুণ্ঠন। ভেঙ্গে দিয়েছে এ দেশের অর্থনীতির ভিত। স্বাভাবিকভাবে দারিদ্রের কবলে নিপতিত হয়েছে এদেশের মানুষ। উপনিবেশোত্তর সময়েও এদেশের প্রতি অবহেলা অব্যাহত থাকে। বর্তমানেও এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। তাছাড়া নানা সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অস্থিরতা এদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে রেখেছে। কিন্তু এদেশ অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময়। যে জাতি মধ্যযুগে সমৃদ্ধ ছিল সে আজ আবার সমৃদ্ধ হতে পারবে না- এ ধারণা অমূলক। বরং বাংলাদেশে অর্থনীতির যে সম্ভাবনা আছে তা কাজে লাগাতে পারলে এদেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। পৃথিবীর বহুদেশ আমাদের চেয়েও কম সম্পদ নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। শুধু প্রয়োজন উদ্যোগ, পরিশ্রম ও দক্ষতা।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের রয়েছে বিপুল জনসম্পদ। এ জনসম্পদকে দক্ষ করতে পারলে আমাদের নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়েও বিপুল পরিমাণ জনশক্তি রফতানি করতে পারবো। পৃথিবীর বহুদেশে জনশক্তির প্রয়োজন বর্তমানে যেমন আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা এ প্রয়োজন বহুলাংশে মিটাতে পারবো। ভোগ্যপণ্য সস্তায় তৈরি করে পৃথিবীর অনেক দেশেই সরবরাহ করতে পারব। কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটলে আমরা পশ্চিমা বহুদেশের দক্ষ শ্রম বিক্রি করতে পারব। এদেশের মৎস্য, দুধ, পোশাক ও বস্ত্র, চামড়া-জুতা শিল্পের রয়েছে অপরিসীম সম্ভাবনা। কৃষি ক্ষেত্রেও রয়েছে আমাদের বিপুল সম্ভাবনা। এখন প্রয়োজন পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও দক্ষতা। প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি। প্রয়োজন জনতার জাগরণ। আর এর জন্যে প্রয়োজন দেশপ্রেমিক দক্ষ ও আদর্শবাদী সরকার। পনের শতকে আশা করা যায় আমাদের এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। দেশের মানুষের দারিদ্র মানুষকে বাধ্য করবে সামনে দিকে চলার। দরিদ্র ইউরোপ একদা ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ ভাগ্যের সন্ধানে বাংলাদেশের মানুষকেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজ বাংলাদেশে ক্ষীণ হলেও এ লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পনের শতকে এ প্রক্রিয়াটি জোরদার হবে, পূর্ণতা লাভ করবে এ প্রত্যাশা করা যায়। আর এ প্রক্রিয়া যদি জোরদার হয় তাহলে অনিবার্যভাবেই এ দেশের দারিদ্র দূর হবে, দেশ অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করবে।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ও উপনিবেশোত্তর সময়ে এদেশের মানুষ বহু পরিবর্তন দেখেছে। কিন্তু দেশের মানুষের আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। দেশের সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। অথচ সমস্যা সমাধানের নাম করে এখানে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র,পশ্চিমা গণতন্ত্র,ইত্যাদি বহু কিছুর পরীক্ষা করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে এসব পদ্ধতি সবই ব্যর্থ হয়েছে। এ দেশের মানুষের সামনে একটি পথই খোলা রয়েছে। আর তা হচ্ছে ইসলাম। এদেশের মানুষের গভীর ইসলামী মনোভাব ও তাদের ইসলাম ভিত্তিক আশা আকাঙ্খা জোরদার হচ্ছে। তারা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুকে পড়ছে। অন্যদিকে এদেশে ইসলামী তৎপরতা যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি জোরদার এবং তা দিন দিন আরো বেশী প্রবল হবে এটা আশা করা যায়। একদিকে পশ্চিমা পদ্ধতিগুলোর ব্যর্থতা অন্যদিকে ইসলামের উত্থান ও জাগরণ এদেশে একটি জনমুখী ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলে। তাছাড়া সারা

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়াই চলছে ইসলামের জাগরণ, এ প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী হবে। মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসাবে বাংলাদেশেও এ জাগরণের ঢেউ লাগবে। তাছাড়া আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তার জন্যেও ইসলামই হতে পারে গ্যারান্টি। ইসলামের ভিত্তিতেই জনতার দুর্ভেদ্য ঐক্য ও সংহতি সম্ভব। জনতার বিপুল জাগরণও ইসলামে ভিত্তিতে সম্ভব হতে পারে। এককথায়, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কার্যকারণে এদেশে একটি শক্তিশালী ইসলামী সমাজ ওরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। পনের শতকে এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিবে বলে আশা করা যায়।

উপরোল্লিখিত ছয়টি মৌলিক প্রত্যাশা নিয়েই ১৫শ শতাব্দীর যাত্রা শুরু। এ জাতির আকুতি এসব প্রত্যাশা রূপায়ণ। কিন্তু যে কোন প্রত্যাশা রূপায়নে প্রয়োজন কঠোর ও একনিষ্ঠ সাধনা। প্রয়োজন দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। যদি আমরা জাতির অন্তঃস্থিত এ প্রত্যাশা রূপায়িত করতে চাই তাহলে আমাদের প্রয়াস চালাতে হবে, আমাদের পরিকল্পিত চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। শতাব্দী আমাদের কাছে দাবি করে ব্যাপকভিত্তিক জাগরণ ও সংগ্রাম। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের জাতীয় জীবনের বাঞ্ছিত প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করার জন্যে এখানে ষড়যন্ত্র আছে, আগ্রাসন আছে। যদি আমরা প্রত্যাশার সফল বাস্তবায়ন চাই তাহলে সমস্ত ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের মোকাবেলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি ও জাগরণের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই নতুন শতাব্দীর প্রত্যাশা অতীতের মতোই বাস্তবে রূপ নেবে। পূর্ণ বিকশিত জাতিসত্তা, ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলাভাষার জাগরণ ও বিকাশ, ইসলামের অন্যতম ভাষারূপে বাংলার অভ্যুদয়, দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধ ইসলামী বাংলাদেশ নিয়েই এ জাতি বাংলা ১৬শ শতাব্দীতে পদার্পণ করতে পারবে-ইনশাল্লাহ।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

১। আল কুরআন

২। বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২

৩। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

৪। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পাদনা), বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৮৭ বাংলা। এবং প্রাচীনযুগ, ১৯৮১।

৫। ডঃ এম, এ, রহীম; বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৯।

৬। ডঃ এম, এ, রহীম; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

৭। রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়; বাঙালার ইতিহাস ১ম খন্ড।

৮। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)।

৯। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলা ও বাংগালী-মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৩৯৭ বাংলা।

১০। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৮১।

১১। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খন্ড, ১৯৮১।

১২। সুখময় মুখোপাধ্যায়; বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর।

১৩। গোলাম হোসেন সলীম; রিয়াজুস সালাতীন।

১৪। ডঃ আবদুল করিম; বাংলার ইতিহাস।

১৫। মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

১৬। চৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা।

১৭। আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৭৭।

১৮। বদরুদ্দীন ওমর, ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি।

১৯। মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১৯৬৫।

২০। কাজী আমিনুল ইসলাম, বাংলার রূপরেখা, কলিকাতা।

২১। দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য।

২২। মোতাহের হোসেন সূফী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পুথিঘর লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৮।

২৩। ডঃ অতুল সুর; দুই বাংলা কি এক হবে?

২৪। আখতার ফারুক: বাংগালীর ইতিকথা।

২৫। শ্রীচারু বন্দোপাধ্যায়; রামাই পন্ডিতের শূন্য পুরান।

২৬। চর্যাগীতি, অধ্যাপক হরলাল রায়।

২৭। ওয়াকিল আহমদ; সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৭।

২৮। বিশ্বেশ্বর চৌধুরী; টেকনাফ থেকে খাইবার।

২৯। অধ্যাপক মুয়াযম হোসেন খান, মুজিববাদ, বর্ণমালা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭১।

৩০। আবদুল করিম, 'বঙ্গ ঃ বাঙালা ঃ বাংলাদেশ, মানব উন্নয়ন বক্তৃতা, উচ্চতর মানব গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭।

www.nagorikpathagar.org

৩১। অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।
৩২। ডঃ এনামুল হক, মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৯।
৩৩। অধ্যাপক শ্রী দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ, প্রাচীন বাঙ্গালার সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস।
৩৪। আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০।
৩৫। আবুল মনসুর আহমদ, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১।
৩৬। আবুল মনসুর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৫।
৩৭। গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খন্ড, মুক্তধারা, ১৯৮০।
৩৮। গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ১৯৮৪।
৩৯। আহমদ শরীফ, মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।
৪০। আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, বর্ণমিছিল, ঢাকা ১৯৭৮।
৪১। সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদনা), পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪২। আহমদ ছফা, বাঙালী মুসলমানের মন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১।
৪৩। ডাঃ হাসান জামান; সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা (ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১৯৮০।
৪৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৌষ ১৩৩৮, (শিবাজী উৎসব ও বন্দী বীর)।
৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ) ১৯৩৯।
৪৬। বঙ্কিম চন্দ্র (সম্পাদক) মাসিক বঙ্গ দর্শন, কার্তিক, ১২৮৫ বাংলা।
৪৭। বঙ্কিম চন্দ্র (সম্পাদক) মাসিক বঙ্গ দর্শন, অগ্রহায়ন, ১২৮৭ বাংলা।
৪৮। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত।
৪৯। বদরুল আলম খান (সম্পাদক) "বাংলাদেশ ধর্ম ও সমাজ" সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮।
৫০। আব্দুল হক, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসংগ, বই ঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৮০ বাংলা।
৫১। তালেবুর রহমান, সর্বহারাদের পাকিস্তান।
৫২। মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাতীয়তা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৪।
৫৩। ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার, দি উন্ডিয়ান মুসলমান, (বাংলা অনুবাদ-এম, আনিসুজ্জামান), খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮২।
৫৪। আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯।
৫৫। সালাহউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঐতিহ্য ও ইতিহাস (স্বাধীনতা প্রবন্ধ সংকলন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।
৫৬। এম, এন রায়; ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান (The Historical Role of Islam এর বাংলা অনুবাদ), শতদল প্রকাশনী, ঢাকা।
৫৭। ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।
৫৮। আ, ত, ম মুসলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২।
৫৯। ফারুক মাহমুদ, ইতিহাসের অন্তরালে, ওয়েসিস বুক, ঢাকা, ১৯৮৯।
৬০। সৈয়দ আলী আহসান; আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, বাড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।
৬১। প্রথম প্রভাত, বঙ্গবিজয়ের ৭৯৩তম বার্ষিকী স্মারক, ঢাকা, ১৯৯৭।

www.nagorikpathagar.org

৬২। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত, ১ম খন্ড।
৬৩। সায়্যিদ আতহার আব্বাস রিজভী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি (বাংলা অনুবাদঃ এম, রুহুল আমিন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮।
৬৪। আবদুল মান্নান তালিব; সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষাঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১।
৬৫। কাজী আবদুল ওয়াদুদ, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, বিশ্ব ভারতী, ১৯৩৬।
৬৬। কাজী আবদুল ওয়াদুদ; বাংলার জাগরণ, বিশ্ব ভারতী, ১৯৩৬।
৬৭। মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৫৬।
৬৮। সুকুমার সেন; ইসলামী বাংলা সাহিত্য, কোলকাতা, ১৯৫১।
৬৯। শেখ মুহাম্মদ জমির উদ্দীন; মেহের চরিত, কোলকাতা, ১৯০৯।
৭০। ডঃ এনামুল হক; বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৯১৫।
৭১। মোহাম্মদ গোলাম হোসাইন, বঙ্গ দেশীয় হিন্দু মুসলমান কলিকাতা, ১৯১০।
৭২। কিউ এ মান্নান, আধনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, রাজশাহী, ১৯৬১।
৭৩। সিকান্দর আলী মিয়া, মুসলমানের সমাজ তত্ত্ব, ঢাকা, ১৯১৭।
৭৪। ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮।
৭৫। আনিসুজ্জামান; মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪।
৭৬। এডভোকেট বদিউল আলম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪।
৭৭। অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর এম. এ. জলিল।
৭৮। আনম বজলুর রশীদ, পাকিস্তানের সূফী সাধক।
৭৯। ডঃ গোলাম সাকলায়েন, পূর্ব পাকিস্তানের সফী সাধক।
৮০। অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন আহমদ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা।
৮১। এম. আর, আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি।
৮২। কমরুদ্দিন আহমদ, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় ও অতঃপর।
৮৩। প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ সোলাইমান, প্রসঙ্গঃ সংস্কৃতি।
৮৪। আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৮৫। মোতাহার হোসেন চৌধুরী, সংস্কৃতি কথা।
৮৬। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
৮৭। মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা।
৮৮। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাঙলা নাটক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৬৪।
৮৯। ডঃ হাসান জামান, সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭।
৯০। শ্রীশ চন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন, কথাকলি, ঢাকা।
৯১। ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

Bibliography

1. *Lucian W. Pye, Aspects of Political Development, Boston, Little Brown and Company (Inc) 1966.*
2. *C.W. Welch Jr (ed), Political Modernization-A reader in the comparative Change. California, Duxbury press, 1977.*
3. *Jason L. Finkle and Richard W. Gable (ed), Political Development and Social Change (2nd Edition), John Willey and Sons Inc, New York. 1971.*
4. *David E.Apter; The Politics of Modernization, Chicago, University of Chicago press, 1965.*
5. *Lucian Pye and Sidney Verba (eds); Political Culture and Political Development, Princeton University press. 1965.*
6. *Gabrial Almond and G. Bigham Powell, jr.; comparative Politics & Developmental Approach, Boston, Little Brown & Co. 1966.*
7. *Robert A Nisbet, Social Change and History, New York, Oxford University press, 1969.*
8. *A.F.K. Organski, The Stages of Political Development, New York, 1965.*
9. *Ram Gopal, Indian Muslims: A Political History, Bombay, Asia Publishing House, 1964.*
10. *Kalim Siddiqui, Conflict Crisis and War in Pakistan, Macmillon, London, 1972.*
11. *Istiaq H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, karachi University press, 1969.*
12. *M.H. Saiyid, Muhammad Ali Jinnah, A Political Study, Shah Muhammad Ashraf, Lahore, 1962.*
13. *Stanly Wolpert, Jinnah of Pakistan, Oxford University press, New york.*
14. *Percival Spear, India Pakistan and the West, London, 1965.*
15. *G.W.Chowdhury: Constitutional Development in Pakistan, Longman, London, 1959.*
16. *Khalid B. Sayeed, The Political Systems of Pakistan, Boston, 1967.*
17. *Rupert Emerson, From Empire to Nation, Cambridge, Massachusetts, 1967.*
18. *Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in National Integration, Columbia University press.*

www.nagorikpathagar.org

19. *Hans Cohn: The Idea of Nationalism, Its Origin and Background, New York, 1944.*
20. *Solo W. Baron: Modern Nationalism and Religion, 1926.*
21. *Luigo : Nationalism and Internatnationalism, New York, 1926.*
22. *Dr. Ali Naqavi, Islam and Nationalism, Islamic Propagation Organization, Tehran, 1988.*
23. *International Encyclopedia of Social Science vol.11 & 12. Macmillon and Free press, New York, 1972.*
24. *Rofiuddin Ahmed, The Bengal Muslims (187-906), A Quest for Indentity, Oxford University press, Delhi, 1981.*
25. *Adlof Hitlar, Houghton Naiffin Company, Boston, 1943.*
26. *Maryam Jameelah. Western Civilization Condemned by itself, Vol. 1, Mohammad Yusuf Khan, Lahore, 1976.*
27. *Kalim Siddiqui (ed.); Issues in the Islamic Movement, 1981-82, The Open Press Limited, London, 1983.*
28. *Dr. Mainuddin Ahmed Khan, Muslim Struggle for.Freedom in Bengal (1757-1947) Islamic Foundation, Dhaka, 1982.*
29. *Dr. Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol.1.*
30. *Kamruddin Ahmad; A social History of Bengal.*
31. *W.W. Hunter, Annals of Rural Bengal.*
32. *Sukumar Sen; History of Bengali Literature, New Delhi, 1960.*
33. *Prof. M. G. Rasul; The Advent of Islam in Bengal, Its Social and Cultural Impact, Journal of the Department of Islamic History and culture, University of Chittagohng, October, 1986.*
34. *Muhammad Enamul Hoq, A History of Sufism in Bengal.*
35. *Dr. Ayub Ali; History of Traditional Islamic Education in Bangladesh.*
36. *Dr. Sayed Ali Ashraf; Muslim Traditions in Bengali Liturature.*
37. *H.G. Rowlison; India: a Short Cultural History, London, 1937.*
38. *Maudud Ahmad, Constitutional Quest, Era of Sheikh Mujib.*
39. *Dr. Ali Shariati, On the Sociology of Islam (English Translation, Hamid Algar), Mizan Press, Barkley, 1979.*
40. *Abul Fazal Ezzati; The Revolutionary Islam and Revolution, Ministry of Islamic Guidance, Islamic Republic of Iran, Tehran, 1981.*
41. *Ahmad Abdul Quader; From Nation- State to Ummah-State: How? (An unpublished seminar paper), Muslim Institute, London, 1985.*
42. *Hafeez Malik, Moslem Nationalism in India and Pakistan, Washington D.C. 1963.*
43. *Abdul Hamid, Muslim Separatism in India: A Brief Survey 1858-1947, Oxford, 1967.*

www.nagorikpathagar.org

44. T.W. Wallbank(ed), The Partition of India: Causes and Responsibilities. Boston, 1966.
45. P. Hardy, The Muslims in British India, Cambridge, 1972.
46. Asim Roy, Islam in the Environment in Medieval Bengal, A.N.U.Canberra, 1970.
47. A.K. Nazmul Karim, The Modern Muslim Political Elites in Bengal, London, 1964.
48. Muin-ud-Din Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement in Bengal 1818-1906, Karachi 1965.
49. Aziz Ahmad, An Intellectual History of Islam in India, Edinburgh 1969.
50. Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964, London 1967.
51. Baharuddin A. Bogra, The Bengal Mussalmans, Calcutta 1885.
52. F.B.Bradley-Birt, Tweleve Men of Bengal in the nineteenth Century, Calcutta 1910.
53. S.K. Chatterje, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta 1926.
54. Syed Nawab Ali Chaudhry, Vernacular Education in Bengal, Calcutta 1900.
55. S.K. De, History of Bengali Literature 1800-1825, Calcutta 1919.
56. J.N Farquhar, Modern Religious Movements in India, London 1929.
57. Z.H. Faruqi, The deoband School and the Demand for Pakistan, Calcutta 1963.
58. Sayyid abul Fazl, On the Muhammadans of India Calcutta 1862.
59. J.C. Ghosh, Bengali Literature, London 1948.
60. Leonard A. Gordon, Bengal: The Nationalist Movement 1876-1940, New York & London 1974.
61. Abdul Hamid, MuslimSeparatism in India; A Brief Survey 1858-1947, Oxford 967.
62. E. Haque, (ed.), Nawab Bhadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents, Dacca 1968.
63. P. Hardy, Ten Muslims of Britsh India, Cambridge 1972.
64. C.H. Heimsath, Indian Nationalism and Hindu Social Reform, Princeton & New Jersey 1964.
65. Syed Ammer Hossein, A Pamphlet on Mahomedan Education in Bengal, Calcutta 1880.
66. W.W. Hunter, The Indian Musalmans, 2nd ed. London 1872.

www.nagorikpathagar.org

67. M. Nurul Islam, Bengal Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali press 1901-1930, Dacca 1973.
68. M.A. Khandoker, Islam in India's Transition to Modernity, Bombay, Calcutta & Madras 1968.
69. Abdul Karim, A Social History of the Muslims of Bengal, down to A.D. 1538, Dacca 1959.
70. Abdul Karim, Muhammadan Education in Bengal, Calcutta 1900.
71. A.K.M. Nazmul Karim, Changing Society in India and Pakistan, Dhaka, 1956.
72. Muin-ud-Din Ahmad Khan, History of Faraidi Movement in Bengal, 1818-1906, Karachi.
73. W.N.Lees, Indian Musalmans, London & Edinburgh 1871.
74. Bernard Lewis(ed) The World of Islam: Faith, people and Culture, London 1976.
75. Sir Verney Lovett, A History of Indian Nationalist Movement, London 1921.
76. Nawab Abdul Lateef, The present Condition of the Indian Mohamedans and the Best Means for its Improvement, Calcutta, 1888.
77. B.B. Majumdar, History of Political Thought: From Ram mohun to Dayananda, Calcutta, 1934.
78. R.C. Majumdar, History of the Freedom Movement of India, Calcutta, 1962.
79. M.M. Pickthal, Cultural Side of Islam.
80. Probha N. Chopra, ed. Encyclopaedia of India, Rima pub. Hse. 1
81. Sufia Ahmad, The Muslum Community in Bengal,1884-1912, Dacca 1974.
82. Chaudhuri Muhammad Ali, The Emergence of Pakistan, New York & London 1967.
83. Qeyamuddin Ahmad, The Wahabi Movement in India, Calcutta 1966.
84. Faizee, Islamic Culture.
85. A.R. Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856, Dhaka, 1961.
86. Q.A. Mannan, The Emergence & Development of Dobhasi Literature in Bengal, Dhaka 1966.
87. Benoy gopal Roy, Religious Movements in Modern Bengal, Visva Bharati, 1965.
88. K.Fuzli Rubbee. The Origin of the Muhammadans of Bengal, The Journal of the East Pakistan History Association, Dhaka March 1968.

www.nagorikpathagar.org

89 Pradip Sinha, Ninteenth Century Bengal: Aspects of Social History, Calcutta, 1965.
90. M.,R. Tarafdar, Hussain Shahi Bengal 1494-1538, Dhaka, 1965.
91. The World Book, Multimedia Encyclopedia, 1998 World Book, Inc, Chicago.
92. Encyclopedia of World Cultures, 10 vols. G.K. Hall, 1991-1994.
93. Marvin Harris, Culture, People, Nature, Harper Collins, 1990.
94. Karen Liptak, Coming of Age: Traditions and Ritual Around the World, Millbrook, 1994.
95. An Encyclopedia of Language, Neville E. Collinge ed. Routledge, 1990.
96. Bernard Comprie, ed. The World's Major Languages, Oxford, 1990.
97 David Crystal, An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages, Blackwell, 1992.
98. Maj. General Sukhawanta Singh, The Liberation of Bengal.
99. Dr. Md. Mohar Ali (ed.), Nowab Abdul Latif Khan Bahadur: Autobiography and Other Writings, The Mehrub Publications, Chittogong, 1968.
100. T.W.Arnold, The Preaching of Islam, 2nd ed., London 1913.
101. I.H. Qureshi, Muslim Community of Indo-Pakistan Sub-Continent.
102. M.Z.Siddiqui, International Colloqium.
103. R.C. Majumdar, The Mutiny of 1857.
104. S.B.Roy Chowdhury, Theories of Indian Mutiny
105. Memoirs of Amir Ali, Islamic Culture.
106. A.R. Mollick, partition of Bengal,
107. Qamruddin Ahmed, Social History of East Pakistan.
108. T.S. Eliot, Notes Towards the Definiton of Cultre.
109. Philip Bagby, Culture and History.
110. Boas, General Anthropology.
111. Tylor, Primitive Culture
112. Mariam Jamila, Islam Versus the West, Muhammad Yusuf khan, Lahore, 1976.
113. Aziz Ahmad, Studies in Islamic Culture in the Indian enviornment, Oxford 1969.
114. S.N. Banerjea, A Nation in Making, London 1925, rèprinted Calcutta, 1963.
115. Abdul Karim, Some Political, Economical and Soial Questions, Calcutta 1917.

www.nagorikpathagar.org

প্রমিনেন্ট-এর
প্রকাশিত বই

- বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস
- মুসলিম মনীষীদের বাণী চিরন্তনী
- ইসলামিক ডায়েরি
- ইসলামি সাধারণ জ্ঞান
- ইসলামি জ্ঞানকোষ
- ইসলাম ও মানবাধিকার
- মুসলিম পারিবারিক আইন নির্দেশিকা
- ইসলামি পুনর্জাগরণ: প্রয়োজন গতিশীল নেতৃত্ব
- প্রমিনেন্ট ইসলামিক স্টাডিজ [এম. এ প্রিলিঃ]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিক, লেখক ও গবেষক অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের ১৯৫৫ সালে হবিগঞ্জ জিলার অন্তর্গত মাধবপুর উপজিলার আলাদাউদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি এস এস (সম্মান) ও এম এস এস এবং ঢাকা সিটি 'ল' কলেজ থেকে এল এল বি ডিগ্রী লাভ করেন। অতপর তিনি বিশিষ্ট আলেমদের তত্ত্বাবধানে ইসলামী বিভিন্ন শাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা লাভ করেন। পেশাগতভাবে তিনি ঢাকার একটি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত।

জনাব কাদের ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে তিনি লিখে থাকেন। এ পর্যন্ত ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন-সংগঠন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মুসলিম উম্মাহ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ২২টি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ১.সোনালী পথ ২. দারিদ্র সমস্যা সমাধানে ইসলাম ৩. সভ্যতা সংকট দিগদর্শন ৪. মুক্তি শান্তি প্রগতি ৫. সত্য সুন্দর বিপ্লব তারুণ্য ৬. পতনের বেলাভূমিতে বস্তুবাদী সভ্যতা ৭. খেলাফতঃ মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য ৮. মুসলিম ঐক্য ও সংহতি ৯. সেবা দারিদ্র বিমোচন ইসলাম ১০. মৌলবাদ ১১. মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ ও আজকের প্রেক্ষিত ১২. জিহাদ কি ও কেন ১৩. ইসলামী আন্দোলন ১৪. ইসলামী আন্দোলন ঃ জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই ১৫. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অপরিহার্য কেন? ১৬. ইসলামী বিপ্লব ১৭. ইসলামী বিপ্লব ঃ পথ ও পদ্ধতি ১৮. ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে গণআন্দোলন ১৯. ইসলামী আন্দোলন ও উলামা সমাজ ২০. আদর্শ কর্মী ২১. আদর্শ সংগঠন ২২. ঈমানের পথ রক্তে রাঙা। এছাড়াও তার শতাধিক নিবন্ধ ও দশটির মতো গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ছাত্র জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ছাত্র জীবন থেকে এপর্যন্ত বিভিন্ন সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি (১৯৮২), ইসলামী যুব শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৮৩-১৯৮৯), ১৯৮৪ সালে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম উদ্যোক্তা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ১৯৮৭ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন (১৯৮৯-১৯৯৬)। তিনি চার দলীয় আন্দোলনের লিয়াঁজো কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। সে সময় তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করেন (২০০১)। বর্তমানে তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর। তিনি ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

লেখালেখি, গবেষণা, আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি তিনি সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি নুসরা নামক একটি জাতীয় ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে যোগদান উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান, ভারত, আরব আমিরাত ও নেপাল সফর করেন। -প্রকাশক

PP
Dhaka
প্রমিনেন্ট
PROMINENT
প া ব লি কে শ ন
ঢাকা, ফোন : ৯৬৬৮৪২২